৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

# ‘দুর্নাম—’

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে ত খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে— তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে ত চলেইছে।

প্যাকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জুল্-জুল্ করে— সে-চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়— জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে-চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে সে বলে, “মর্ না, মরলে যে হাড় জ্বড়োয় আমার।”

শিশু আরো জোরে নিশীথগগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে। পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধম্‌কেছে। দুজনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বলতে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবু বুকটা যেন টন্‌টন্ ক’রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দু’পয়সা আসে। নইলে নিছক ব’সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে— সে-চিৎকার আর থামতে চায় না। সে-চিৎকারে বেদনা নেই— আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হ'য়ে নানা রকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল কি না। নিজের দুচোখ সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথলে উথলে ওঠে। কান্না নয়— সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।

ললিত ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকে আর ভাবে হয়তো।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না— দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না— ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও-ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না— কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতর ভাবে কতরকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

"লখ্‌খি বাবা আমার, কাঁদে না, কাল তোমাকে একটা লাল মটরগাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে ব'সে চালাবে—"

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চিৎকার—"কেন তুমি আমায় মারলে—"

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে। "শোন না; তুমি মটরগাড়িতে ব'সে ভোঁ ভোঁ ক'রে হর্ন বাজাবে—"

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে সেই একঘেয়ে সুর ধ'রে থাকে— "কেন তুমি আমায় মারলে—?"

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর— পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা, এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হতে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে-হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসঙ্গত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পিছন ফিরে লক্ষ্যহীন ভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে সুরু করে,— বিশৃঙ্খল অসম্বন্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না, কখ্খনো না। ভগ্নীপতির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থেকে সামান্য পড়াশুনো শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নীপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ করতে। বিয়ে ত সে করবে না-ই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণত যে-বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সঙ্কল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিনরাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,— পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চির-কৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি, কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বারবার বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই এক গোঁ ধ'রে চিৎকার করছে, "কেন তুমি আমায় মারলে!"

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়? ললিত সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকারও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দুগাছি বালা— হাতে থাকলে ক্ষয়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে! বড়জোর এক শ' টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং কদিনই বা থাকা যায়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চিৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হয়ে প'ড়ে ওই চিৎকারের মাঝেই ব'সে ব'সে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চম্‌কে সজাগ হয়ে ওঠে; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে, "হ'ল ত! সকলের ঘুম ভাঙালে ত!—কোথা থেকে এমন রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে!"

ললিত এবার ব্যথিত হয়ে বলে, "আঃ, আবার মারো কেন?"

"না মারবে না! রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া চিৎকার ক'রে পাড়া-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!"

"অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিট্‌খিটে হয়েছে।" ব'লে ললিত শিশুকে

কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে চেপে ধ'রে আরো জোরে চিৎকার স্বরু করে।

ঝটকা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, "তা মরুক না! মরলে যে বাঁচি।"

"ছিঃ, কি বলছ ছবি!"

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "বলব আবার কি। ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি। এমনি ক'রে ভুগে, ভুগিয়ে, হাড়মাস খাখ্ ক'রে ও যাবে।"

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাব' ব'লে অশ্রান্তভাবে চিৎকার করে।

"ডাক্তার ত বলেছে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে।" ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের স্বরে যেন বেরুতে চায না। ও-আশায় সে নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর্ শিগ্‌গির, ফের চিৎকার করলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।" তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে প'ড়ে স্বামীকে বলে, "তুমি শোও না গিয়ে। এমন ক'রে সারারাত জাগলে চলবে? সারাদিন আপিসে খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে!"

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, "তুমি ত একটুও ঘুমোতে পেলে না।"

"এই ত আমি শুয়েছি। এইবার ঘুমোব।"

কিন্তু ঘুমোন তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, "তুমি শুলে কেন? এইখানে বোসো না!"

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে, "লখ্‌খি বাবা, বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটুখানি শুই,— আচ্ছা এইখানটাতে শুচ্ছি— এবার ত হ'ল!" কিন্তু তাতে হয় না। সেইখানটাতে শুলে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, "শুলে কেন, এইখানটাতে বোসো না।"

শুয়ে শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে ব'সে বলে, "ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব ?"

ছবি বিরক্ত হয়ে ওঠে, "তুমি আবার উঠলে কেন বলো ত ?"

"ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না !"

"তাই জন্যে রাত-দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে ! তুমি শোও দেখি।"

ললিত হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দুহাতে রগড়ে' নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন্ বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চিংকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, ব'সে থাকতে থাকতেই কখন্ আর না পেরে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাং হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধ'রে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চিংকার ক'রে কাঁদছে—"তুমি শুলে কেন ! এইখানে বোসো না !"

অমনি চ'লে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত !

টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠোন— এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে ; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে ; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা।

ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোট সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হতে আবার নতুন দিনে। —মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনার অসামান্য আত্মবলি-দানের কাহিনীর ধারা।

হয়তো বিধাতারও চমক লাগে।

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুটভাবে

এ-সব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হালকা নৌকোর মতো অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে ত সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব— অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হতে চায় না। ছবির দিকে সে ভালো ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন উনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা ত দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সাম্‌নে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!"

ডাক্তার যেতে ললিত বললে, "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে, দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সঙ্গে করে না। না?"

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটল। ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, দু'এক দিনের মধ্যে যা-হোক-ক'রে টাকার জোগাড় সে করবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে "কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল" ব'লে কাজে গেল। সমস্ত সংসারের ওপর যে বেদনার গুরুভার চেপে ছিল, সেটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল সামান্য একটি মানুষের ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর!

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হ'য়ে ঘরে ফেরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

"রান্না-বান্না কিছু করতে হবে না আমার? এমনি ব'সে থাকলে চলবে?" — ছবি জোর ক'রে চ'লে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হয়ে ললিত বলে, "থাক্ না, আমি না-হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আনছি। তুমি বোসো ওর কাছে।"

"হ্যাঁ, এই জল-কাদায় আপিস থেকে দু'কোশ পথ হেঁটে এলে, আবার

এখনি যাবে বাজারে! ছেলের অত আদরে কাজ নেই! আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনদিন?"

"একদিন খেলে কিছু হবে না। আর তুমিও একদিন জিরোও না!" ললিত যেন অনুনয় করে।

"না না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।" ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে।

ললিত আর কথা না কয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে পায়ে জুতো সে কাদায় ব'সে যায়. ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠতে চায় না।

ওই রুগ্ন পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোট সংসারটি ক্লান্তপদে পরম দুঃখের ভার বহন ক'রে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব কিছু দাবি করতে পারে, কোনো ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে— এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে, চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে, কোমরে বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা ব'লে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি।

যাবার সময় মোটরে উঠেও মুখ বার ক'রে বলেছে—"দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত— ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয়?"

ললিত তেমনি আপিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হয়ে গেছে পাথরের মুখের মতো। তার মনের গোপনে কি সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে!

খোকা সেরে উঠছে। স্পষ্ট সেরে উঠছে। খোলা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে ব'সে ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায়

ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।" তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কানের কাছে চুপি চুপি আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, "দেখ, কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টন্ টন্ ক'রে উঠল।"

রাঙামাটির দেশের রঙ যেন ছবিরও গালে লেগেছে; শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝল্‌মল্ করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, "ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।"

খোকা তখন খেলার সাথিটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটি মাটিতে ঠোকবার চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধুলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, "দেখুন ত কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে করতে পারি!"

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল— নীলাভ চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধ'রে ধম্‌কে জিজ্ঞাসা করে, "কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলে? ঝগড়া না ক'রে থাকতে পাবো না?"

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হয়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, "না, ঝগড়া হয়নি ত! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বললে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে আমার মাথাটি একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার ত লাগেনি!"

"না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না।" ব'লে খোকাকে ধম্‌কে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে, "খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।" তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধ্যসাধনা, মিনতি-অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধমুখে গুম হয়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাৎ অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে টুনুকে চিম্‌টি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বকতে স্থরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হয়ে যায়। টুনু শান্ত হয়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, "কাকাবাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না।" তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সে-ই জানে!

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে, এবং আধঘণ্টা পরিশ্রমেও শ্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অ-কারের যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হয়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসল। ললিত বললে, "তুমি অ লিখতে পারো টুনু?"

একগাল হেসে টুনু বললে, "পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখব কাকাবাবু?"

অবাক হয়ে ললিত বললে, "তুমি বোধোদয় পড়ো!"

"বোধোদয় আমার শেষ হয়ে গেছে। অ লিখে দেখাব কাকাবাবু?" ব'লে আগ্রহভরে টুনু শ্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

খোকা কিন্তু শ্লেট দিলে না। দৃঢ়মুষ্টিতে শ্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল।

"ওকে শ্লেট্‌টা দিতে বলুন না কাকাবাবু"— টুনু অনুনয় ক'রে বললে, "আমি খুব ভালো ক'রে অ লিখে দেখাব।"

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বললে, "থাক, তোমার লিখতে হবে না. ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও।"

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হয়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

ললিত কিন্তু আর এক মুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেল।

দেখা হতে ছবি জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এরি মধ্যে পড়াশোনা হয়ে গেল? বাবা! ওকে নিয়ে তুমি যে রকম উঠে-প'ড়ে লেগেছ, জজ-মেজিষ্টের না ক'রে আর ছাড়বে না!"

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

দুদিন টুনু আর আসে না। ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এল। নিজের মাথা তার নিজের কাছে চিরকালের জন্যে হেঁট হয়ে গেছে।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চম্‌কে ডাক্‌লে, "টুনু!"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুক দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল। ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম করলে।

"তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আসো না কেন টুনু?"

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি তাহ'লে বকবেন না ত কাকাবাবু?"

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল; এই ক্ষীণকায়, ফুলের মতো কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা আচরণে এমন একটি করুণ মাধুর্য আছে!

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বললে, "না বাবা, কেন আমি তোমায় বকব!"

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল— বললে, "আমি খেলতে যাই তাহ'লে?"

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বললে, "যাও।"

টুনু উল্লসিত হয়ে ছুটে গেল।

দুদিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে সে-প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছ থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

"না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খেতে পারে না? হ্যাংলা কোথাকার!"

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে, ভাবতে ভাবতে সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—"না বাবা, ওরকম হিংসুটে-পনা কি করতে আছে, ও তোমার ভাই হয়; ও দুটো থাক্, তুমিও দুটো খাও।"

টুনুর মিষ্ট গলা শোনা গেল—"আমি ত দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা; আমার অসুখ করেছে কিনা, আমি একটুখানি খাব শুধু।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও,— আর খোকন্, এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল ত?"

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়।

"না, ওকে একটাও দিতে পারবে না, ওকে দাও না দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

ছবি এবার রেগে বললে, "কেড়ে নে না দেখি! তুই ত দুটো পেয়েছিস। ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?"

"কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা ত তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?"

"বেশ করবে আসবে, বেশ করবে খাবে।"

ব্যাপারটা হয়তো সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁৎলে চ'লে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বলছিল, "আমি ত সবটা খাব না কাকিমা— আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা! আমার ত খেতে নেই।"

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই খোকা সজোরে হাত মুচড়ে সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ঈস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা!"

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হয়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় কসিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

.. .. ..

ছবি এসে বললে, "আহা, ওদের টুনুর বড্ড অসুখ গো!"

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় ব'সে ছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কার, টুনুর?"

"হ্যাঁগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সারল না। দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে গেল।"

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বোধ হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধ'রে টেনে বললে, "শোন!"

"কি?" ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

"কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো বাপু, আমার কাজ আছে!"

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বললে, "খোকা ত বেশ সেরে গেছে, না ছবি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"তাহ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ ত?"

"কি যে কথা বলো তার মাথা মুণ্ডু নেই, একি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি?"

ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল। ফের তার আঁচল ধ'রে টেনে রেখে ললিত বললে, "এই খোকা হয়তো বড় হবে, মানুষ হবে, সংসার করবে— কি বলো ছবি?"

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ বলো ত?"

"শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে

ভোগ করবে, ধন্ত করবে, তাই জন্তে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ ?"

"যাও, স্তাকামি আমার ভালো লাগে না !" ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতের একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক'দিন বাদে হঠাৎ অর্ধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বললে, "শুনতে পাচ্ছো ?"

ললিত বললে, "হুঁ।"

ছবি ভীত পাংশুমুখে বললে, "কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে না ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।" ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, "টুনু ম'রে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল— আশ্চর্য নয় ছবি ?"

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে ব'লে যেতে লাগল, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি ! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটা-কাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম ক'রে রাখবে, নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি !"—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে !"

"বোধ হয় !" ব'লে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে ধ'রে ললিত উগ্রকণ্ঠে বললে, "চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে জোগাড় করেছি জানো ছবি ? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো ?"

ছবি সে-মুখের চেহারায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললে, "কি ?"

"চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটুরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়।"

"তাহ'লে কি হবে!"—ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল।

ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, "কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ-চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধ'রে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল।

এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি!

# কুয়াশায়

হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে নেমে অত্যন্ত বাঁকা-চোরা ক'টি গলিপথ পার হয়ে হঠাৎ একটি ছোট্ট রেলিঙ্-ঘেরা জমি কোনদিন কেউ হয়তো আবিষ্কার করতে পারে— অনেকে করেছেও।
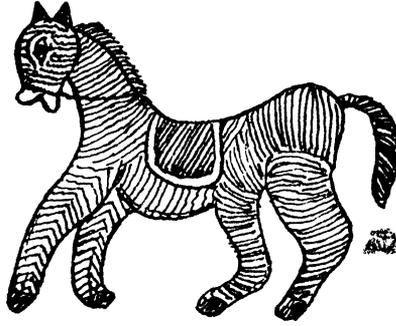
আবিষ্কার কথাটার ব্যবহার এখানে নিরর্থক নয়, কারণ অত্যন্ত কুটিল গলির গোলকধাঁধায় ঘোরবার পর ক্লান্ত পথিকের কাছে ঠিক আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়েই এই সামান্য জমিটুকু দেখা দেয়। পুরানো নোনাধরা ইটের মান্ধাতার আমলের তৈরি বাড়িগুলি ওই সামান্য রুগ্ন ঘাসের শয্যাটিকে কারাগারের প্রাচীরের মতো ঘিরে আছে। দেখলে কেমন মায়া হয়— ওর ঘাসগুলির বিবর্ণতায় যেন পৃথিবীর দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরগুলির বিচ্ছেদের কান্না আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো দপ্তরে এই জমিটুকুর বড় গোছের একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে-নাম আমরা জানি না, জানবার প্রয়োজনও নেই। নিকটবর্তী থানার পুরানো খাতায় এই ভূখণ্ডটিকে জড়িয়ে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাই নিয়ে আমাদের কাহিনী।

পুলিশের লোকেদের সম্বন্ধে যত রকম নিন্দাই বাজারে চলুক না কেন, ভাবপ্রবণতার অপবাদ তাদের নামে এখনও কেউ বোধ হয় দেয় নি। তাদের বিবরণ সাহিত্য হবার কোন দুরাশা রাখে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাকে প্রতিদিনের শেয়ার-মার্কেটের রিপোর্টের মতো বর্ণহীন ও নীরস ক'রে লেখবার দুর্লভ বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। তবু এই সামান্য রেলিঙ-ঘেরা তিন কাঠা পরিমাণ জমিটির ভেতরে দর্শ বছর আগে শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল, যা তাদের নির্লজ্জ কলমের নিষ্ঠুর আঁচড় স'য়েও আজও বুঝি রহস্যমণ্ডিত হয়ে আছে।

চারিদিকের জীর্ণ বাড়িগুলি থেকে ততোধিক জীর্ণ যে-মানুষগুলি আজ সন্ধ্যার ক্ষণিকের অবসরে এই ছোট জমিটুকুতে দুর্বল নিশ্বাস নিতে আসে,

তারা অনেকেই হয়তো সেকথা আজ ভুলে গেছে কিংবা না ভুললেও স্মৃতির পুরানো পাতা সযত্নে তারা চাপা দিয়েই রাখে— উল্টে দেখবার ইচ্ছা বা অবসর কিছুই তাদের নেই।

তবু এখনও কেউ কেউ ছেলে মেয়েদের লোহার রডের তৈরি দোলনার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। দশ বৎসর আগের একটি প্রভাতের কথা ভেবে হয়তো শিউরেও ওঠে।

প্রভাত-সূর্যের আলো সেদিন তখনও ওই জমিটুকুর ঘন ধোঁয়াটে কুয়াশাকে তরল করবার সুযোগ পায় নি। সেই অস্পষ্ট কুয়াশায় দেখা গেছ্‌ল— ছেলেদের দোলনার ওপরকার দণ্ড থেকে, কণ্ঠে মলিন দোরোকা জড়ানো একটি নারীর মৃতদেহ ঝুলছে। মেয়েটি কিশোরী নয়; কিন্তু পূর্ণযৌবনাও তাকে বুঝি বলা চলে না। পরনে তার বিধবার মলিন বেশ; কিন্তু গলায় একটি সোনার হার। তা থেকে ও তার মুখ দেখে ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুমান করা কঠিন নয়। মাথার দীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশ তার মুখ ছেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে তার ঈষৎ-বিকৃত মুখ যারা দেখেছে, তারা কখনও তা ভুলতে পারবে ব'লে মনে হয় না। সে-মুখের অসীম ক্লান্তি ও অসহায় কাতরতা মৃত্যুও যেন মুছে দিতে পারে নি।

খবর পেয়ে পুলিশের লোকের আসতে দেরি হয় নি। এসমস্ত ব্যাপারে যা দস্তুর তা করতেও তারা ত্রুটি করে নি, তবু এই মৃত্যু-রহস্যের কোন কিনারাই শেষ পর্যন্ত হ'ল না। যে-কুয়াশার মাঝে মেয়েটির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, তারই মতো দুর্ভেদ্য রহস্য তার সমস্ত অতীত জীবনেতিহাস আচ্ছন্ন ক'রে রইল। এই মৃত্যুর লজ্জা ও গ্লানি গায়ে পেতে নেবার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন তার থাকলেও, এগিয়ে এল না।

নামহীনা, গোত্রহীনা, পৃথিবীর অপরিচিতা হতভাগিনী নারীদের এক প্রতীকই বুঝি সেদিন নিশান্তের অন্ধকারে এই রেলিঙ-ঘেরা জমিটুকুর নির্জনতায় উদ্বন্ধনে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে, ভাবতে পারতাম—

কিন্তু তা সত্য নয়। এই শোচনীয় সমাপ্তির কোথাও একটা আরম্ভও ছিল।

এই নিদারুণ কাহিনীর গোড়াকার পরিচ্ছেদগুলি জানতে হ'লে তের বছর

আগেকার চকমেলানো যে বিশাল বাড়িটিতে প্রবেশ করতে হবে তার দেউড়ির দরোয়ান থেকে জীর্ণ দেওয়ালের প্রত্যেক ফাটলে অস্তমিত গৌরবের চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট।

বৃদ্ধা রূপসীর মতো আজও তার গায়ে অতীত গৌরবের দিনের অলঙ্কারের দাগ মেলায় নি; তার লোল চর্মের মালিন্যকে ব্যঙ্গ ক'রে আজও সে-চিহ্নগুলি মানুষের চোখকে ব্যথিত করে।

জীর্ণ শতচ্ছিন্ন মলিন উর্দি পরে' আজও পুরানো দিনের বৃদ্ধ দরোয়ান দরজায় পাহারা দেবার ছলে ব'সে ব'সে ঝিমোয়। পাহারা দেবার আর তার কিছু অবশ্য নেই। বড় রাস্তার ওপর বাড়ির আসল দেউড়ির দিক পূর্বতন উত্তরাধিকারী দেনার দায়ে অনেকদিনই বেচে দিয়েছেন। গলির ওপর আগের আমলের খিড়কি-দরজাই এখন একটু অদল-বদল ক'রে দেউড়িতে পরিণত হয়েছে। সে-দেউড়ি পার হয়ে সেকালের বাঁধানো আঙিনা অতিক্রম ক'রে যে-মহলে পৌছোন যায়, চারিদিক থেকে সঙ্কুচিত হয়ে এলেও তার আয়তন বড় কম নয়। মৌচাকের মতো সে-মহলের কুঠ্‌রির পর কুঠ্‌রি এখনও গুণে ওঠা ভার। কিন্তু পাহারা দেবার সেখানে কিছু নেই। অধঃপতিত প্রাচীন জমিদার-বংশের দরিদ্র উত্তরাধিকারীরা সেই অসংখ্য কুঠ্‌রির পর কুঠ্‌রিতে ভিড় ক'রে বাস করে। —কারুর সঙ্গে কারুর তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। অতীত দিনের স্মৃতি ছাড়া সযত্নে রক্ষা করবার মতো মূল্যবান্‌ জিনিসেরও তাদের একান্ত অভাব।

তবু চিরদিনের রেওয়াজ মতো বৃদ্ধ দরোয়ান দরজায় ব'সে থাকে এবং তারই পাশের কুঠ্‌রিতে নায়েব, গোমস্তা, সরকার প্রভৃতির ব্যস্ত কলরবের পরিবর্তে সে-যুগের শেষ চিহ্ন এ-পরিবারের বিশ্বাসী সরকার মহাশয়ের তামাক খাবার মৃদু শব্দ শোনা যায়। যৎসামান্য যে-জমিদারি এখনও অবশিষ্ট আছে তিনিই একাকী তার তত্ত্বাবধান করেন ও বর্তমানের অসংখ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তারই যৎসামান্য আয় বণ্টন করবার বন্দোবস্তও তাঁকে করতে হয়। অন্দর-মহলের হেঁসেল ও বাহিরের এই একক সরকার মহাশয়ের দপ্তর— এই বৃহৎ বিচ্ছিন্ন পরিবারের একান্নবর্তিতার এই দুটি চিহ্নই এখনও বর্তমান।

সরকারের দপ্তর একান্ত সঙ্কুচিত হয়ে এলেও হেঁসেল প্রকাণ্ড। পূর্বতন কর্তার উইলের নির্দেশমতে জমিদারির আয়েই তা চলে। বিরাট মহলের সমস্ত কুঠ্‌রির অধিবাসীদের দুবেলা এখন শুধু তার সঙ্গে আহারের সম্পর্কটুকু

আছে। কিন্তু সে-সম্পর্কের গুরুত্ব বড় কম নয়। তিন তিনটি বড় উনুন দিবারাত্র সেখানে নিভ্‌তে পায় না। মোক্ষদা ঠাকরুন দাঁতে গুল দিতে দিতে চরকীর মতো রাতদিন ঘুরে' বেড়ান।

"হ্যাগা রামের মা, এই কি চাল ধোবার ছিরি! একবার কলে বসিয়েই তুলে এনেছ বুঝি!"

তারপর আর এক পাক ঘুরে এসে বলেন—"নাঃ, জাতজন্ম তুই আর রাখতে দিবি না বিন্দী, ওটা যে আঁশ বঁটি লো! নিরিমিষ্যি হেঁসেলের কুট্‌নো-গুলো কুট্‌লি ত ওতে? তোর আক্কেল কবে হবে বলতে পারিস্?"

পিছন দিক ঘুরে বলেন—"তবেই হয়েছে মা! তোমার মতো নিডবিডে লোককে কুট্‌নো কুট্‌তে দিলেই এ-বাড়ির লোক খেতে পেয়েছে, আজ সন্ধ্যের আগে আর রান্না নামবে না!"

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে আরও দ্রুত হাত চালাবার চেষ্টা করে। মোক্ষদা ঠাকরুন আবার বলেন, "তোমার নামটা আবার ভুলে গেলাম ছাই!"

মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে মৃদু কণ্ঠে বলে, "সরমা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সরমা— আমার ভাগ্নে-বৌয়ের নামও যে ওই! ঠিক তোমারই মতো নামে চেহারায় হুবহু কি এক হতে হয় মা! রূপে গুণে কি বলব মা, একেবারে লক্ষ্মীঠাকরুনটি ছিল!"

মুখে এক খাম্‌চা গুল দিয়ে তিনি আবার বলেন, "দিদির পোড়া কপালে অমন গুণের বৌ বাঁচবে কেন! সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে ছেলে বুকে ক'রে লবডঙ্কা দেখিয়ে চলে' গেল!" তারপর হঠাৎ সঙ্কুচিত মেয়েটির সিন্দূর-বিহীন সীমন্তরেখার দিকে চোখ পড়াতেই বোধ হয় কথাটা পাল্টে নিয়ে তিনি বলেন, "অত সূক্ষ্ম কাজে চলবে না মা! বলতে নেই, তবে এ রাবণের গুষ্টির রান্না মোটামুটি না সারলে কি হয়! হাত চালিয়ে নাও, হাত চালিয়ে নাও, ও খোলা-টোলা একটু-আধটু থাকলে আসবে যাবে না।"

পরক্ষণেই মোক্ষদা ঠাকরুনকে নূতন দিকের তত্ত্বাবধানে যেতে হয়। সরমা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সারবার চেষ্টা করে, কিন্তু বেশিক্ষণ তার নির্বিঘ্নে কাজ করার অবসর মেলে না।

"ওকি কুট্‌নো হচ্ছে, না গরুর জাব্‌না কাট্‌ছ বাছা? দুমদাম ক'রে যাহোক করলেই ত হয় না। গরু-বাছুর নয়, মানুষে খাবে!"

সরমা চকিত ভীত হয়ে চোখ তুলে তাকায় এবং চিনতেও তার দেরি হয় না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া কাপড় পরা এই বিশালকায় স্ত্রীলোকটির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হ'লেও এই কয়দিনেই সে তাঁকে ভয় করতে শিখেছে। ক্ষ্যান্ত পিসি ব'লে তিনি সাধারণতঃ পরিচিত; কিন্তু হেঁসেলের মেয়েরা গোপনে বলে, "সেপাই" এবং বোধ হয় অন্যায় করে না। স্ত্রীলোকটির চেহারায়, ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় এমন একটি পরুষ জবরদস্ত ভাব আছে যা দেখলে স্বভাবতঃই ভয় হয়।

ক্ষ্যান্ত পিসি অত্যন্ত কটুকণ্ঠে এবার বলেন, "হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছ কি? ইংরিজি ফার্সি বলি নি। বাঙলা কথাও বোঝ না!"

সরমা থতমত খেয়ে, তাড়াতাড়ি অথচ পরিপাটী ক'রে কুট্‌নো কোট্‌বার অসম্ভব চেষ্টায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু রাশীকৃত তরকারীর দিকে চেয়ে তার ভয় হয়। সত্যই এক বেলার মধ্যে তা সেরে ফেল্‌বার কোন সম্ভাবনা সে দেখতে পায় না।

ক্ষ্যান্ত পিসির তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নড়্‌বারও কোন লক্ষণ নেই। অনেকক্ষণ ধ'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে হঠাৎ তিনি বলেন, "তুমি আমাদের ফট্‌কের বৌ না গা?"

কথাটা বুঝতে না পেরে সরমা অবাক্ হ'য়ে আবার মুখ তুলে চায়। তার মৃত স্বামীর নাম সে জানে এবং তা 'ফট্‌কে' নয়।

ক্ষ্যান্ত পিসি তার বিস্ময় দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, "আকাশ থেকে পড়লে কেন, বাছা! চোখের মাথা ত খাই নি, যে একবার দেখলে চিনতে পারব না! সেই ত ধুলো পায়ে ফিরে এসে ফট্‌কে আর মাথা তুললে না, এক রাত্রে কাবার। তারই বৌ না তুমি?"

এবার সরমা মাথা নিচু ক'রে থাকে। এ-বাড়িতে তারই মতো আরও এক হতভাগিনীর জীবনে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিয়ে যখন তার হয়েছে, তখন সে তের বছরের বালিকা মাত্র এবং তখনকার দুদিনের পরিচয়ে স্বামীর সকল সংবাদ তার জানবার কথাও নয়। তবু এ-বাড়িতে তার স্বামীর ডাকনাম যে ওই ছিল, এখন আর তার তা বুঝতে বাকি থাকে না।

ক্ষ্যান্ত পিসি খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বলেন—

"কি কপাল ক'রেই এসেছিলে বাছা, ফট্কের মা'র সংসারটা ছারখার হয়ে গেল!"

তার ভাগ্য সম্বন্ধে এই উপাদেয় মন্তব্যগুলি সরমাকে আর কতক্ষণ সহ্য করতে হ'ত বলা যায় না, কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুন হঠাৎ ফিরে আসায় সে রেহাই পায়।

"তুই আবার এখানে ফফর-দালালি করতে এলি কেন বল্‌ত ক্ষ্যান্ত?" ব'লে মোক্ষদা ঠাকরুন এসে দাঁড়ান। তারপর সরমাকে দেখিয়ে বলেন—"একে নিডবিডে মানুষ, তার ওপর তোর বক্তিমে শুনতে হ'লে এবেলায় আর ওকে কুট্‌নো শেষ করতে হবে না।"

বাড়ির মধ্যে এই এক মোক্ষদা ঠাকরুনের সামনেই ক্ষ্যান্ত পিসির সব আস্ফালন শান্ত হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে মোক্ষদা ঠাকরুনের কর্তৃত্বের হিংসা করলেও তার কাছে ক্ষ্যান্ত পিসি, কেন বলা যায় না—একেবারে কেঁচো হয়ে থাকেন।

এক গাল হেসে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা ক'রে ক্ষ্যান্ত পিসি বলেন, "ফফর-দালালি করব কেন দিদি! চিনি চিনি মনে হ'ল, তাই শুধোচ্ছিলুম— তুমি কি আমাদের ফট্‌কের বৌ? সেই এতটুকু বিয়ের কনেটি দেখেছিলুম, আর ত তারপর আসে নি!"

অত্যন্ত চ'টে উঠে মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন—"তোর আক্কেল অমনিই বটে! শুধোবার আর কথা পেলি নে!"

অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষ্যান্ত পিসির স'রে পড়তে দেরি হয় না। "একা তোমার কর্ম নয় মা"—ব'লে আরেকটা বঁটি টেনে নিয়ে মোক্ষদা ঠাকরুন সরমার সঙ্গে কুট্‌নো কুট্‌তে ব'সে যান। সরমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ছেলেবেলা মা'র সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গিয়ে সরমাকে একবার এক ধর্মশালায় থাকতে হয়েছিল। ঘরে ঘরে অগণন যাত্রীর ভিড। একই বাড়ির ভেতর পাশাপাশি তাদের ছোট ছোট সংসার দুদিনের জন্য পাতা হয়েছে— অথচ কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কোন বৃহৎ পরিবারের লোকে বাড়ি গমগম করছে অথচ ভেতরে একান্ত অপরিচিত, পরস্পরের প্রতি নিতান্ত উদাসীন মানুষের দল!

এ-বাড়িতে ক'দিন বাস ক'রে সরমার অস্পষ্ট ভাবে সেই ধর্মশালার কথাই মনে পড়ে বার বার। এ যেন চিরন্তন একটা ধর্মশালা।

ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে এ-বাড়ির হট্টগোল সুরু হয়। ঘরে ঘরে বিভিন্ন সংসারের বিভিন্ন জীবনযাত্রার কলরব, উঠানে পরিচিত অপরিচিত বালক বৃদ্ধ বৃদ্ধার হাট।

হেঁসেলে ত যজ্ঞবাড়ির মতো ব্যস্ততা লেগেই আছে। দুপুরের খাওয়ার পাট চুকতে না চুকতেই রাত্রের আহারের আয়োজন সুরু হয়ে যায়। সমস্ত সংসার-যাত্রাটা বিরাট কলের চাকার মতো অমোঘ ভাবে চলে, অবশ্য অত্যন্ত পুরানো ভাঙা তৈলবিহীন কলের চাকার মতো এবং তারই কোথায় একটি ছোট অংশের মতো আট্‌কে গিয়ে সরমা আর সারাদিন নিশ্বাস ফেলবার অবসর পায় না।

গভীর রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ ক'রে মোক্ষদা ঠাকরুনের সঙ্গে নীরবে ছোট একটি কুঠরিতে যখন মলিন একটি শয্যায় সে শুতে যায়, তখন ক্লান্তিতে তার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছে। নিজের মনের সঙ্গে দু'দণ্ড মুখোমুখি হয়ে বসবার তার আর উৎসাহ বা অবসর কিছুই নেই।

তবু সরমার দিন ভালোই কাটে, অন্ততঃ দুঃখ করবার কিছু আছে, একথা কোনদিন তার মনে হয় নি।

বিধবা হবার পর ক'বছর তার বাপের বাড়িতে কেটেছে। বাপ-মা মারা যাবার পর ভায়েরা গলগ্রহ ব'লেই তাকে যে শ্বশুরবাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেছে, একথা সে জানে এবং তার জন্যেও তার কোন ক্ষোভ নেই।

সিঁথির সিন্দূর মুছ্‌লে বধূ ও কন্যারা হেঁসেলে আশ্রয় পায়, এই এ বাড়ির সনাতন নিয়ম। সে-নিয়ম অনুসারেই শ্বশুরবাড়িতে পা দেবা মাত্র রন্ধনশালার বিরাট চক্রে সে জড়িয়ে গেছে। এবং পরিশ্রম এখানে যতই থাক, সে-চক্রের সঙ্গে আবর্তনে দিন ও রাত্রি যে তার নিশ্চিন্ত ভাবে পার হয়ে যায়, এইটাই তার পরম শান্তি।

হেঁসেলের বাঁধা জীবনযাত্রাতেও বৈচিত্র্যের একেবারে অভাব আছে বলা যায় না।

দোতলার পুবদিকের কোণের ঘরের বৌটি ভারি মিশুক। সকাল হতে না হতে একটা বাটিতে খানিকটা বার্লি গুলে নিয়ে এসে হয়তো বলে, "দাও ত' ভাই উনুনে একটু তাতিয়ে— ছেলেটার রাত থেকে জ্বর।"

সরমা তাড়াতাড়ি বার্লি ফুটিয়ে এনে দেয়। বৌটি যাবার সময়ে বলে, "দুপুরে পারো ত একবার যেও না ভাই, একটু কথা আছে!" সরমা ঘাড় নেড়ে জানায়—"যাবো।"

বৌটি যেতে না যেতে পাশ থেকে কটুকণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে হেঁসেলের আর একটি মেয়ে বলে, "একটু যেও না ভাই, কথা আছে! কথা মানে ত ছেলের কাঁথাগুলো সেলাই করিয়ে নেওয়া! খুব ধড়িবাজ বৌ যাহোক! তোকেও যেমন হাবা মেয়ে পেয়েছে, তাই নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়!"

কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যা নয় তা সরমাও কিছু কিছু বোঝে; তবু সলজ্জ ভাবে একটু হেসে বলে, "না, না, নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেবে কেন? একলা মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে সামলাতে পারে না, তাই…"

সরমাকে কথাগুলো আর শেষ করতে হয় না! নলিনী খরখর্ ক'রে ব'লে ওঠে, "আমার ঘাট হয়েছে গো ঘাট হয়েছে, আর তোমায় কিছু বলব না। তোমার এত দয়া, মায়া, গতর থাকে করগে' যাও না। আমার বলতে যাওয়াই ঝকমারি!" তারপর রাগে গর-গর করতে করতে নলিনী চ'লে যায়।

সরমা মনে মনে একটু হেসে চুপ ক'রে থাকে। নলিনী মেয়েটিকে এই ক'দিনে সে বেশ ভালো ক'রেই চিনেছে। বয়স নলিনীর তার চেয়ে বিশেষ বেশি নয়, কিন্তু দেহের অস্বাভাবিক শীর্ণতার জন্য তাকে অনেক বড় দেখায়, তার শুক্‌নো শীর্ণ মুখে বিরক্তি যেন লেগেই আছে। প্রসন্নমুখে তাকে কখনও কথা বলতে এ পর্যন্ত সে শোনে নি। তবু এই উগ্র মেয়েটির কঠিনতার অন্তরালে কোথায় যেন গোপন স্নেহের ফল্গুধারা প্রকাশের সুযোগের অভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে ব'লে সরমার মনে হয়।

প্রথম দিন যেভাবে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেকথা মনে করলে এখনও সরমার হাসি পায়। সবে সেদিন সে এ-বাড়িতে এসেছে। মোক্ষদা ঠাকরুনের জিম্মায় সরকার মশাই তাকে অন্দরমহলে এসে রেখে গেছেন। সারাদিন অপরিচিত লোকের মাঝে মোক্ষদা ঠাকরুনের ফরমাসে ছোটখাটো হেঁসেলের কাজ সে করেছে, কিন্তু আলাপ কারুর সঙ্গে তার বিশেষ হয় নি। মোক্ষদা ঠাকরুনের ভোলা মন। রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পর সরমার শোবার জায়গার ব্যবস্থা যে করা দরকার, একথা তাঁর বোধ হয় মনেই ছিল না। লজ্জায় সরমা সেকথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে নি। একে একে সবাই হেঁসেল

ছেড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে হতাশ ভাবে রান্নাঘরের একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

হেঁসেলে চাবি দেবার ভার নলিনীর ওপর। দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে সে রুক্ষকণ্ঠে বললে, "ঢং ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাপু, রাত একটা বাজতে যায়, শুতে যাও না!"

দুঃখে হতাশায় তখন সরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বললে "কোথায় শোব?"

অত্যন্ত কটু কণ্ঠে "আমার মাথায়!" ব'লে নলিনী চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু পরে কি ভেবে ফিরে এসে সে বললে, "তুমি আজ নতুন এসেছ, না?"

এই অসহায় অবস্থায় নলিনীর কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় সরমার চোখে তখন জল এসেছে। এ-কথার সে উত্তর পর্যন্ত দিতে পারলে না।

কিন্তু নলিনী তখন উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে একেবারে মোক্ষদা ঠাকরুনের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। নলিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সরমা সেখান থেকেই শুনতে পাচ্ছিল—

"বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে, না! কি রকম আক্কেলটা তোমার বলো দেখি? নিজে ত বেশ আয়েশ ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছো, আর একটা মেয়ে যে চোদ্দ পো অধর্ম ক'রে তোমাদের আশ্রয়ে এসেছে তার শোবার কি ব্যবস্থা করেছ শুনি?"

মোক্ষদা ঠাকরুন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বলেছিলেন—"ছি, ছি, বড্ড ভুল হয়ে গেছে মা! একেবারে হুঁস ছিল না। এস মা এস, এই আমার ঘরেই তোমার শোবার ব্যবস্থা করেছি।"

নলিনীর মুখ কিন্তু তবু থামে নি। মোক্ষদা ঠাকরুনকে যতদূর সম্ভব বাক্যবাণে জর্জরিত ক'রে শেষে সরমার দিকে ফিরে সে বলেছিল, "শোবে ত বিছানা-পত্র কই?"

সরমা একটি তোরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই আনে নি; সেটা বৃহৎ রান্নাঘরের রকের এক কোণে তখনও পড়েছিল। তারই দিকে চেয়ে কাতরভাবে সরমা বলেছিল—"তা ত কিছু আনি নি।"

"না তা আনবে কেন? এখানে তোমার জন্যে জোড়পালঙে গদি পাতা রয়েছে যে! এখন শোওগে যাও খালি মেঝেয়।"

মোক্ষদা ঠাকরুন সরমার মুখের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন—"আহা-হা, না এনেছে, না এনেছে; তা ব'লে খালি মেঝেয় শুতে যাবে কেন? চলো মা চলো, আমার বিছানাপত্তর থেকে দু'জনের কোনরকমে হয়ে যাবে এখন।"

"তা খুব হবে এখন! তোমার ত আছে একটা ছেঁড়া পচা কাঁথা, তার দু'পিঠে দু'জন শুয়ো!" কটু কণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে নলিনী চ'লে গিয়েছিল।

কিন্তু খানিক বাদেই মোক্ষদা ঠাকরুনের ঘরে ঢুকে সজোরে একটা চাদর সমেত তোষক ও বালিশ মেঝেয় আছড়ে ফেলে নলিনী বলেছিল—"নাও গো নাও, এখন শ্রীঅঙ্গ ছড়াও। রাত দুপুরে যত হ্যাঙ্গাম।"

মোক্ষদা ঠাকরুন তখন নিজের যৎসামান্য শয্যাদ্রব্য সরমাকে ভাগ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। নলিনীর ব্যবহারে অবাক হয়ে বললেন, "তোষক বালিশ সব দিয়ে গেলি, তা তুই শুবি কিসে লা?"

"থাক থাক, অত আদিখ্যেতায় দরকার নেই। আমার ভাবনা ভাবতে ত আমি কাউকে বলি নি।" —ব'লে সজোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নলিনী চ'লে গিয়েছিল।

মোক্ষদা ঠাকরুন হেসে সরমাকে বলেছিলেন, "কিছু মনে কোরো না মা, যেটুকু ধার ওর ওই মুখে— নইলে ···"

নইলে যে কি মোক্ষদা ঠাকরুন ব'লে দেবার আগেই সরমা তখন বুঝে নিয়েছে।

তারপরও নলিনী কোনদিন প্রসন্নমুখে তার সঙ্গে আলাপ করেছে ব'লে সরমা মনে করতে পারে না; তবু কেমন ক'রে কোথা দিয়ে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নলিনী দাঁত খিঁচিয়ে ছাড়া কথা বলে না, কিন্তু সরমার সঙ্গও ছাড়ে না।

আজও সে খানিকবাদে ঘুরে এসে আপন মনেই গজগজ করতে থাকে—"টান ত কত! ছেলের কাঁথা সেলাই করবার বেলা— 'একটা কথা আছে ভাই!' ঘরদোরগুলো সাফ্ করিয়ে নেবার বেলা—'তুই ভাই ঘর গুছোতে বড় ভালো পারিস্!' কই, বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব আসার দিন ত ভুলেও একবার ডাকল না!"

সরমা এবার হেসে ফেলে' বলে, "তুমি এবার হাসালে নলিনদি! বাপের তত্ত্ব এল তা আমায় ডাকবে কেন?"

"তা বৈ কি! বাঁদিগিরি করতে ডাকে ত তাহ'লেই হ'ল।"

সরমা নলিনীকে আর কিছু বলতে যাওয়া বৃথা বুঝে চুপ ক'রে থাকে। নলিনী নিজের মনেই এক সময়ে বকে' বকে' শান্ত হবে, সে জানে।

বছরের পর বছর ঘুরে যায়।

বেশির ভাগ একঘেয়েমি ও কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে সরমার জীবন এমনি মসৃণ ভাবেই মনে হয় কেটে যাবে।

সে-জীবনকে কক্ষচ্যুত করবার মতো এমন কি-ই বা ঘটতে পারে! চারি-ধারের চিরন্তন পান্থশালায় যে-জীবনযাত্রা চলে, তার সঙ্গে বিশেষ কিছু সংস্পর্শ সরমার নেই। তার নিজের জীবন ত দিনের পর দিন প্রায় একই ঘটনাসমষ্টির পুনরাবৃত্তি।

বড় জোর একদিন মোক্ষদা ঠাকরুন ডেকে বলেন, "তরকারী টরকারীগুলো গুছিয়ে এক থাল ভাত বেড়ে নিয়ে আয় ত মা আমাদের ঘরে। আমি ততক্ষণ জল ছড়া দিয়ে আসনটা পেতে ফেলি গে।"

রান্নাঘরের পাশের ঘরেই সাধারণতঃ সকলের খাবার জায়গা হয়। আজ এই বিশেষ বন্দোবস্তে একটু অবাক হ'লেও কারণ জিজ্ঞেস করা সরমা প্রয়োজন মনে করে না।

কিন্তু ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকেই অপরিচিত পুরুষ দেখে সে দরজার কাছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'টি হাতই তার ভাতের থালা ও ব্যঞ্জনের বাটি ধরতে গিয়ে জোড়া হয়ে আছে। মাথার ঘোমটাটা পর্যন্ত ভালো ক'রে তুলে দেবার উপায় নেই।

মোক্ষদা ঠাকরুন তাড়াতাড়ি বলেন, "ওমা, অমন ক'রে আবার থম্‌কে দাঁড়ালি কেন? আরে ওযে নরু, আমার ভাইপো! ওকে আর লজ্জা করতে হবে না!"

তাঁর ভাইপো ব'লে লজ্জা করবার কোন কারণ কেন যে নেই, তা বুঝতে না পারলেও ভাতের থালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা সরমার বেশি অশোভন মনে হয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে আসনের সামনে থালাটা সে নামিয়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে যায়।

মোক্ষদা ঠাকরুন পেছন থেকে হেঁকে বলেন, "একটু নুন হাতে ক'রে আনিস মা ; ওর আবার পাতে নুন না হ'লে চলে না।"

মাথার ঘোমটা ভাল ক'রে টেনে এবার সরমা নুন দিতে আসে। কিন্তু নুন দিতে গিয়ে হঠাৎ হাসির শব্দে সে চম্‌কে ওঠে।

"তোমরা কি আমায় নোনা ইলিশ ক'রে তুলতে চাও পিসিমা ?"

মোক্ষদা ঠাকরুন তাড়াতাড়ি সামনে এসে হেসে বলেন, "দেখেছ বেটির বুদ্ধি ! নুন দিতে বলেছি ব'লে কি সেরখানেক নুন দিতে হয় পাগলি ! অত নুন মানুষে খেতে পারে ?"

সরমা লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মোক্ষদা ঠাকরুনের ভাইপো নরু অর্থাৎ নরেন বলে—"এ-বাটিটা তুলে নিয়ে যেতে বলো পিসিমা— দরকার হবে না।"

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"সে-কি রে ! ওযে মাছের তরকারী। তোর ওসব বাই আছে ব'লে পুকুরের জ্যান্ত মাছ কিনে আনিয়ে রেঁধেছি যে !"

"জ্যান্ত মরা কোন মাছই যে খাই না আর।"

মোক্ষদা ঠাকরুন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে অনুযোগ করতে সুরু করেন—"এসব বিদ্‌ঘুটে বুদ্ধি আবার কবে থেকে হয়েছে ? এই বয়সে মাছ ছেড়ে দিলি কোন্ দুঃখে···"

নরেন হেসে বলে, "মাছ খাই না ব'লে হা-হুতাশ না ক'রে নিরিমিষ তরকারী আর একটু বেশি ক'রে আনতে বলো, পিসিমা। পাড়াগেঁয়ে মানুষ— লজ্জার মাথা খেয়েও সহজে পেট ভরে না।"

"কথার ছিরি দেখেছ !" —ব'লে হেসে মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে তরকারী আনতে ইঙ্গিত করেন।

নরেন একটু গলা চড়িয়ে বলে—"তা ব'লে নুনের মাপে যেন তরকারী না আসে।"

তরকারী দেবার জন্য ঘরে ঢুকে সরমা শুনতে পায় মোক্ষদা ঠাকরুন বলছেন—"সেই কথাই ত ভাবি বাবা ; অমন লক্ষ্মী পিরতিমের মতো মেয়ের এমন কপাল হয় ! পোড়ারমুখো বিধেতার মাথায় ঝাড়ু।"

তাকে দেখেই মোক্ষদা ঠাকরুন চুপ ক'রে যান। তার কথা কি সূত্রে উঠেছে বুঝতে না পারলেও, সরমা ঘোমটার ভেতর লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

তরকারীর বাটিটা নামাতে গিয়ে কাৎ হয়; খানিকটা তরকারী মেঝেতে পড়েও যায়। কিন্তু সরমা আর সেখানে দাঁড়ায় না।

অত্যন্ত সামান্য একটি ঘটনা। কোথাও তা দাগ রেখে যায় না, রেখে যাবার কথাও নয়। নিত্য নিয়মিত হেঁসেলের জীবন সমান ভাবেই চলে।

কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনারই দেখা যায় পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ক্রমশঃ পুনরাবৃত্তির চেয়েও বেশি কিছু ঘটে।

সরমা বলে, "আলাদা একটা নিরিমিষ তরকারী করতে দেব মাসিমা?"

মোক্ষদা ঠাকরুন গুল নিতে গিয়ে থতমত খেয়ে বলেন, "ওমা তাই ত! ভাগ্যিস মনে ক'রে দিয়েছিস। বুড়ো হয়ে মাথার কি আর ঠিক আছে? নরু যে মাছ খায় না, তা আর খেয়াল নেই।"

নরেনকে আজকাল প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত করতে হয়। এক একদিন সে অনুযোগ ক'রে বলে, "তোমাদের ওপর বড় বেশি জুলুম করছি, না পিসিমা? আদর ফুরোবার আগে একটা নোটিশ দিও, মানে মানে স'রে পড়ব।"

মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে শুনিয়ে বলেন, "কথার ছিরি দেখছিস সরো। তিন নয়, পাঁচ নয়, আমার এক ভায়ের এক বেটা— আমার সঙ্গে উনি কুটুম্বিতা করছেন।"

সরমার আগের সঙ্কোচ অনেকটা কেটেছে। নরেনের সামনে ঘোমটা না খুললেও মৃদুস্বরে দু'একটা কথা আজকাল বলে।

"এখানকার রান্নায় বোধ হয় অরুচি হয়েছে, মাসিমা!"

নরেন কিছু বলবার আগেই মোক্ষদা ঠাকরুন বলে ওঠেন, "সেকথা আর বলতে হয় না! যার রান্না খেয়ে ও মানুষ, সে যে কত বড় রাঁধিয়ে তা যদি না জানতুম। দাদা তাই ঠাট্টা ক'রে বলত না—'আমাদের বাড়ি জরজ্বারি কারো কখনও হবে না মোক্ষদা, তোর বৌদি যা রাঁধে সব পাঁচন!"

নরেন হেসে বলে, "ভাজের রান্না ননদদের কোন কালে ভালো লাগে না, পিসিমা। কি ভাগ্যি দ্রৌপদীর ননদ ছিল না, নইলে মহাভারতে তাঁর রান্নার সুখ্যাতি আর ব্যাসদেবকে লিখতে হ'ত না।"

সকলে হেসে ওঠে। সরমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

দুপুর বেলা মোক্ষদা ঠাকরুন সরমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "বেটার কাণ্ড দেখেছিস সরো!"

কাণ্ড দেখে সরমা যতটা অবাক হয়, কেন বলা যায় না লজ্জিত হয় তার চেয়ে বেশি। দু'খানি গরদের থান নরেন দু'জনের জন্য রেখে গিয়েছে।

মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন, "কখন চুপি চুপি রেখে পালিয়েছে, জানতেই কি পেরেছি ছাই।"

কিন্তু তা ব'লে মোক্ষদা ঠাকরুন অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হয় না। প্রথমে বলেন বটে—"পয়সাকড়ি ওরা খোলামকুচি মনে করে, জানিস সরো! নেহাৎ যদি কিছু দিতেই ইচ্ছে হয়েছিল একটা সুতির থান দিলেই ত পারতিস বাপু। এ-গরদ কিন্‌তে যাবার কি দরকার!" কিন্তু তার পরেই তাঁর মুখে হাসি দেখা যায়। "তা হোক, ছেদ্দা ক'রে দিয়েছে, পরিস্ বাপু। বিধবা মানুষ, পুজোআচ্চার জন্যে একটা শুদ্ধ বস্তর থাকাও দরকার। আমার পুরানোখানা ত ধোক্‌রা জালি হয়েছিল। নিজের কি আর কেনবার ক্ষ্যামতা আছে! ভাগ্যিস্ নরু দিলে, এখন প'রে বাঁচব!"

হাত পেতে গরদের থানটি সরমাকে নিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। মনে মনে নরেনের ব্যবহারে কেমন যেন একটু অস্বস্তিই সে অনুভব করে। নিজের পিসিমাকে গরদের থান প্রণামী দিতে চায়, সে দিক, কিন্তু তার সঙ্গে সরমাকেও এমন বিব্রত করা কেন! এ-দান প্রত্যাখ্যান করাও যায় না, কিন্তু নিতেও যে তার বাধে।

কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুনের এসব দিকে দৃষ্টি নেই। নিজের খুশিতেই মত্ত হ'য়ে তিনি বলেন, "পর্ না মা একবার, দেখি।"

সরমার কোন আপত্তি তাঁর কাছে টেকে না। সেইখানেতেই তাকে গরদের কাপড়খানি মোক্ষদা ঠাকরুন পরিয়ে ছাড়েন।

তারপর ধীরে ধীরে যা ঘটে, তার সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করা কঠিন। ভাগ্যের অভিশাপে একান্ত প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে যে বীজ চিরদিন নিজের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারত, তাই দেখা যায় একদিন কোথাকার এতটুকু ইঙ্গিতে ও আশ্বাসে হঠাৎ পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

সরমাকেই বা কি দোষ দেব? স্বামীকে সে চেনবার অবসর পর্যন্ত পায় নি।

তার জীবনে প্রথম যে-পুরুষ সমবেদনা ও সহানুভূতির ভেতর দিয়ে যৌবনের অপরূপ রহস্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিলে— সে নরেন।

মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন, "পড় ত মা কি লিখেছে ?"

সরমার পড়তে গিয়ে বারে বারে বেধে যায়। চিঠির খানিকটা পড়ার পরও সরমাকে থামতে দেখে মোক্ষদা ঠাকরুন বলেন, "আর কিছু লেখেনি ?" সরমা চুপ ক'রে থাকে। আর যা নরেন লিখেছে তা এমন কিছু অসাধারণ নয়, তবুও সরমার মুখ দিয়ে তা বেরুতে চায় না। কিন্তু মোক্ষদা ঠাকরুনের জিজ্ঞাসু প্রশ্নের উত্তরে তাকে শেষ পর্যন্ত পড়তেই হয়। নরেন লিখেছে, "তোমাকে প্রণাম জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পাতানো বোন্‌ঝিকে আশীর্বাদ করবার লোভটুকু কোনরকমে সামলে নিলাম পিসিমা। আশীর্বাদ করবার কিই বা আছে ? সারাজীবন তোমাদের ওই হেঁসেলের আগুনে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবার চেয়ে বড় সৌভাগ্য যার জন্য কল্পনা করঁতে পারি না, তাকে আশীর্বাদ করার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস আর কিছু হতে পারে না।"

মোক্ষদা ঠাকরুন কেন বলা যায় না, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেন। সরমার সমস্ত বুকের ভেতরটা কেন যে অমন মোচড় দিয়ে ওঠে, সে ভালো ক'রে বুঝতে পারে না।

কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হতে তখন আর বাকি নেই। নিজের জীবনের নিরবচ্ছিন্ন উষরতায় সুখী না হলেও, দুঃখ করবার যে কিছু আছে একথা সরমা এতদিন জানবার অবসর পায় নি। হঠাৎ নরেন তাকে জীবনের গভীরতম দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয়। সরমা নিজের প্রতি সমবেদনা করতে শেখে। মরুভূমি হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায়।

সরমা নিজেকে সম্বরণ করার চেষ্টা করেনি এমন নয়। নরেনের চিঠি পড়বার পর তার মনে যে ভাঙন ধরে তা নিবারণ করবার জন্যে একবার সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে।

সারাদিন সে একরাত্রের অস্পষ্টভাবে দেখা স্বামীর মুখ মনে করবার চেষ্টা করে। স্নান ক'রে ভিজে কাপড় তার গায়েই শুকোয়। দোতলার বৌটির ঘরে গিয়ে নিজে নিজেই সে তার ছেলেপুলের জামা সেলাই করতে বসে।

তারপর রাত্রে সরমা স্বামীকে স্বপ্ন দেখে। তার বিছানার অত্যন্ত কাছে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, মনে হয়। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। ধীরে ধীরে

সরমার বিছানার ধারে ব'সে একটি হাতে তিনি সরমাকে জড়িয়ে নত হয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু এ কি! এ যে নরেনের মুখ! সরমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে বসে। সারারাত সেদিন আর সে ঘুমোতে সাহস পায় না।

অনেক দিন বাদে নরেন আবার এসেছে। পিসিমা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলেন, "এই একমাসে এমন রোগা হয়েছিস কেন রে? গালের হাড়টাড় একেবারে ঠেলে উঠেছে যে। ভালো ক'রে খাস্‌টাস্‌ না বুঝি।"

নরেন হেসে বলে, "এই যদি ভালো ক'রে না খাওয়ার চেহারা হয় পিসিমা, তাহ'লে তোমাদের বাড়িতে বোধ হয় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। তোমার বোন্‌ঝিটির যা দশা দেখছি......"

পিসিমা হঠাৎ সরমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বলেন, "হ্যাঁরে, মেয়েটা যখন এল কেমন ননীর পুতুলটির মতো চেহারা! ক'দিনে যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে!"

নিজের চেহারার আলোচনায় সরমা লজ্জা পেয়ে ঘরের বার হয়ে যায়। নরেন সেদিকে চেয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। নরেন শুধু রোগা হয় নি, একমাসে যেন অনেক বদ্‌লে গিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেখা যায়— নরেন একলা ঘরে অশান্তভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। চ'লে যাবার আগে এক সময়ে সরমার বিছানার তলায় অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর একটি চিঠি সে লুকিয়ে রেখে যায়।

সরমার হাতে সে-চিঠি দেবার সুযোগ তার মেলেনি এমন নয়; কিন্তু কেন বলা যায় না, সে-সাহস সে শেষ পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পাবে নি।

সে-চিঠিতে কি সে লিখেছিল কে জানে, কারণ সরমার হাতে সে-চিঠি পড়ে নি, পড়লেই বুঝি ভালো হ'ত।

মোক্ষদা ঠাকরুন বিকালে ঘর ঝাঁট দেবার সময়ে তাঁর নিজের ও সরমার দু'জনের বিছানা নতুন ক'রে ঝেড়ে তোলেন। সামান্য একটা কাগজ ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বাইরে কোথায় পরিত্যক্ত হয়েছিল কে জানে! কারুব হাতে সে-চিঠি কোনদিন পড়েছিল কিনা তাও বলা যায় না।

পরের দিন নরেন আবার এল। একরাত্রে তার যেন আরো পরিবর্তন

হয়ে গেছে। পিসিমা বললেন—"এই শীতের রাতে কোথায় শুতে যাস্, কষ্ট হয়, হয়তো! তার চেয়ে সরকার মশাইকে ব'লে দিই, যে ক'টা দিন এখানে থাকিস বাইরের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত ক'রে দিক।"

"আর দরকার হবে না, পিসিমা! আজই চ'লে যাচ্ছি।"

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন—"সে কি রে? এবারে যে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস্?"

"বাড়িতে যাচ্ছি না পিসিমা, এবার অনেক দূর! কখনও ফিরব কিনা তাই জানি না!" —ব'লে নরেন একটু হাসল।

পিসিমা রাগ ক'রে বললেন—"যত সব অলক্ষুনে কথা! আর দূর দূরান্তরে যাবারই বা তোর কিসের দরকার! এত লোকের দেশে অন্ন হচ্ছে আর তোর হয় না?"

নরেন চুপ ক'রে রইল।

"জানি না বাপু, যা ভালো বুঝিস্ তাই কর্!" —ব'লে পিসিমা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সরমাও চ'লে যাচ্ছিল; কিন্তু নরেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার পথ রোধ ক'রে বললে, "একটু দাঁড়াও!"

নরেনের এরকম চেহারা সরমা কখনও দেখেনি। বিমূঢ়ের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

খপ্ ক'রে সরমার হাতটা ধ'রে ফেলে নরেন এবার বললে, "তুমি আমার চিঠির উত্তর দেবে না, আমায় ঘৃণা করবে, আমি জানতাম সরমা; কিন্তু তবু আমি ও-চিঠি না লিখে থাকতে পারি নি। আমায় ক্ষমা করতে হয়তো তুমি পারবে না, তবু এইটুকু শুধু জেনো যে তোমায় অসম্মান করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

সরমা এসব কথার কোন মানেই খুঁজে না পেয়ে ভীত অস্ফুট স্বরে বললে, "আপনি এসব কি বলছেন?"

নরেন সরমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুন্ন-স্বরে বললে, "তুমি তাহ'লে না পড়েই আমার চিঠি ফেলে দিয়েছ! যাক্, ভালোই হয়েছে!"

নরেন নিঃশব্দে গিয়ে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল। ঘর থেকে চ'লে যাবার কোন বাধাই আর সরমার ছিল না, কিন্তু যেতে সে পারলে না।

খানিক চুপ ক'রে থেকে ধরা-গলায় বললে, "কোনো চিঠি তো আমি পাই নি!"

নরেন এবার অবাক হয়ে বললে, "চিঠি পাওনি কি রকম? কি হ'ল তাহলে চিঠির!" সরমার বিছানাটা সে নিজেই এবার উল্টে পাল্টে খুঁজে বললে, "এইখানেই ত চিঠি রেখেছিলাম!"

এ ব্যাপারের গুরুত্ব তখনও সরমা বোঝে নি। এই অবস্থাতেও এবার একটু না হেসে সে পারলে না; বললে, "বিছানার ভেতর চিঠি রাখলেই আমি চিঠি পাবো একথা আপনি ভাবলেন কেমন ক'রে!"

নরেনের মুখ তখন কিন্তু আশঙ্কায় পাংশু হয়ে গেছে, সে ভীত স্বরে বললে, "কিন্তু সে-চিঠি যদি আর কারও হাতে প'ড়ে থাকে সরমা?"

এ-সম্ভাবনার কথা সরমার মনে এতক্ষণ জাগে নি। নরেনের কথায় হঠাৎ এ বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠে' শেষ আশায় ভর ক'রে সে বললে, "আপনি চিঠি রেখেছিলেন ত ঠিক!"

"রেখেছিলাম বৈ কি!"—ব'লে নরেন বিছানাটা আর একবার উল্টে পাল্টে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখল। চিঠি কোথাও নেই।

এই বৃহৎ অনাত্মীয় পরিবারে সেই চিঠি কারুর হাতে পড়ার পর কি যে কেলেঙ্কারি হ'তে পারে তা কল্পনা ক'রে সরমার সমস্ত দেহ তখন আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। দোষ তার থাক বা না থাক, এতক্ষণে কথাটা কি রকম কুৎসিত ভাবে কত লোকের ভেতর জানাজানি হয়ে গেছে কে জানে! হয়তো মোক্ষদা ঠাকরুন পর্যন্ত জানতে পেরেছেন! সকালে হেঁসেলে যা-যা ঘটেছে সমস্তই তার ভীত মনের কাছে এখন বিকৃতরূপে দেখা দেয়। তার মনে হয়, সবাই যেন একথা আগে থাকতে জেনে তার সঙ্গে আজ অদ্ভুত ব্যবহার করেছে। তার স্থির বিশ্বাস হয়, সে ভালো ক'রে লক্ষ্য না করলেও সকলের দৃষ্টিতেই আজ সন্দেহ ও বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সরমার পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসে। এর পর সে সকলের মাঝে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে?

সরমা অসহায়ের মতো হঠাৎ এবার কেঁদে ফেললে। এ-বাড়িতে এসে আর কিছু না শিখুক, কলঙ্ককে সে ভয় করতে শিখেছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিপদের পরিমাণটা তার কাছে অস্বাভাবিক রূপে বড় হয়েই দেখা দিল।

সরমা না কাঁদলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু তার সেই অশ্রুসজল, কাতর অসহায় মুখ দেখে নরেনের মাথার ভেতর কি যেন সহসা ওলট-পালট হয়ে গেল। এতদিনকার সমস্ত সংযম ভুলে হঠাৎ সরমাকে নিবিড়ভাবে বুকের ভেতর সে জড়িয়ে ধরলে।

"কাঁদবার কি হয়েছে, সরমা! এ-বাড়িতে তোমার কলঙ্ক হয়ে থাকে, তাতেই বা ভাবনা কি! এ-বাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর আশ্রয় নেই!"

সরমা উত্তর দিলে না; কিন্তু নরেনের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। নরেনের বুকে মাথা রেখে ফুলে-ফুলে সে কাঁদতে লাগল।

তার মাথার চুলে গভীর স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে নরেন বললে, "এখানকার এই নিরর্থক ব্যর্থ জীবন থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথাই আমি চিঠিতে লিখেছিলাম, সরমা। কিন্তু তা এভাবে সম্ভব হবে আমি ভাবিনি। কে জানে হয়তো বিধাতারই তাই অভিপ্রায়; নইলে সে-চিঠি অমন ক'রে হারাবে কেন?"

সরমা তবু কথা বললে না। কান্না তার তখনও থামেনি; কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এ কান্না যেন তার নিজের মনের হতাশা বেদনা থেকে উঠছে না। নিজের মনের পৃথক কোন অস্তিত্বই যেন তার আর নেই। বিপুল প্রবল দুর্বার কোন রহস্যময় স্রোতে তাকে যেন এখন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে; তার মনের ছোটখাটো ভাবনা চিন্তা ভয়ের কোন মূল্যই যেন আর সেখানে নেই।

নরেন আবার কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে একটি মেয়ে ঘরের একেবারে ভেতরে এসে তাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। নরেনের মুখের কথা মুখেই আট্‌কে রইল, সরমা অস্ফুট স্বরে 'নলিনদি' ব'লে লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

নলিনী যে-কাজেই আসুক, বেশিক্ষণ সে আর দাঁড়াল না। তাদের দিকে একবার বিস্মিতভাবে তাকিয়ে, যেমন এসেছিল তেমনিই নিঃশব্দে সে বার হয়ে গেল। বিমূঢ় নরেন ও সরমা তখনও তেমনি ভাবে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে নরেন ম্লান হেসে বললে, "আমাদের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, সরমা।"

সমস্তদিন সরমা অসুখের নামে সেদিন ঘরেই প'ড়ে রইল। বাইরে এতক্ষণ কি হচ্ছে, তা কল্পনা করবার সাহস পর্যন্ত তার ছিল না। বাইরে যাই হোক, কেলেঙ্কারির ঢেউ যে তার ঘর পর্যন্ত এসে তাকে লাঞ্ছিত করে নি, এরই জন্য সে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। মোক্ষদা ঠাকরুন এক সময়ে ঘরে এসে তার অসুখের খোঁজ নিয়ে গেছলেন; কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত সরমা সাহস করে নি। তাঁর কুশল-প্রশ্নের ভেতর তিরস্কারের ইঙ্গিত না থাকলেও, আশ্বস্ত হবারও সে কিছু পায় নি। নরেনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও সে বিশেষ কিছু ভেবেছে এমন নয়। তার মনের সমস্ত গতিই যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। আনন্দ বিষাদের অতীত কোন লোকে পৌঁছে তার হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে ব'লে মনে হয়। শুধু এইটুকু সে জানে যে, এ-বাড়িতে তার বাস করা এখন থেকে অসম্ভব, তাকে যেতেই হবে।

সেদিন গভীর রাত্রে দেখা যায়, সর্বাঙ্গ দোরোকায় জড়িয়ে ছায়ামূর্তির মতো একটি মেয়ে বিরাট জীর্ণ বাড়িটির নির্জন আঙিনা কম্পিত বুকে পার হয়ে চলেছে। অন্দরমহল পার হয়ে বার-বাড়ির আঙিনা। শীতের অন্ধকার রাত্রে তার চারিধারে কুঠুরিগুলি বিশাল অতিকায় জীবেব মতো ভয়ঙ্কর দেখায়। মেয়েটি সে-আঙিনাও পার হয়ে দরজার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ দরোয়ান পাশে খাটিয়ায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

মেয়েটি নিঃশব্দে দরজা খোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু একি! দরজায় যে তালা দেওয়া!

এ-দরজা বন্ধ থাকতে পারে, একথা সরমার মনে হয় নি। দারুণ হতাশায় তার চোখে জল আসে। হঠাৎ পেছনে কার মৃদু পদ-শব্দ শুনে তার বুক কেঁপে ওঠে। নিঃশব্দে সে দরজার পাশে স'রে দাঁড়ায় বটে; কিন্তু তখন মন তার গভীরতম হতাশায় অসাড় হয়ে গেছে। পদশব্দ আরো কাছে আসে, তারপর হঠাৎ অন্ধকারে সরমা শুনতে পায়, কে যেন খুব কাছে চুপি চুপি তার নাম ধ'রে ডাকছে।

কান্নার আক্ষেপ কোনোরকমে দমন ক'রে সরমা চুপি চুপি বলে, "কে, নলিনদি ?"

"হ্যাঁরে কালামুখী !" ব'লে নলিনী আরো এগিয়ে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলে, "মরতে চলেছ ?"

সরমা এবার একেবারে যেন ভেঙে পড়ে, দাঁড়াবার শক্তিটুকু যেন তার আর নেই। সেইখানেই ধীরে ধীরে ব'সে পড়ে, সে ধরা গলায় কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু নলিনী হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে তাকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ্ !"

তারপর হঠাৎ তালায় চাবি লাগাবার শব্দে সরমা চম্‌কে ওঠে। নলিনদি করছে কি !

দূরেব রাস্তার একটা স্তিমিত আলোর রেখা চোখে পডতেই সরমা বুঝতে পারে দরজা খোলা হয়েছে। বিমূঢ়ভাবে সে উঠে দাঁডায়। নলিনী কটু কণ্ঠে বলে, "চিতা তৈরি, আর দাঁড়িয়ে কেন ? যাও।" সরমা সমস্ত সাবধানতা ভুলে, এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, "আমি যাব না, নলিনদি।"

নলিনী তার কাঁধে একটা হাত রাখে, কিন্তু পূর্বের মতোই তীব্র-কণ্ঠে বলে, "ঢঙ্ আর ভালো লাগে না। আমায় দরজা বন্ধ করতে হবে, যাও।"

সরমা হতাশভাবে আর একবার বলে, "কিন্তু নলিনদি—"

"কিন্তু, আর কিছু নেই ত! মন যার ভেঙেছে, ঘরে থেকে ভড়ং ক'রে তাব কি স্বর্গ হবে ?"

সরমা ধীরে ধীরে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার হাতের মধ্যে কি একটা শক্ত মোড়ক গুঁজে দিয়ে নলিনী বলে, "এই তোমার গলার দড়ি !"

তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

পা চলে না, সরমাকে তবু চলতে হয়। পিছনে দরজা বন্ধ, তবু কেন বলা যায় না— ফিরে ফিরে সে সেদিকে না তাকিয়ে পারে না। নলিনী তার হাতে কি গুঁজে দিয়েছে তা সে বুঝতে পারছে। নলিনীর সধবা অবস্থার এটি একটি সোনার হার। এটির দিকে তাকিয়ে তার চোখের জল আর বাধা মানতে চায় না।

বেশিদূর তাকে অবশ্য যেতে হয় না। গাড়ি নিয়ে নরেন কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। যন্ত্রচালিতের মতো সরমা নরেনের হাত ধ'রে গাড়িতে ওঠে। নরেন কখন পাশে এসে বসে, কখন গাড়ি চলতে সুরু করে, কিছুই সে টের পায় না।

কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, ছুটি নরনারীকে এই অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে পাঠিয়েই গল্প সমাপ্ত করা যেত; কিন্তু তা হবার নয়। সরমার জীবনকে একেবারে ভেস্তে দেবার জন্য তখনও ভাগ্যদেবতার হাতে এমন অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর চাল ছিল, কে জানত!

ছ্যাক্‌রা গাড়ি শীতের রাত্রির নিস্তব্ধ পথ মুখরিত ক'রে অলস-মন্থর গতিতে চলতে থাকে। পাশাপাশি ব'সে থেকেও সরমা ও নরেনের মনে হয়— যেন তারা কোন দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের দুই তীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। হঠাৎ সরমা একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসে।

নরেন বলে, "তোমার কষ্ট হচ্ছে, সরমা?"

"না, কিন্তু তোমার পকেটে কি আছে, গায়ে একটু যেন ফুট্‌ল।"

চল্‌তিপথে রাস্তার একটা গ্যাসের আলো গাড়ির ভেতর এসে পড়েছে। নরেন পকেট থেকে যা বার করে তা দেখতে পেয়ে সরমা চম্‌কে উঠে বলে, "এ কি! এ খেলনা কেন?"

নরেন একটু লজ্জিত হ'য়ে বলে, "ছেলেটার জন্যে কাল কিনেছিলাম, পকেটেই রয়ে গেছে।"

সরমা নিশ্বাস রোধ ক'রে অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করে—"কার জন্যে বল্লে? তোমার ছেলে-মেয়ে আছে?"

নরেন হেসে বলে, "বাঃ, তা জান্‌তে না!"

সরমা অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার স্ত্রী?"

নরেন একটু হেসে বলে, "সে ত দেশে।"

সর্পদষ্টের মতো গাড়ির ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সরমা তীক্ষ্নস্বরে বলে, "গাড়ি থামাও।"

নরেন অবাক হযে বলে, "কেন, পাগল হ'লে নাকি?"

"থামাও বলছি, শিগ্‌গির!" সরমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ন। নরেন তাকে জড়িয়ে ধ'রে বসাবার চেষ্টা ক'রে বলে, "কি পাগলামি করছ! তুমি কি এসব জানতে না নাকি?"

সরমা উন্মত্তের মতো তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলে, "জানতাম মানে?"

"বাঃ, পিসিমার কাছে শোনো নি!"

"পিসিমার সঙ্গে এই কি আমার আলোচনার বিষয়! তুমি গাড়ি থামাও!"

নরেন কাতর স্বরে বলে, "কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝ্ছ সরমা, আমি তোমায় ফাঁকি দিতে চাই নি। আমার সব কথা শোনো আগে!"

সরমা রাগে দুঃখে অপমানে কেঁদে ফেলে বলে, "না গো না, তোমার পায়ে পড়ি; আমি বাড়ি ফিরে যাব, গাড়ি থামাও।"

সরমাকে শান্ত করবার সমস্ত চেষ্টা নরেনের নিষ্ফল হয়ে যায়। সরমার উত্তেজনা দেখে শেষ পর্যন্ত সে একটু ভীতই হয়ে পড়ে— সরমা যেন প্রকৃতিস্থ নয়। একান্ত অনিচ্ছায় সে গাড়ি থামাতে আদেশ দেয়। কিন্তু গাড়োয়ানকে বিদায় দেবার পর সরমাকে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করে; সে বলে, "সে-বাড়িতে তোমার আর ফেরা অসম্ভব, তুমি বুঝ্তে পারছ না সরমা!" তারপর একটু থেমে আবার বলে, "তোমাকে সত্যিই আমি ঠকাতে চাইনি; আমি ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তুমি জানো। আর এসব জেনেও তোমার এত বিচলিত হবার কি আছে সরমা, বুঝতে পারছি না। আমাদের অতীত যেমনই কেন হোক না, এখনকার ভালোবাসাই আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য নয় কি?"

সরমা কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে চলতে স্বরু করে। কোথায় সে যাবে, নিজেই জানে না। পৃথিবীতে কোন আশ্রয় আর তার নেই একথা সে বোঝে, তবু তার যাওয়া চাই; নরেনের কাছ থেকে, তার নিজের কাছ থেকে, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে তাকে বুঝি দূরে স'রে যেতেই হবে। নরেন সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে বলে, "তোমার এ-বিপদের জন্যে আমি দায়ী, সরমা! আমায় তুমি অন্ততঃ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসরটুকু দাও। আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার সঙ্গে গেলে, তোমার অসম্মান কখনও আমি করব না!"

কিন্তু সরমার থামবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে উন্মত্তভাবে ব্যাকুল স্বরে বলে, "দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে আর এস না। একলা গেলে এখনও আমার আশ্রয় মিলতে পারে। আমার সে-পথও নষ্ট কোরো না!"

এর পর নরেনের পক্ষে আর সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব। তবুও আর একবার অপরিচিত পথে গভীর রাত্রে একলা হাঁটার বিপদের কথা সে সরমাকে বোঝাতে

চেষ্টা করে, কিন্তু সরমা অটল।—পথ সে চেনে, তার সঙ্গে কারো যাবার প্রয়োজন নেই।

নরেন আর এগুতে পারে না। ধীরে ধীরে সরমা শীতের রাতের কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

.. .. ..

সেদিন শীতের রাত্রে একটি ক্লান্ত কাতর মেয়ে অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার নিস্তব্ধ নির্জন পথে পথে কোথায় যে ঘুরে ফিরেছিল, কেউ তা' জানে না। শুধু এইটুকু আমরা জানি যে হঠাৎ এক সময়ে গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে একটি ছোট্ট রেলিং-ঘেরা জমি আবিষ্কার করে।

পৃথিবীতে সমস্ত দ্বার যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন এই বিবর্ণ ঘাসের জমিটুকু সরমাকে বহুকালের হারানো মেয়ের মতো কোল দিয়ে তার ব্যর্থ জীবনের উপর কুয়াশার যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

# হয়তো

গভীর দুর্যোগের রাত্রি······

ভীত শহর যেন এই অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া গোপনে রাখিতে চায়।

নির্জন পথের যেখানে যেখানে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে, সেখানে মাটি আর চোখে পড়ে না—শুধু বৃষ্টিধারাহত জল চিক্ চিক্ করিতেছে দেখা যায়। পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মতো মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি রাত্রিতে আকাশের উৎপীড়নে বিপর্যস্ত পৃথিবীকে হঠাৎ বড় অসহায় বলিয়া মনে হয়। অকস্মাৎ যেন এই ক্ষুদ্র গ্রহটির দুর্বল কয়েকটি প্রাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর হতাশায় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

পথের ধারে গ্যাসের আলোগুলি কেমন নিষ্প্রভ হইয়া গেছে—সমস্ত মানব-জাতির আশার সঙ্গে, কেন জানি না, তাহার একটি উপমা বারবার মনে আসিতে চায়।

বাস্ হইতে নামিয়া নির্জন কর্দমাক্ত পথ দিয়া, বৃষ্টির ঝাপ্টা হইতে দেহকে বাঁচাইবার নিস্ফল চেষ্টা করিতে করিতে এমনি সব চিন্তা লইয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। কিন্তু মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হতাশা ছাড়া আরেকটি ভয় মনের গোপনে ছিল—সে-আশঙ্কা ব্যক্তিগত ও তাহার হেতু অত্যন্ত স্পষ্ট।

পথ অনেকখানি; মাঝে একটা নূতন অর্ধসমাপ্ত সেতু পার হইতে হইবে। সেতুটি এখনও চলাচলের উপযুক্ত হইয়া ওঠে নাই। চলিবার রাস্তা সংকীর্ণ। ধারের রেলিঙ দেওয়া হয় নাই। সাধারণ অবস্থাতেই এক একটি কাঠের তক্তার উপর সন্তর্পণে পা রাখিয়া চলিতে হয়—এই দুর্যোগের রাত্রে সে-সেতু পার হইতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। মনে মনে সেই বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্যই সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছিলাম।

পোলের নিকট আসিয়া কিন্তু অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। সারাদিনের ভিতর পোলটির নির্মাণকার্য বেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ধারে রেলিঙ দেওয়া হয় নাই কিন্তু কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িবার ভয় আর নাই—কাঠগুলি মজবুত করিয়া ইতিমধ্যে জোড়া হইয়াছে।

চেন দিয়া ঝোলানো পোলটি ঝড়ের বেগে দুলিতেছিল। ভয় যে একটু না হইতেছিল এমন নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরিয়া হইয়া তাহার উপর পা বাড়াইয়া দিলাম। পোল পার না হইলে এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আরও এক মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়।

পা দিয়াই বুঝিলাম ঝড়ের সহিত যুঝিয়া এই দোদুল্যমান পোল পার হওয়া সহজ কথা নয়। শুধু সাহস নয়, শক্তিরও প্রয়োজন। ঝড়ের বেগ খোলা নদীর উপর এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে প্রতি মুহূর্তেই একেবারে নিচে গিযা পড়িবার সম্ভাবনা।

লোকজন কেহ কোথাও নাই। এই জনহীন সেতুর উপর অহংকার বিসর্জন দিয়া হামাগুড়ি দিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি— চিন্তা করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসব হইযাছি এমন সময়—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পোলের এপার হইতে একটি টিমটিমে কেরোসিনের বাতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ওপারের অন্ধকারকে একটু তরল করিতে পারিয়াছে মাত্র।

সেই তরল অন্ধকারে দুইটি অস্পষ্ট মূর্তি চোখে পড়িল। তাহারা ওধার হইতে পোল পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাদের একটি মূর্তি নারীর।

এই অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে দুইটি নরনারী কি এমন প্রয়োজনে এই বিপদ-সঙ্কুল সেতুপথ পার হইতে আসিয়াছে, একথা ভাবিয়া সেদিন থমকিয়া দাঁড়াই নাই।

এ দুর্যোগের রাতে এরূপ ব্যাপার যতই কৌতূহলজনক হোক না কেন বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু ওপারের তরল অন্ধকারে দুইটি নাতিস্পষ্ট নরনারী-মূর্তির যে আচরণ চোখে পড়িল তাহা সত্যই অসাধারণ।

মেয়েটি আসিতে চায় না। শুধু পোল পার হইবার ভয়ে, না আর কোনো গভীরতর আশঙ্কা জানি না, সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণে পুরুষটির

আকর্ষণ সে যেন প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছিল। ঝড়ের শব্দের ভিতর দিয়া তাহাদের যে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইতেছিলাম তাহাতে পুরুষটি তাহাকে আশ্বাস দিতে চাহিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

ঝড়ের সহিত যুঝিয়া তখন সেতুর মাঝামাঝি আসিয়া পৌছিয়াছি। দেখিলাম, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি অত্যন্ত যেন অনিচ্ছার সহিত রাজী হইয়াছে। পুরুষটি তাহার হাত ধরিয়া ওদিক হইতে পোলের উপর অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া তাহাদের মুখোমুখি হইলাম। পুরুষ ও মেয়েটি উভয়েই সর্বাঙ্গে তিনপুরু কাপড় মুড়ি দিয়া আছে। কিন্তু সেই কাপড়ের জঙ্গলের ভিতরেই কেরোসিন তেলের বাতির অস্পষ্ট আলোকে মেয়েটির মুখটি চকিতে দেখিয়া আর একবার চমকিয়া উঠিলাম।

শীর্ণ রুগ্ন মুখে, দুইটি দীর্ঘায়ত চোখ— সে-চোখে অসহায় আতঙ্কের যে-ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা মানুষের চোখে সম্ভব বলিয়া ভাবি নাই। কৌতূহল বাড়িয়াই যাইতেছিল। কিন্তু উপায় কি!

পোল প্রায় পার হইয়া আসিয়াছি। এমন সময় পিছনে অমানুষিক চিৎকার শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

সর্বনাশ!

আমার চোখের উপর অসহায় চিৎকার করিয়া মেয়েটি পোলের ধার হইতে টাল সামলাইতে না পারিয়া নিচে পড়িয়া গেল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেলাম। পুরুষটি বোধ হয় আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। যেভাবে সে কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার নিকট কোনো সাহায্য পাইবার আশা নাই বুঝিলাম।

কিন্তু অন্ধকারে এই ঝড়ের ভিতর গভীর নদী হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার জন্য আমিই বা কি করিতে পারি!

এতক্ষণে স্রোতের টানে সে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, কে জানে! সাঁতার জানিলেও এই রাত্রে তাহাকে নদী হইতে উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব! — সাঁতারও জানি না।

হঠাৎ বহু নিম্ন হইতে অস্পষ্ট কাতর আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পর মুহূর্তেই তাহার শাড়ির প্রান্তটুকু চোখে পড়িল।

পড়িবার সময় তাহার শাড়ির একটি অংশ কেমন করিয়া লোহার একটি

বল্টুতে আটকাইয়া গিয়াছে— মেয়েটি জলে পড়ে নাই। কাপড়ের সহিত জড়াইয়া নিম্নমুখ হইয়া অন্ধকার নদীর উপর ঝুলিতেছে।

ঠেলা দিয়া অপরিচিত লোকটির আচ্ছন্ন ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম— "শিগ্‌গির এসে ধরুন, এখনও হয়তো টেনে তুলতে পারি।" লোকটি যন্ত্র-চালিতের মতো আসিয়া আমার আদেশ পালন করিল।

মেয়েটি সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতা বিনিময়ের তখন সময় ছিল না, পরিচয় জিজ্ঞাসারও নয়— নইলে অনেক কথাই হয়তো শুনিতে পারিতাম।

সাবধানে তাহাদের পার করিয়া দিয়া আবার সেই পোলের উপর দিয়া সভয়ে পার হইবার সময় যে কয়টি কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাই আমার মনে চিরন্তন সন্দেহ ও বিস্ময় জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মেয়েটি পুরুষের সহিত চলিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল— "কি আশ্চর্য দেখ, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হ'ল, তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফস্‌কে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হ'ল তুমি ঠেলে দিলে······"

তাহাদের কথা ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। লোকটির হাসি শুনিতে পাইলাম। সে যেন বলিতেছিল·····

"পাগল! কি যে বলো; আমি ঠেলে দেব তোমায়······"

সে-ঘটনাটি ভুলিতে পারি নাই। সময়ে অসময়ে সেই বিপদসঙ্কুল সেতুর উপর অস্পষ্টভাবে দেখা মূর্তি দুইটি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ, নানা প্রশ্ন মনে জাগে। তাহারা সেই ঝড়ের রাত্রে কেন কোথা হইতে সে-পোল পার হইতে আসিয়াছিল, মেয়েটি কেমন করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, রক্ষা পাইয়া অমন কথাই বা সে বলিল কেন এবং তাহার পর তাহারা কোথায় যে গেল তাহার কিছুই জানি না। তবু তাহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে নানা কথা মন রচনা করে।

সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্ট দেখা দুইটি মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।

প্রকাণ্ড সাতমহলা দালান।

কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারিধারে শুধু ভাঙা নোনাধরা ইট কাঠের স্তূপ। বাহির হইতে দেখিলে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ি বলিয়া

মনে হয়। এই জরাজীর্ণ বাড়িটির কোন গোপন কক্ষে এখনো তাহার মুমূর্ষু প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে একথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দিনের বেলায় সে-প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। দেউড়ির সিংদরজা ভেদ করিয়া যে-অশ্বত্থগাছটি শাখায় প্রশাখায় বিপুল হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া ঘুঘু ডাকে। কাঠবেড়ালির দল নির্ভয়ে ভূতপূর্ব বারবাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফেরে।

এই ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে কোথায় মানুষের জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

রাত্রে কিন্তু বহু দূর হইতে দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কোথা হইতে ক্ষীণ আলোকের রেখা আসিতেছে। এ-বাড়ির ইতিহাস যাহাদের জানা নাই, বিদেশী সে-সব পথিক ভয়ও যে পায়না এমন নয়।

গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া এই ধ্বংসাবশেষের পাশে একদিন লাবণ্য পাল্‌কি হইতে নামিয়াছিল।

বাপের বাড়ি হইতে যে ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল সে তো মাটিতে পা দিয়াই ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল— "কেমনতর বেআক্কিলে বেহারা গা! এই বাড়িটার সামনে নামালে— বরকনের অকল্যাণ হবে না!"

যে-পুরোহিত বরপক্ষের হইয়া বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন পথে তাঁহার সহিত পরিচারিকার কয়েকবার বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিযাছে। তাঁহার দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও, সম্বোধনের দূরত্বটা ঘুচিয়া গিয়াছিল।

তিনি দাঁত খিচাইয়া জবাব দিলেন, "মর্ মাগি, ভুতুড়ে বাড়ি হতে যাবে কেন? নিয়োগীদের সাতপুরুষের কোটা— এ-তল্লাটে জানে না এমন লোক নেই। ওর কাছে হ'ল ভুতুড়ে বাড়ি!"

ঝি কপালে চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিল— "ওমা, এরা বলে কি গো! এই পোড়োবাড়িতে মানুষ থাকে!" তাহার পর কন্যার পিতার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কঠোর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিল— "মিন্‌সে পয়সা খরচের ভয়ে করলে কি গো! মেয়েটাকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলতে এই জঙ্গলে পাঠালে!"

অবগুণ্ঠিত লাবণ্য তখন স্বামীর সহিত গাঁটছড়া-বাঁধা হইয়া পাল্‌কি হইতে নামিয়াছে।

পুরোহিত ঝিয়ের সহিত বাক্যব্যয় নিষ্ফল মনে করিয়াই বোধ হয় পথ দেখাইয়া আগে চলিতে স্বরু করিয়াছেন।

পথ দেখানোটা কথার কথা নয়, একান্ত প্রয়োজন। ভাঙা ইট কাঠের স্তূপের উপর দিয়া, হাঁটুভর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার বহুদিনের সঞ্চিত শেওলার ভ্যাপ্সা গন্ধভারাক্রান্ত পথ দিয়া পদে পদে হোঁচট্ খাইতে খাইতে লাবণ্য তাহার স্বামীর পিছু পিছু চলিতেছিল। পিছনে ঝি বাধ্য হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে আপন মনেই গজ্ গজ্ করিতেছিল— "সাত জন্মে এমন বিয়ের কথা কোথাও শুনিনি মা। বিয়ে করতে এল, তার বরযাত্তর নেই, বরকর্তা নেই! ট্যাং ট্যাং ক'রে এক মড়িপোড়া পুরুত এল বরকে নিয়ে; আর খোঁজ নিলে না, শুধুলে না, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে ধ'রে দিলে গা! আর এরা কোথাকার আথ্‌খুটে গো! জ্ঞাতগোত্তর নেই, পাড়াপড়শী নেই, বিয়ে ক'রে এল তা বরকনেকে বরণ করতে এল না কেউ! শ্যাল-কুকুরের বিয়েতেও যে এর চেয়ে নেম কান্থন আছে···"

লাবণ্য এত কথা শুনিতে বোধ হয় পায় নাই। আচ্ছন্নের মতো ভীত অসহায় ভাবে চলিতে চলিতে শুধু তাহার মনে হইতেছিল, কেহ যদি শুধু হাতটা বাড়াইয়া একবারটি তাহাকে ধরে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু কেহ হাত বাড়াইল না।

গজ্ গজ্ করিতে করিতে এক সময়ে ঝি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল— "বলি, ও মুখপোড়া বামুন, কোন্ চুলোয়'নিয়ে চলেছ শুনি?"

ব্রাহ্মণ এইবার উত্তর দিলেন— "তোকে গোর দিতে রে মাগী!"

উত্তরে ঝি যাহা বলিতে স্বরু করিল, তাহাতে আর যাহাই হোক লাবণ্যের প্রথম স্বামীগৃহে পদার্পণের পুণ্যক্ষণ মধুর হইয়া উঠিল না।

ঝিয়ের আস্ফালন কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। সহসা অন্ধকার পথ কাহার সুমধুর কলহাস্যে-মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঝি চমকিয়া চুপ করিল। লাবণ্য ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এই সুমধুর হাস্যের উৎস ঠাওর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

যে হাসিয়াছিল তাহারই অপরূপ কণ্ঠ শোনা গেল— "দাদা যে চুপি চুপি বৌ এনে ফেলেছে গো!"

অন্ধকার পথ তখন শেষ হইয়াছে। সামনেই নাতিবৃহৎ অঙ্গন এবং সেই অঙ্গনের চারিধার ঘিরিয়া ঘরের সারি।

আলোতে আসিয়া দাঁড়াইতেই শাঁখ বাজানো থামাইয়া যে-মেয়েটি আসিয়া লাবণ্যের মুখের ঘোমটা সরাইয়া আর একবার মধুর হাস্যে সমস্ত বাড়ি মুখর করিয়া তুলিল, তাহার মুখের দিকে একটি নিমেষের জন্য চাহিয়া চোখ নামাইলেও লাবণ্যের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

নারীর দেহে এত রূপ সম্ভব, লাবণ্যের কখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল— "ওমা কেমন বৌ গো, প্রণাম করে না কেন! প্রণাম করতে জানো না?"

কাহাকে প্রণাম করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য হেঁট হইয়া মেয়েটিকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। মেয়েটি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া সরিয়া গিয়া বলিল— "আমাকে নয় গো, আমাকে নয়, পিসিমাকে দেখতে পাচ্ছ না?"

লাবণ্য দেখিল। দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল।

শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।

লাবণ্যের সংসার সুরু হইল।

ঝি দুই দিন থাকিবার পর ভুতুড়ে বাড়ি সম্বন্ধে নানারূপ অসংলগ্ন মন্তব্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিটি মাত্র প্রাণী এই বিশাল ভগ্ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তিনটি ঘরে বাস করে। উপরে নিচে চারিধারে শুধু আগাছার জঙ্গল ও অব্যবহার্য পবিত্যক্ত ঘরের সারি। তাহার কোনোটির কড়ি-কাঠ ঝুলিয়া ছাদ পড়-পড় হইয়াছে। কোনোটার দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। মাকড়শা, চামচিকে ও ইঁদুর তাহাদের সবগুলিকেই দখল করিয়া আছে।

পোড়ো বাড়ির ঘরগুলির মতো বাড়ির বাসিন্দাগুলিও রহস্যময়। পিসিমা বলিয়া প্রথম দিন যাঁহাকে প্রণাম করিতে হইয়াছিল, তাঁহার দেখাই বড় মিলে না। অন্ধকার একটি কোণের ঘরে সারাদিন তিনি খুট্‌খাট্ করিয়া কি যে করেন কিছুই জানিবার উপায় নাই। সে-ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতে যে তিনি চাহেন না, একথা বুঝিতে লাবণ্যের বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। দৈবাৎ

কখনও সামনা-সামনি পড়িয়া গিয়া চোখোচোখি হইয়া গেলে তিনি এমন ভাবে তাহার দিকে তাকান, যে, অকারণে লাবণ্যের বুকের ভিতর পর্যন্ত হিম হইয়া যায়।

স্বামীকেও সে বুঝিতে পারে না। সারাদিন কাজ-কর্ম লইয়া একরকম সে ভুলিয়া থাকে। রাত্রে কিন্তু শয়নঘরে ঢুকিতে তাহার কেমন যেন ভয় করে।

ঘরটি প্রকাণ্ড। কড়িকাঠ যেখানে যেখানে দুর্বল, সেখানে বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে জোর দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বড় অদ্ভুত দেখায়। দুইধারে দুইটি জানালা। একটি খুলিলে সম্মুখের প্রকাণ্ড বাঁশবাগান ও পুকুর চোখে পড়ে। আরেকটি বন্ধই থাকে। একদিন খুলিতে গিয়া ভয়ে আর লাবণ্য সে-চেষ্টা করে নাই। সে-জানালার পাশেই অব্যবহার্য একটি অন্ধকার ঘর ভাঙা কাঠ-কাঠরা জঞ্জালে বোঝাই হইয়া আছে। জানালা খুলিবা মাত্র ঝট্‌পট্‌ কিসের একটা শব্দ শুনিয়া সভয়ে আবার লাবণ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হয়তো চামচিকাই হইবে, কিন্তু লাবণ্যের ভয় যায় নাই।

লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়া হয়তো দেখে স্বামী আগে হইতেই বিছানায় বসিয়া আছে। তাহাব দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সঙ্কুচিত ভাবে সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর ধীরে ধীরে হয়তো বিছানার এক পাশে বসে। স্বামী তবুও ফিরিয়া চাহে না; নিজের চিন্তাতেই তন্ময় হইয়া থাকে।

তাহার পর হঠাৎ এক সময়ে স্বামী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরে চুম্বনে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়। স্বামীর কঠিন বাহুবন্ধনের ভিতর নিশ্চিন্ত আরামে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া কিন্তু লাবণ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না— তাহার মনের কোথায় যেন একটি বাধা থাকিয়া যায়।

সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইয়া বাম বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া স্বামী জিজ্ঞাসা করে— "তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না তো লাবণ্য ?"

লাবণ্য ঘাড় নাড়িয়া জানায়— না তাহার কষ্ট হইতেছে না।

"আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?"

অত্যন্ত সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর। সলজ্জভাবে 'হুঁ' বলিয়া লাবণ্য স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলে।

কিন্তু এই সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ অসাধারণ রূপ গ্রহণ করে। স্বামী

সজোরে তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলে— "অত্যন্ত সহজে হুঁ ব'লে ফেল্লে, কেমন ? পছন্দ হওয়াটা তোমাদের কাছে এমনি সহজ ব্যাপার !"

লাবণ্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। স্বামীর গলা আরও চড়িয়া যায় —

উত্তেজিতভাবে বলিতে থাকে— "একবার জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নিলেই পছন্দ হয়ে গেল ! এই তো পছন্দের দাম ? কেমন, না ?"

লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে।

স্বামী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্তের মতো জিজ্ঞাসা করে, "বলো, চুপ ক'রে আছ কেন ? উত্তর দিতে পারো না ?"

এ-কথার উত্তরে কি বলিতে হইবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য চুপ কবিয়া থাকে। স্বামী অশান্তভাবে ঘরের ভিতর পাযচারি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু স্বামীর উত্তেজনা যেমন বেগে আসে তেমনি তাড়াতাড়ি শান্ত হইয়া যায়।

শান্তভাবে আবার তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলে— "রাগ করলে লাবণ্য ?"

লাবণ্য ধরা-গলায় বলে, "না, তুমি অমন করছিলে কেন ?"

"ও কিছু নয়, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করলাম ! তুমি আমায় সারাজীবন সত্যি ভালোবাসবে তো ? —বাসবে ?"

লাবণ্যের মুখে হাসি দেখা দেয়। আরেকবার স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সে ধীরে ধীরে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে, "তুমি বুঝি বাসবে না ?"

কিন্তু স্বামীর ঠাট্টার সমাপ্তি ওইখানেই নয়। অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া হয়তো লাবণ্য দেখে— ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বাতিটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এবং স্বামী বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

সে-দৃষ্টিতে অনুরাগের কোমলতা নাই— সে-দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ !

লাবণ্য চোখ খুলিয়া চাহিতেই স্বামী যেন অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়া সরিয়া বসে।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করে— "অমন ক'রে উঠে বসেছিলে কেন গো ?"

"নাঃ, কিছু না— তুমি ঘুমের মধ্যে কি যেন বলছিলে তাই শুনছিলাম !"

"কি বলছিলাম ?"

"না, না, বলোনি কিছু। যদি কিছু বলো তাই শুনছিলাম।" —বলিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া স্বামী তাহার উঠিয়া পড়ে।

আর একদিন ভোরের বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া লাবণ্য অবাক হইয়া গেল। ঘরের ভিতর তখনও অন্ধকার। দেওয়ালের আলো তেলের অভাবে বোধ হয় নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকাল হইতেও আর দেরি নাই। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বাঁশবাগানেব মাথায় আকাশের রঙ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিতেছে দেখা যায়। বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ বাধা পাইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহার অঞ্চলপ্রান্ত নিজের কাপড়ের খুঁটের সহিত স্বামী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর এই রসিকতায় মনে মনে হাসিয়া ধীরে ধীরে সে গেরো খুলিয়া লইতেছিল এমন সময়ে কাপড়ে সামান্য টান লাগায় স্বামী জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া সে এমন কাণ্ড যে করিয়া বসিবে একথা লাবণ্য কল্পনাও করিতে পারে নাই। সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বামী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল— "কোথায়? কোথায় যাচ্ছ এত রাত্রে? কোথায়?"

স্বামীর ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই মনে করিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলিল— "স্বপ্ন দেখছ নাকি! আমি গো আমি! হাত ছাড়ো, লাগছে!"

স্বামী কিন্তু উচ্চতর কণ্ঠে বলিল— "হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি, তুমি; তোমায় চিনি! কোথায় যাচ্ছ বলো শিগ্‌গির; নইলে খুন ক'রে ফেলব!"

এবার লাবণ্য একটু বিরক্তই হইল— বলিল, "খুন করবার আগে ভালো ক'রে একটু চোখ দু'টো রগ্‌ড়ে দেখ! ভোর হয়েছে, উঠতে হবে না?"

পূর্বেব জানালা দিয়া আকাশের রক্ত আভা তখন ঘরের ভিতর পর্যন্ত ঈষৎ রাঙাইয়া দিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া স্বামী খানিক চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"চোর ব'লে আরেকটু হ'লে তোমায় খুন করতে যাচ্ছিলুম আর কি! ভারী বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম।"

হয়তো কথাটা সত্য! কিন্তু লাবণ্যের মনে কেমন একটি সন্দেহ জাগিতে থাকে। কাপড়ে গিঁট দেওয়ার রসিকতাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে।

স্বামীকে সে বুঝিতে পারে না বটে কিন্তু এ-বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে তাহার

আরো দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয়। বয়সে সে তাহার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে —নাম মাধুরী। সে যে এ-বাড়ির কে, এই পরিবারটির সহিত তাহার সম্বন্ধ যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহার স্বামীকে সে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে— সুতরাং ভগিনীস্থানীয়া কেহ হইবে। কিন্তু আপনার ভগিনী যে নয়, এ বিষয়ে শুধু চেহারা দেখিয়া নয়, তাহার আচরণ দেখিয়াও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

মাধুরীর বিবাহ হইয়াছে কি না বলা অসম্ভব। সে চওড়াপাড় শাড়ি পরে, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলংকার সারাক্ষণ ঝলমল করে, পায়ে আলতা পরিয়া বিম্বফলের মতো অধর দু'টি তাম্বুলে রঞ্জিত করিয়া সারাদিন সে পটের ছবিটি সাজিয়া থাকে। অথচ তাহার মাথায় সিঁদুর নাই এবং বিবাহের বয়স অনেকদিন পার হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

তাহার গতিবিধিও রহস্যময়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। হঠাৎ কখন কোথা হইতে আসিয়া লাবণ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া হয়তো বলে— "তোকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি ভাই, চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই।"

অর্থহীন অসংলগ্ন কথা; তবু লাবণ্যকে হাসিয়া জবাব দিতে হয়— "কোথায় পালাব?"

"কেন দিল্লী, লাহোর! তুই সাজ্‌বি বর, আমি হব তোর কনে। তুই মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবি আর ছোট-বড় চুল ছেঁটে পাঞ্জাবি চড়িয়ে উড়ুনি উড়িয়ে বেরুবি আর আমি তোর পাশে ঘোম্‌টা দিয়ে থাকব। রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবি তো?"

লাবণ্য বলে— "কেন, তুমিই বর হও না!"

"দূর, তাহলে মানাবে কেন? আমার এ-রূপ কি কোঁচা চাদরে ঢাকা যাবে রে হতভাগী!" বলিয়া হাসিয়া আবার মাধুরী উধাও হইয়া যায় এবং খানিক বাদেই হয়তো আবার ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনরতা লাবণ্যের কড়ায় এক খাম্‌চা নুন টপ্‌ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলে—"বাপের বাড়ি খালি গিলতে শিখেছিলি বুঝি? রাঁধতেও শিখিস্‌ নি ছাই!"

লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া বলে— "ও কি করলে ঠাকুরঝি! নুন যে দিয়েছি একবার!"

"বেশ তো, খেতে গিয়ে দাদার মুখ পুড়ে যাবে, আর তুই গাল খাবি।" বলিয়া মাধুরী হাসিতে থাকে। সে-হাসি দেখিলে সব অপরাধ, সব অন্যায় মার্জনা করা যায়।

কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলে, "তুমি ভারী দুষ্টু।"

"আর তুই লক্ষ্মীর প্যাঁচাটি!" বলিয়া রাগ দেখাইয়া মাধুরী চলিয়া যায়। লাবণ্য হাসিতে থাকে।

মাধুরীর হালচালই এমনি। লাবণ্য তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারে নাই। এই ভয়ঙ্কর বাড়িটির ভিতর লাবণ্যের শঙ্কিত সন্ত্রস্ত মন শুধু এই মেয়েটির কাছে আসিয়াই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। প্রথম দিন হইতেই তাহার অদ্ভুত আচরণের পরিচয় সে পাইয়াছে। তবু মুগ্ধ হইয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে আয়োজন অনুষ্ঠান কিছুই তাহাদের হয় নাই। বাপের বাড়ির ঝি তখন উপস্থিত। ইহাদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে নানা কঠোর মন্তব্য উচ্চ-স্বরে অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াও কোনো ফল না হওয়ায় অবশেষে ঝি নিজেই তাহাকে সারা বিকাল সাজাইয়া গোছাইয়া শয়নঘরে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল।

নির্জন ঘর। জড়সড় হইয়া একা সে-ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লজ্জা ও ভয়ের তাহার আর সীমা ছিল না। মাধুরী সকালে একবার তাহাকে দেখা দিয়াই সেই যে অন্তর্ধান হইয়াছিল, সারাদিন তাহার আর দেখা মিলে নাই। স্বামীও কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন কে জানে? কত রাত তাহাকে এমনি নিঃসঙ্গভাবে নির্জন ঘরে কাটাইতে হইবে, ঝি-এর কাছে পুনর্বার ফিরিয়া যাওয়া উচিত কিনা— ভাবিতে ভাবিতে লাবণ্য হঠাৎ চোখে হাত চাপা পড়ায় চমকিয়া উঠিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল, স্বামীই বুঝি আসিয়াছেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল এমন কোমল অঙ্গুলি পুরুষের হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে হাসি শুনিয়া তাহার সন্দেহ সহজেই দূর হইয়া গেল।

মাধুরী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া সামনে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া চোখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল, "মেয়ের কি আস্পর্ধা, উনি ভেবেছেন ওঁর বর বুঝি এসে চোখ টিপেছে! বরের দায় পড়েছে!"

পরিচয় তখনও গভীর হয় নাই, তবু লাবণ্য না বলিয়া থাকিতে পারে নাই— "যাঃ, আমি বুঝি তাই ভেবেছি !"

"তবে কি ভেবেছ শুনি ? ও-পাড়ার বেন্দা বোষ্টম এসে চোখ টিপছে !"

"যাঃ" বলিয়া চোখ তুলিয়া মাধুরীর দিকে চাহিয়াই লাবণ্য একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

সর্বাঙ্গ পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া মাধুরী সাক্ষাৎ বনদেবীর মতোই সাজিয়া আসিয়াছে। সে-রূপ দেখিয়া চোখ ফেরানো দুষ্কর। এত ফুলই বা সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল কে জানে ?

"অমন ক'রে অবাক হয়ে দেখছিস কি বল্ দেখি ?" —বলিয়া লাবণ্যের পাশে বসিয়া পড়িয়া মাধুরী আবার বলিল, "এখন বল্ দেখি, তোর ফুলশয্যা না আমার ?"

অদ্ভুত কথা ! তবু লাবণ্য হাসিয়া বলিয়াছিল— "তোমারই তো দেখছি !"

"শেষ পর্যন্ত দেখতে পারবি তো ?" বলিয়া সহসা কলহাস্যে সমস্ত ঘর মুখবিত করিয়া মাধুরী জোর করিয়া লাবণ্যকে ঠেলিতে ঠেলিতে আবার বলিযাছিল— "তবে বেরো ঘর থেকে ! দেখি তোর বুকের জোর !"

লাবণ্য হাসিতেছিল। ঠেলা দিতে দিতে সত্য সত্যই তাহাকে দরজার কাছ পর্যন্ত সবাইয়া লইয়া গিয়া হঠাৎ মাধুরী থামিয়া বলিয়াছিল— "এই যে মহিদা ! আব বুঝি তর সইল না ? এই নাও বাপু, তোমার বউ এখনও পর্যন্ত আস্তই আছে ! আরেকটু হলেই ঠেলে ঘরের বার ক'রে দিয়েছিলাম আর কি ?"

মহিম দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তাহার অত্যন্ত গম্ভীর। মাধুরীর বসিকতা তাহাকে স্পর্শই করে নাই যেন।

স্বামীর সামনে পডিয়া গিয়া লাবণ্য একেবারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁডাইয়া পড়িয়াছিল। মাধুরী তাহাকে হিড় হিড করিয়া টানিয়া একেবারে বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"নে তাডাতাড়ি দখল কর্ ভাই ; আমি যাই। মানুষের মন তো, মতিভ্রম হতে কতক্ষণ।"

মহিমের দিকে হাসিয়া একবার চাহিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গিয়াছিল কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ফিরিয়া আসিয়া দরজা হইতে একটা পুঁটুলি ঘরের ভিতর

ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল— "তোমার বৌ-এর ফুলের গহনা নাও মহিদা, তাড়াতাড়িতে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম !"

মহিম গম্ভীর মুখে পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া বিছানার উপর নামাইয়া খুলিয়া ফেলিতেই কিন্তু দেখা গিয়াছিল তাড়াতাড়ি খুলিবার দরুন বা পুঁটুলি করিয়া বাঁধিবার জন্য যে কারণেই হোক ফুলগুলি সমস্তই চট্‌কানো।

মাধুরীর সব আচরণের অর্থ বোঝা যাক বা না যাক্, লাবণ্য সেইদিনই তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

রহস্যপুরীর মাঝখানে এমনি করিয়া দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভয়ে আনন্দে লাবণ্যের দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। বিমাতা-শাসিত বাপের বাড়িতে সুখের সহিত পরিচয় তাহার বড় বেশি হয় নাই, সুতরাং এখানকাব দুঃখে অভাবে বড় বেশি বিচলিত হইবার তাহার কথা নয়। এ-বাড়ির রহস্য এবং ভীতিও ক্রমশঃ তাহার গা-সওয়া হইয়া আসিতেছিল। বাপের বাড়ি হইতে কালে-ভদ্রে কেহ খোঁজ লইতে আসে— সেখানে যাইবাব কিন্তু তাহার আর উপায় নাই সে বোঝে। বুঝি তাহার ইচ্ছাও নাই। এখানেও কোনরকমে জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিবার সাহস ও সহিষ্ণুতা সে অনেকটা সঞ্চয় করিয়াও ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়—

সকাল বেলা। দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাই তাড়াতাড়ি সেদিন মহিম খাওয়া সারিয়া লইয়াছে। পান দিবার জন্য লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল। মহিম তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল— "আমি কিন্তু আজ যদি না আসতে পারি, তোমার একলা রাত্রে শুতে ভয় করবে না তো লাবণ্য ?"

ভয় তাহার করে— করিবেই, কিন্তু স্বামীকে সেকথা বলিয়া উদ্বিগ্ন করা উচিত হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

মহিম আবার জিজ্ঞাসা করিল— "কি গো, বলো না, ভয় করবে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লাবণ্য বলিল— "না, ভয় আর কি ?"

"না, ভয় আর কি ? ভয় তোমার হবে কেন ? একলা শুতেই তুমি চাও, একলাই ভালোবাস, কেমন ?"

সে-স্বরে ব্যঙ্গের আভাস পাইয়া বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া লাবণ্য দেখিল, স্বামীর মুখ অস্বাভাবিক রকম কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর অদ্ভুত আচরণের

সহিত তাহার এতদিনে ভালো করিয়াই পরিচয় হইয়াছে। একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "ভয় পাবো না বললেও দোষ নয় নাকি ? জানি না বাপু!"

"না, দোষ আর কি" —বলিয়া মহিম সেকথা চাপা দিল।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে ডাকিয়া বলিল— "যাবার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখিয়ে যেতে চাই! দেখবে ?"

"কি জিনিস ?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

স্বামীর এই ছেলেমানুষীতে সায় দিবে কিনা লাবণ্য বিচার করিতেছিল কিন্তু মহিম তাহাকে সে-অবসর দিল না। হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়াই তাহাকে যেখানে আনিয়া দাঁড় করাইল, সেটি পরিত্যক্ত একদিকের মহলের পুরাতন অব্যবহার্য একটি ঘর।

মরচে-পড়া তালা খুলিয়া লাবণ্যকে ভিতরে ঢুকাইয়া তাহার হাতে একটি দেশলাই দিয়া মহিম বলিল, "আচ্ছা, এই দেশলাইটা জ্বালো দেখি।"

লাবণ্য দেশলাই জ্বালাইতেছিল, হঠাৎ পিছনে দরজা বন্ধের শব্দ শুনিয়া সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, স্বামী বাহিরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, দরজায় শিকলি তোলার শব্দও পাওয়া গেল।

এ আবার কি রকম ঠাট্টা! লাবণ্য বলিল, "ওকি করছ ? ভাঁড়ার এলো রেখে এসেছি। এখন আমার রঙ্গ করবার সময় নেই! খোলো তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু দরজার ওদিক হইতে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না।

লাবণ্য আবার বলিল— "এখন কি ছেলেমানুষীর সময়। তোমার এঁটো থালা-বাটি সব পড়ে আছে ; পিসিমা, ঠাকুরঝি কেউ খায়নি— খোলো।"

কিন্তু তথাপি কেহ উত্তর দিল না।

এবার লাবণ্যের ভয় হইল। অন্ধকার ঘরের ভিতর কিছুই দেখা যায় না— শুধু এখানে-ওখানে নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে।

লাবণ্য দরজায় সবেগে করাঘাত করিয়া নববধূর পক্ষে অশোভন উচ্চ কাতর-কণ্ঠে ডাকিল— "ওগো কেন এমন করছ ? খুলে দাও, আমার ভয় করছে।"

কোথাও কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। স্বামীকে সে একটু চিনিতে শিখিয়াছে। — মনে হইল যদি সে দরজায় তালা দিয়া একেবারে চলিয়াই গিয়া থাকে! যদি এ ক্ষণিকের পরিহাস না হয় ?

ভাবিতেই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখান হইতে চিৎকার করিয়া গলা চিরিয়া ফেলিলেও কেহ যে শুনিতে পাইবে না একথা সে ভালো করিয়াই বোঝে। এই অন্ধকার নির্জন পরিত্যক্ত ঘরে তাহাকে সারা দিন রাত্রি কতক্ষণ যে কাটাইতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া আর একবার স্বামীকে মিনতি করিয়া কাতরস্বরে সে বলিল— "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, খুলে দাও, কেন আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ?"

সে-মিনতি কেহ শুনিল না। শুনিবার কেহ ছিল বলিয়াও মনে হয় না।

কতক্ষণ এইভাবে যে তাহার কাটিয়াছে সে জানে না। ভয়ের চরম অবস্থা পার হইয়া অবসাদে তাহার সমস্ত দেহমন তখন প্রায় নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছে। লাবণ্যের মনে হইল, কে যেন দরজার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সে ডাকিল— "কে?"

বাহিরের পদশব্দ থামিল।

লাবণ্য অস্ফুট কণ্ঠে আর একবার বলিল— "আমায় খুলে দাও না গো!"

পরমুহূর্তেই সুমধুর হাস্যধ্বনি শোনা গেল— "ওমা, তুই এখানে!"

তাহার পর শিক্‌লি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাধুরী বলিল, "আর আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি যে তুই পালিয়ে গেছিস! দেখ দেখি তোর অন্যায়! এমন ক'রে মানুষকে হতাশ করে?"

তাহার কথায় বুঝি মড়ার মুখেও হাসি ফোটে। ম্লান হাসিয়া লাবণ্য বলিল, "যমের বাড়ি ছাড়া পালাব কোথায় ঠাকুরঝি!"

যেন সাগ্রহে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মাধুরী বলিল— "দূর, যমের বাড়ি যাবি কেন? পৃথিবীতে আর জায়গা নেই! পালাবি বল্, সব বন্দোবস্ত ক'রে দিই তাহ'লে। বাড়ির মাছিটি পর্যন্ত টের পাবে না।"

তাহার কথার ধরনে এত দুঃখেও লাবণ্যের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল— "কিন্তু ও কেন অমন করে ঠাকুরঝি, বলতে পারো? কি আমার অপরাধ?"

"তোর অপরাধ নয়? মরতে কেন এ বাড়িতে তুই এসে জুটেছিস? পালাতে বললাম, তা কথাটা যেন গায়েই মাখলি না— তোর অপরাধ

নয় ?” কিন্তু খানিকবাদেই গম্ভীর হইয়া বলিল— “এ-বাড়ির এমন দশা কেন জানিস্ ?”

লাবণ্য তাহার গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

মাধুরীর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল— “মেয়েমানুষের শাপে ; হাজার হাজার মেয়েমানুষের শাপে এ-বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিৎ পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাতপুরুষ ধ'রে এরা মেয়েমানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যা করেনি। তাদেব সে-অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে কুরে খাচ্ছে! ও যে সেই বংশের শেষ বাতি !”

কথা কহিতে কহিতে তাহারা তখন অঙ্গনের আলোকে নামিয়া আসিয়াছে। সে আলোয় মাধুরীর মুখের চেহারা দেখিয়া লাবণ্যের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অমানুষিক রাগে ও ঘৃণায় তাহার সেই পরম সুন্দর মুখ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

মাধুরীর সব কথা ভালো করিয়া লাবণ্য সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার মনের কোণে একটি অহৈতুক আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সে-আতঙ্ক স্বামীর আচরণে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল।

স্বামীকে এখন প্রায়ই দূরে যাইতে হয়। ছুতা করিয়া নয়, সোজাসুজি সবলেই মহিম তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। স্বামী চলিয়া যাইবার পর মাধুরী আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়, এইটুকুই যা সান্ত্বনা। আবার স্বামী আসিবার পূর্বে মাধুরী তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখে।

কিন্তু একদিন এ কৌশল ফাঁক হইয়া গেল।

মহিম তাহাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাধুরী আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, “মজা দেখবি তো আয়—”

“কি মজা ?”

“পিসিমার ঘরে কি আছে দেখবি ? পিসিমা আজ ভুলে ঘরে তালা না দিয়েই কোথায় বেরিয়েছে !”

সভয়ে লাবণ্য বলিল, "না, না, দরকার নেই, পিসিমা এসে পড়বে।"

কিন্তু মাধুরী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, "এলেই বা; মেরে তো আর ফেলতে পারবে না দু-দুটো জোয়ান মেয়েকে!"

লাবণ্য তবুও আপত্তি করিতেছিল, মাধুরী তাহাকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

পিসিমা ঠিক তালা দিতে ভোলেন নাই তবে দৈবাৎ চাবি ঠিক লাগে নাই, তালা আলগাই আছে। মাধুরী দরজা খুলিয়া লাবণ্যকে টানিয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘর অন্ধকার। সে-অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর দেখা গেল, সঙ্কীর্ণ ঘরে কোথাও আর স্থান নাই, ছোট বড় বাক্স-পেঁটরা, সিন্দুক, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়ে ছাদ পর্যন্ত বোঝাই হইয়া আছে।

লাবণ্য ভয়ে ভয়ে বলিল, "দেখা তো হ'ল, চলো এবার যাই।"

মাধুরী বলিল, "দূর, এখনো কিছুই দেখিসনি।" তাহার পর ঝট্ করিয়া একটা বাক্সের তালা খুলিয়া সে প্রথমেই যে জিনিসটি বাহির করিয়া আনিল, অন্ধকারেও তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লাবণ্য চমকাইয়া উঠিল। —সেকালের জড়োয়া গহনা!

. লাবণ্যের মনে হইল, অন্ধকারে তাহার মূল্যবান্ পাথরগুলি হিংস্র সরীসৃপের চোখের মতোই যেন তাহার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লাবণ্যের বুকের ভিতরটা অকারণ ভয়ে শুকাইয়া আসিতেছিল। বলিল, "চলো, চলো ঠাকুরঝি, আমার ভালো লাগছে না।"

"তুই তো আচ্ছা ভয়-কাতুরে!" মাধুরী সশব্দে সমস্ত বাক্সটা মেঝের উপর উজাড় করিয়া ফেলিয়া বলিল— "নে, বেছে নে? বুড়ীর ঘরে এমন জিনিস জমা হয়ে থেকে কোনো লাভ আছে কি?"

"না-না ঠাকুরঝি চলো।" কিন্তু মাধুরীর চোখ দুইটাও তখন কিসের উন্মত্ততায় জ্বলিতেছে। বাক্সের পর বাক্স, পাত্রের পর পাত্র সে মেঝের উপর উপুড় করিয়া ফেলিতেছিল। কঠিন স্বরে বলিল, "না, দেখি আগে সব।"

গহনা, টাকা, মোহর, মণিরত্ন— এই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পরিবারের সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধা বুঝি তাহার ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সম্পদ আগলাইয়া ডাইনীর মতো সে দিনরাত্রি বসিয়া থাকে— অন্ধকারে তাহাদের

দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণহীন প্রস্তরের অস্বাভাবিক জ্যোতির প্রখরতা তাহার চোখেও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সহসা লাবণ্য 'মাগো' বলিয়া অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল। মাধুরী চোখ তুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়াইয়া হিংস্র শ্বাপদের মতো তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।. সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য— পরক্ষণেই শোনা গেল বৃদ্ধা সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর কলহাস্যে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি হবে ঠাকুরঝি!"

"হবে কি আবার, গয়না পরি আয়—!" বলিয়া মাধুরী একছড়া মুক্তার হার লাবণ্যের গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল।

সারাদিন বন্দী থাকিবার পর সন্ধ্যায় মহিম পিসিমার সহিত আসিয়া দরজা খুলিল। ইতিমধ্যে কি তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল বলা যায় না কিন্তু মহিম এ ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত করিল না। এক-গা গহনা পরিয়া পিসিমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিয়া মহিমের দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গেল। পিসিমা বা মহিম তাহাকে কেহ কোনো বাধা পর্যন্ত দিল না।

নীরবে রাত্রি কাটিল।

সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কোনো কথাই হইল না। বিকালে হঠাৎ মহিম আসিয়া বলিল, "চল, যেতে হবে!"

লাবণ্য সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কিছু বুঝিতে পারিল না।

মহিম আবার বলিল, "ওঠ, যেতে হবে!"

"কোথায়?"

"জানি না।" মহিম আল্‌না হইতে একটা চাদর লইয়া তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আর কিছু নিতে হবে না, ওঠ!"

তাহার গলার স্বরে ভয় পাইয়া লাবণ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কাতরকণ্ঠে একবার শুধু প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাবে?"

মহিম উত্তর দিল না। তাহার একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো পথ, আবার সেই হাঁটুভর জঙ্গল, ইট-কাঠের স্তূপ পার হইয়া লাবণ্য স্বামীর সহিত বাহির হইয়া আসিল। পিছনে বাড়ির আঙ্গিনায় সর্বাঙ্গ অলংকারে ভূষিত করিয়া সুন্দরী মাধুরী তাহাদের যাত্রাপথের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এইটুকু শুধু সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশের সময় যে-কলহাস্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সেই কলহাস্যই বিদায়ের বেলায় তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

ট্রেনে সারা পথ কোনো কথা হয় নাই। শহরে আসিয়া যখন পৌছিল তখন রাত্রি হইয়াছে। তাহার উপর দারুণ দুর্যোগ! সারা শহরের উপর ঝড় ও বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতি চলিয়াছে।

একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে হুজুর?"

"যেখানে খুসি।"

গাড়োয়ান এমন কথা হয়তো আগেও শুনিয়াছে। সে দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলিবার পর মহিম প্রথম কথা বলিল এবং কথা বলিল যেন একেবারে নতুন মানুষ হইয়া।

বলিল, "তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি লাবণ্য; এতদিনের ব্যবহারে আমায় মনে মনে তুমি ঘৃণা করতে সুরু করেছ কিনা তাও জানি না; কিন্তু একটি কথা বুঝে আজ আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি লাবণ্য। ও-বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত—এইটুকু জেনে তুমি আমায় মার্জনা করতে পারবে নাকি কখনো?"

অন্ধকারে ডান হাতটি বাড়াইয়া স্বামীর হাতটি খুঁজিয়া লইয়া লাবণ্য এই স্নেহ-স্বরে অভিভূত হইয়া গিয়া বলিল—"কেন তুমি এসব কথা বলছ, বলো দেখি! মনে আমার কিছু থাকলে তোমার সঙ্গে এমন ক'রে আসতে পারতাম কি?"

মহিম গাঢ়স্বরে ডাকিল, "লাবণ্য।"

লাবণ্য স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—"কি?"

"আবার আমরা সহজ মানুষের মতো সংসার আরম্ভ করতে পারি না কি লাবণ্য ? সাত-পুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় না কি ? যেখানে কেউ আমাদের জানে না এমন জায়গায়, একেবারে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করলে আবার আমি সহজ হতে পারব না কি ?"

"কেন পারবে না ?"

"তুমি জান না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে ! কিন্তু এ-বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।"

"তোমায় আমি ভালোবাসি না ?"

"বাসো, বাসো জানি, কিন্তু অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে-সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই। তুমি শুনে হাসবে লাবণ্য কিন্তু তুমি ও-কথাটি প্রতিদিন আমাকে ব'লে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি যেন জোর পাই।"

গাড়োয়ান ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রান হইয়া এক সময়ে বলিল— "সারা রাত ধ'রে তো ঘুরতে পারি না বাবু।"

"আচ্ছা থাক।" —বলিয়া সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত স্থানেই মহিম হঠাৎ লাবণ্যের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল।

গাড়োয়ান ভাড়া বুঝিয়া পাইয়া অবাক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল সেই জানে।

মহিম বলিল, "ভয় করছে না তো লাবণ্য ?"

চাদরটা ভালো করিয়া মুড়ি দিয়া স্বামীর বুকের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া লাবণ্য বলিল—"না, কিন্তু কোথায় যাবে ?"

"চলো না যেদিকে খুশি ! ঝড়-বৃষ্টি থামলে যেখানে গিয়ে উঠব সেইখানে ভাবব আমাদের নবজন্ম হ'ল।"

লাবণ্য কথা কহিল না। স্বামীর হাত ধরিয়া নীরবে চলিতে সুরু করিল।

উদ্দেশ্যহীন চলা। কোন্ সময়ে তাহারা ছোট্ট নদীটির ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে জানিতেও পারে নাই। মহিম বলিল—"চলো, ওই পোল পার হয়ে যাব !"

এবার লাবণ্য একটু ইতস্ততঃ করিল। বলিল—"কিন্তু ও-পোল ভাঙা কি না কে জানে, যদি প'ড়ে যাও !"

"তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে। পারবে না পড়তে ?"

আবার তাহার চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল। গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে লাবণ্যকে বুকের কাছে ধরিয়া যে-স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, এতখানি পথ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহা মহিমের মন হইতে কখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! তাঁহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে চিরদিনের মতো রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালোবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?

লাবণ্যের হাত ধরিয়া দোদুল্যমান সেতুর উপর দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মহিম তাকে ঠেলিয়া দেয়……

তাহার পরের কথা বলিয়াছি। আমার কাহিনী ঐখানেই আসিয়া থামিয়াছে। পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়! হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!

# শৃঙ্খল

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইতেছে। ভূপতি বাড়ি আসে অনেক রাত করিয়া, দরজায় তুইটা মৃদু টোকা দেয়, দরজা খুলিবার পর ঘরে গিয়া ঢোকে নীরবে। জামা কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইবার পর ঘরে খাবার আসনে আসিয়া বসে, খাবার-দাবার সামনেই সাজানো। আহার শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। সারাক্ষণের মধ্যে বিনতির সহিত একটা কথাও বিনিময় হয় না। একই বাড়িতে যে তুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে নাই। তাহাদের মধ্যে যেন অসীম মহাদেশের ব্যবধান। তুই হাত মাত্র তফাতে বড় তক্তাপোশটার তুইধারে যাহারা রাত্রি যাপন করে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি এতখানি সুদূরে তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু শুধু সুদূর বলিলে ইহাদের মধ্যকার ব্যবধান বুঝি কিছুই বোঝানো যায় না।

সকালে উঠিয়া ভূপতি নিজেই বাজারে চলিয়া যায়। বাজার হইতে ফিরিয়া মোটটা নামাইয়া দেয় রান্নাঘরের ধারে। আহারের পর নিজের ঘরে গিয়া অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়ম মতো সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে। কোথাও এতটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোন অসঙ্গতি কেহ দেখিতে পাইবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্তব্ধতাটা সেই জন্যই আরও ভয়ঙ্কর। সাধারণ মান-অভিমানের ক্ষণিক পালা ইহা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই তুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাহিরের ইতিহাসে সব-কিছু কি ধরা পড়ে!

বিবাহ হইয়াছিল নিতান্ত সাধারণভাবে। ভালো ছেলে খুঁজিবার সাহস

বিনতির বাপ মায়ের ছিল না। বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন না থাক, উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা-দেইজি না থাকায় একরকম ভালোই থাকিবে। ছেলেটি অবশ্য কেমন একটু···

কেমন একটু যে কি তা অবশ্য তাঁহারা ঠিক স্পষ্টভাবে নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। তবু খট্‌কা একটু লাগিয়াছিল। এই খট্‌কা লাগাও আশ্চর্য। সত্যিই ভূপতিকে দেখিয়া বা তাহার সহিত আলাপ করিয়া খুঁত ধরিবার কিছু পাওয়া যায় না। বিনতির বাপ-মায়ের সচেতন মনে নয়, তাহার চেয়ে গভীর কোনো স্তরে যেন সন্দেহের ছায়া দেখা দিয়াছিল। সে-ছায়াকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমল দেন নাই। না দেওয়াই স্বাভাবিক।

বিনতি তখন চোদ্দ পোনেরো বছরের লাজুক ভীরু একটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। ফুলশয্যার রাতে নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড় ভারী জামা কাপড়ের বোঝায় আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছিল।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের হাঙ্গামা চুকিবার পর ভূপতি আসিয়া আগেই শয্যার উপর মাথার নিচে হাত রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজনের অভাবে পাড়া-প্রতিবেশীরাই বিনতিকে সাজাইয়া আচার অনুষ্ঠান পালন করাইয়া ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বিনতি ঘরে ঢুকিতে ভূপতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল। তাহার পর সে নিজে উঠিয়া সমবেত মেয়েদের কৌতুকহাস্য উপেক্ষা করিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় উঠিবার সময় পাশের বালিশটা বুঝি অসাবধানে পা লাগিয়া মাটিতে তখন পড়িয়া গিয়াছে। বিনতি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক কর্তব্য-বোধেই সেটা তুলিয়া বিছানায় আবার রাখিয়া দিতেই ভূপতি পা দিয়া আবার সেটা মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

বিস্মিত ও একটু ভীতভাবেই বিনতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল। না, ভয় করিবার কিছু নাই! ভূপতি হাসিতেছে নিঃশব্দে।

এবারে কৌতুক অনুভব করিয়া বিনতি নিজের হাসিটুকু বুঝি গোপন করিতে পারে নাই। মাথার কাপড়টা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া আবার সে

বালিশটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভূপতি আবার পা ছুড়িল। বালিশটা বিনতির হাত হইতে পড়িয়া ত গেলই, আর একটু হইলে বুঝি আঘাত তার হাতেও লাগিত।

বিনতি এবারে ঠিক কৌতুকটা উপভোগ করিতে পারিল না।

কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চহাসি শোনা গেল। ভূপতি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

বিনতিও হাসিল কিন্তু এবার আর বালিশ তুলিবার চেষ্টা করিল না। খাটের একবারে শেষপ্রান্তে দেয়ালের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খানিক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কই বালিশটা তুললে না?"

বিনতি একবার তাহার দিকে সকৌতুক ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাথা নত করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ আর দেখা যায় না।

"তোলো বালিশটা।"

মুখ নিচু করিয়াই বিনতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে তুলিবে না। তাহার পর ফিক্ করিয়া একটু হাসিযাও ফেলিল।

ভূপতি বিছানার উপর তাহার দিকে সরিয়া আসিল এবার। তারপর তাহার হাতটা হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "বালিশটা কিন্তু না তুললে হবে না।"

স্বামী তাহাকে এই প্রথম স্পর্শ করিয়াছেন।

বিনতি তখন ভয়ে আনন্দে লজ্জায় কেমন-একরকম হইয়া গিয়াছে। জড়-সড় হইয়া সরিয়া গিয়া দুর্বলভাবে হাতটা একটু ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার শরীরে যেন আর এতটুকু জোর নাই— সমস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে, অপূর্ব আনন্দ শিহরণে।

তাহারই ভিতর কানে আসিয়া বাজিল—"তোলো বলছি।"

বিনতি আবার সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে না তাকাইয়া পারিল না। আশ্চর্য! গলার স্বব যেন রূঢ় বলিয়াই মনে হইযাছিল কিন্তু মুখে তাহার কোন আভাসই নাই! ভূপতি হাসিতেছে।

বিনতি সাহস পাইয়া অস্ফুট লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল, "আর ফেলে দেবে না ত?"

"আগে তোলো ত।"

স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পদ্ধতিটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও বিনতি সমস্ত ব্যাপারে একটু অস্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার বেশি আর কিছু দেখিতে পায় নাই। দেখিবার ছিল কি কিছু?

সে বালিশটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল— "হয়েছে ত!"

কিন্তু সে-পালা তখনও শেষ হয় নাই। বিনতিকে আর একবার বালিশটা কুড়াইতে হইয়াছিল। কৌতুকের চেয়ে বিস্ময় বুঝি তাহার মনে তখন প্রবল।

অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতিও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যত দিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে যে প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের ইঙ্গিত ছিল।

সংসারে গোড়া হইতেই একটু খিটিমিটি বাধিয়াছে। গায়ে মাখিবার মতো এমন কিছু হয়তো নয়। কিন্তু তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে-পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথায় যেন একটা অহেতুক আশঙ্কা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

শাশুড়ী ওই একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া আজ কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। ভূপতির বয়স তখন ছিল পাঁচ বৎসর। পরের সংসারে আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসীন্য এমন কি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধ স্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়তো ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-কথা মানিলেও তাহার সব অদ্ভুত আচরণের অর্থ পাওয়া যায় না।

শাশুড়ী বিনতির বিবাহের বছর দুই বাদেই মারা গিয়াছেন। আগেকার কথা জানা নাই কিন্তু জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছেন এবং সে-কষ্টের কারণ বিনতি নয়।

শাশুড়ী-বধূর ছোটখাটো গরমিল হয়তো আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইতে পারিত। শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না, বিনতিরও ভালোবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

রান্নাঘরে সামান্য কি একটা কাজের ত্রুটি লইয়া বিনতি হয়তো একটু বকুনি খাইয়াছে শাশুড়ীর কাছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। স্বামীকে তাহা নিজে হইতে জানাইবাব কথা বিনতি কল্পনাও করে নাই।

আপিসে যাইবাব সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে—"আর একটা ঝি না রাখলে চলছে না, কি বলো মা!"

মা ছেলের আহারের সময বরাবর কাছে আসিয়া বসেন। হাতের পাখাটা থামাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিযাছেন—"কেন! ঝি ত আমাদের দরকার নেই!"

ভূপতি খানিকক্ষণ কোন কথা বলে নাই। নিঃশব্দে আহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার বলিয়াছে—"একটাতেই ঠিক চলছে কি!"

মা ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াই গুম হইয়া গিয়াছেন।

ভূপতি আবার বলিয়াছে—"না-হয় আর একটা বিয়েই করি! এমন ত কত লোক করে!"

মাযেব হাতের পাখা থামিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জলও আসিযাছে বুঝি।

ভূপতি তবু কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। বলিযাছে—"এ-যুগের ছেলেরা ত আর মাযের সম্মান রাখে না। মাতৃভক্তির জন্যে স্ত্রী-ত্যাগ কবলে একটা কীর্তিও থাকবে।"

মা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—"আমি ত বৌকে কিছু বলি নি বাবা। ঘবসংসাব করতে হ'লে একটু শিক্ষা দিতে হয়। বৌ যদি তাতে রাগ করে, না-হয় আর কিছু বলব না।"

লজ্জায় বিনতির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। শাশুডী নিশ্চয় ভাবিযাছেন যে সে-ই স্বামীর কাছে ভৎর্সনার কথা লাগাইয়াছে।

স্বামীকে রাত্রে নির্জনে সে একবার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে বলিয়াছে—"ছি, ছি, তুমি মাকে অমন ক'রে কালকে কেন বলতে গেলে বলো ত! আমি কি তোমায় কিছু বলেছি?"

ভূপতি হাসিয়াছে—"না, আর একটা বিয়ে করতে তুমি বলো নি বটে!"

"তাও তুমি পারো!" —বিনতির মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভূপতি আবার তেমনি হাসিয়া বলিয়াছে—"আমার শক্তিতে তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখে সুখী হ'লাম।"

ইহার পর আর এ-সম্বন্ধে কোন কথা বলা বিনতির নিরর্থক মনে হইয়াছে।

কিন্তু এমন ঘটনা তাহাদের সাংসারিক জীবনে ওই একটিই নয়। সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি— ছোটখাটো নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।

সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত। মাস শেষ হইবার পরও টাকা না পাইয়া মা একদিন আসিয়া বলিয়াছেন—"হাতে যে আর কিছু নেই রে! মাইনে পেতে এবারে এত দেরি যে!"

ভূপতি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিয়াছে— "দেরি কোথায়!"

"আজ সাত দিন হয়ে গেল, দেরি নয়!"

"মাইনে ত অনেক দিন পেয়েছি। ও দেওয়া হয়নি বুঝি তোমায়। আচ্ছা দেব'খন।"

"আমার যে আজই দরকার, মাসের চালডালগুলো আনিয়ে নিতে হবে।"

ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে—"আচ্ছা ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার।"

আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। মা একেবারে মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। নির্বিকার নিষ্ঠুরতা এতদূর পর্যন্ত বুঝি কোনরকমে বোঝা যায়। ভূপতি কিন্তু তাহার পরও কাগজটা সরাইয়া বলিল—"বৌয়ের কাছে হাত পেতে নিতে আবার মান যাবে না ত!"

মা আর সহিতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও বুঝি নয়। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে যা নয় তাই বলিয়া মনের সমস্ত রুদ্ধবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, মা বলিয়া সম্মান না করুক, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে দুঃখভোগ করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কি এই!

ভূপতি তবু হাসিয়া বলিয়াছে—"ছেলে-বৌএর উপর রাজত্ব করবার লোভেই তাহলে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছিলে!"

মা এ-কথার উত্তর দিবার ভাষাই বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। সেইদিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। বিনতির করিবার কিছু ছিল না। শাশুড়ী মনে মনে তাহাকেও যে দোষী ভাবিবেন ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার সন্তোষ-বিধানের দুর্বল চেষ্টারও তাই তিনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। বিনতি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

স্বামীকে কিন্তু তখন হইতেই বিনতি ভয় করে। স্বামীর এ-সমস্ত ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ। স্ত্রীর প্রতি উৎকট ভালোবাসার পরিচয় যে ইহা নয় তাহা বিনতি ভালো করিয়া জানে। তবে এই অসাধারণ হৃদয়হীনতার মূল কোথায়?

বিনতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার সমস্ত মনে গভীর অর্থহীন একটা আশঙ্কার ছায়া জাগিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অস্বস্তি, একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে স্বামীর সংস্পর্শে।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহা যেন আরও গভীর হইয়া উঠিল। সংসারে আর কেহ নাই। স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া ধরিতে পারিলে এই নিঃসঙ্গতাই মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু খুলিয়া ধরা দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহাদের সম্বন্ধ যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য প্রাচীর কে যেন গড়িয়া তুলিতেছে দুজনের মাঝখানে। নিজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুন বুঝি বিনতির অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সে ভীরু সরল মেয়েটি বিদায় লইয়াছে অনেকদিন আগেই। বিনতির প্রকৃতি ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, শিথিলতা আসিয়াছে তাহার সব কাজে। সংসারের কাজ সে নিয়মমতই করিয়া যায় কিন্তু তাহাতে যেন আর গা নাই। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেজন্য সে মাথাও ঘামায় না। কোনোমতে দিনটা কাটানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

রাত্রে অবশ্য তার ঘুম আসিতে চায় না। ঘুমাইলেও সে সচকিতভাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া ওঠে।

কিন্তু তাহাদের জীবনে যে গাঢ় ভয়াবহ ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, সত্যই

ভূপতি কি তাহার হেতু? হৃদয়হীন নির্বিকার মানুষ ত সংসারে বিরল নয়। তাহাদের সহিত ঘরকরা সুখের নয়, সহজও নয়, কিন্তু সম্ভব। ভূপতির ভিতর কি নির্বিকার হৃদয়হীনতারও বেশি কিছু আছে!

বোঝা যায় না কিছুই। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরের মধ্যে বিনতি সারাক্ষণ অনুভব করে, ভূপতির কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই বলিয়া মনে হয়।

বরাবর যেমন ছিল সে এখনও তেমনই আছে। বিনতির সহিত স্পষ্ট কোন দুর্ব্যবহার সে করে না, তাহাকে শাসন করে না, তাহার সংসার পরিচালনার স্বাধীনতায় পর্যন্ত বাধা দেয় না এতটুকু।

স্ত্রীর সহিত সে যে আলাপ করে তাহাকে সহজ বলিয়াই মনে হয়। কণ্ঠও তাহার একান্ত সরল।

"তোমার চুল যে সব উঠে যাচ্ছে!"

বিনতি ধোপার বাড়ির ফেরত কাপড়গুলো পাট করিয়া তোরঙ্গে তুলিতেছিল, উত্তর দেয় নাই।

ভূপতি আবার বলিয়াছে— "কি ভাগ্যি তোমার কপাল ছোট। চওড়া কপালের ওপর চুল উঠে গেলে মেয়েদের ভারী খারাপ দেখায়।"

বিনতি এবার রুক্ষস্বরে বলিয়াছে—"পোড়াকপালে উঠলে দেখায় না।"

"তুমি আয়নায় দেখেছ?" ভূপতি হাসিয়া উঠিয়াছে।

"আয়নায় দেখবার দরকার নেই, আমি জানি।"

"তাহলেও চুল থাকলে পোড়াকপাল ঢাকা থাকে। কালই একটা ভালো তেল আনতে হবে।"

কাপড়গুলো তুলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বিনতি বলিয়াছে—"দরকার নেই আমার। আমার চুল উঠলে ক্ষতি নেই।"

"একটু আছে যে। চুল উঠে গেলে সিঁথিতে যে সিঁদুর পড়বে না ঠিক মতো। সেটাও ত দরকার; কি বলো?"

বিনতি চুপ করিয়াছিল।

ভূপতি আবার বলিল, "কালই একটা তেল আনব।"

ভূপতি তাহার পরদিন সত্যই একটা তেল লইয়া আসিয়া বলিল—"এই নাও, রোজ ঠিক মতো মেখো।"

মাথার তেলের শিশি এত ছোট দেখিয়া বিনতি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে নাই—"এত ছোট শিশি যে ; এ ত একবার মাখলেই ফুরিয়ে যাবে।"

ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্যে, প'ড়ে দেখো না— পোড়াঘায়ে ধন্বন্তরি ব'লে লিখেছে।"

অতীত যুগের সে নিরীহ লাজনম্র মেয়েটি কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এখনকার বিনতি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারে নাই। একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সে সবলে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মেঝের উপর ছড়ানো তেল ও কাঁচের ভাঙা টুকরার দিকে চাহিয়া ভূপতি শুধু বলিয়াছে—"তোমার হাতের তাগ নেই।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এতটুকু বিস্ময় বা উত্তেজনার আভাস নাই।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ এমনি ধরনের। ভূপতি কোনোদিন হয়তো সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ডাকিয়া বলে—"শুনে যাও।"

বিনতি কি একটা কাজে ভাঁড়ারে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে—"কেন ?"

"শুনে যাও না।"

বিনতি কাছে আসিলে খবরের কাগজের একটা জায়গা তাহাকে দেখাইয়া ভূপতি বলে—"পড়ো না, ভারী মজার খবর একটা।"

"আমার সময় নেই এখন।" —বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি হঠাৎ তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া বলে—"খুব আছে, এইটুকু পড়তে আর কতক্ষণ !"

বিনতি অগত্যা কাগজটা হেলাভরে হাতে তুলিয়া লয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া ওঠে। নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া কঠিন মুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে ভূপতি তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলে—"ভারী মজার —না ?"

বিনতি স্বামীর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলে—"হুঁ !"

"পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস নেই। কিছুই আশ্চর্য নয়, কি বলো ?"

"না।" বলিয়া বিনতি হাতটা ছাড়াইয়া এবার চলিয়া যায়।

ভূপতি তখনকার মতো আর কিছু বলে না। কিন্তু খাবার সময়, প্রথম

ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে গিয়া হঠাৎ নামাইয়া রাখিয়া বলে—"এমনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে-লোকটাও ত মুখে ভাত তুলেছিল! সারাদিন খেটেখুটে হায়রান হয়ে এসেছে, ক্ষিধেয় সমস্ত অন্ধকার দেখছে। কেমন ক'রে বেচারা জানবে সেই অন্ধকারই চিরদিনের মতো নেমে আসবে। কেমন ক'রে জানবে তার জীবনের ওই শেষ গ্রাস।"

বিনতি বুঝি একটু শিহরিয়া ওঠে। সেদিকে একবার চাহিয়া ভূপতি বলিয়া যায়—"তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তখনও তার সামনে ব'সে। স্বামীর জন্যে অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে সে অমন খাওয়ার আয়োজন করেছে— ক্ষিদে শুধু মিটবে না, জীবনের ক্ষিদে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কেমন ক'রে স্বামী সে-গ্রাস মুখে তোলে তাকে দেখতে হবে ত!"

ভূপতির মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দেয়। সে আবার বলে—"তার স্ত্রীর সেই সাগ্রহে ব'সে থাকা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। অমন সে কত দিন কত রাত আগেও বসেছে, কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় নয়।"

হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভূপতিরও একটু পরিবর্তন বুঝি দেখা দেয়। বিনতি কিছু না বলিলেও নিজে হইতে সে একদিন বাড়িতে একটি ঝি রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। একদিন অফিস ফেরতা গোটাকতক রঙিন ছিটের কাপড় আনিয়া নিজেই বিনতিকে বলিয়াছে— "সস্তায় পেয়ে গেলুম। বহর বড় কম, তবে ছোট পেনি ক'টা হ'তে পারে।"

বিনতি সন্তান-সম্ভবা। শরীর তাহার অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গায়ে যেন রক্ত নাই, হাত পা শীর্ণ।

সন্তানলাভের কল্পনায় আনন্দ হয়তো তাহারও আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। উৎসাহ তাহার আর কিছুতেই নাই। হয়তো ইহা তাহার ক্লান্ত দুর্বল শরীরেরই প্রতিক্রিয়া, হয়তো তাহার চেয়েও বেশি কিছু। হয়তো ভাবী-সন্তান সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কা আছে। ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়! তেমনি অপরিচিত, ভয়ঙ্কর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে! মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়! বিনতি সেকথা ভাবিতে চায় না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

ভূপতির চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন একটুকু উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল— "এই বিছানাটুকু পেতে এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

বিনতি উত্তব দিল না। সে সত্যই ক্লান্ত, অত্যন্ত দুর্বল। কোনরকমে মনের জোরে সে যেন খাড়া হইয়া কাজ কবিয়া বেড়ায়, তাহার সমস্ত শবীব কিন্তু প্রতিবাদ করে। একবার শুইলে তাহার যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয ঘুম যদি মৃত্যুব মতো গাঢ় হইয়া নামে তাহা হইলেও যেন আব কিছু আসে যায না।

ভূপতির সন্তান যেন এখন হইতেই তাহাব বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করিযাছে। তাহাব সমস্ত প্রাণশক্তি সে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া লইবে।

ভূপতি একদিন হঠাৎ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল নিজে হইতেই। বিনতি ডাক্তাব দেখাইতে চায় না কিন্তু তবু আপত্তি টিকিল না। ডাক্তার ওষুধপত্র লিখিয়া দিযা গেল। সাবধানে থাকিবাব জন্য উপদেশ দিয়া গেল অনেক।

ভয, হ্যাঁ ভয় একটু আছেই বৈ কি। ডাক্তার ভূপতির জিজ্ঞাসার উত্তবে তাহাই বলিয়া গিযাছে।

ডাক্তাব চলিয়া যাইবাব পব বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার ডাকতে গেছ্‌লে কেন? আমি মবব না, ভয নেই।"

ভূপতি উত্তব দিযাছিল— "বলা যায় না, তুমি এখন তা পারো।"

বিনতি মবে নাই, কিন্তু মৃত্যুব একেবাবে প্রান্তে উপনীত হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব কবিযাছে।

নিরাপদে ভালোভাবে প্রসব যাহাতে হয সেজন্য ভূপতি স্ত্রীকে হাস-পাতালে রাখিযাছিল। মৃত সন্তান প্রসব কবিবার পব বিনতির নিজের জীবন লইযাই অনেকক্ষণ টানাটানি চলিয়াছে। সেটাকে খানিকটা সামলাইবাব পর ভূপতি স্ত্রীকে দেখিবাব অনুমতি পাইযাছিল। যে-ডাক্তারেব উপর বিনতির ওয়ার্ডের ভার ছিল তিনি বলিয়াছিলেন—"এ-যাত্রায খুব আপনাব ববাত জোর মশাই। কেটে ছিঁড়ে ছেলেটাকে সময় মতো না বা'ব করলে স্ত্রীকে আপনার বাঁচানো যেতো না।"

অদ্ভুতভাবে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া ভূপতি বলিয়াছে— "আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

ডাক্তারই কেমন যেন বিব্রত হইয়া গিয়া বলিয়াছেন—"না, ধন্যবাদ কিসের! এ ত আমাদের কর্তব্য!"

"কর্তব্যই ক'জন বোঝে!" বলিয়া ভূপতি একটু হাসিয়াছে।

বিনতির ঘরে ঢুকিবার সময়ও বুঝি তাহার মুখে সেই হাসিটুকু লাগিয়াছিল। শুভ্র শয্যার সঙ্গে একেবারে যেন মিশাইয়া বিনতির দেহ পড়িয়া আছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। শীর্ণ মুখটুকু চাদরের মতোই বিবর্ণ।

কিন্তু ভূপতি গিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার চোখে যে-দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ একান্ত দুর্বোধ। আশঙ্কাই তাহাকে বলিতে পারা যাইত কিন্তু তাহার সহিত দৃপ্ত অবজ্ঞার শাণিত ঝিলিক কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দ্বার হইতে বিনতি কি ইহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল!

ভূপতি পাশের চেয়ারে বসে নাই। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আবার ত ফিরে যেতে হবে।"

"তাই ত ভাবছি।" —বিনতির স্বর অস্ফুট কিন্তু তবু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তাহাতে।

হাসপাতাল হইতে বিনতিকে তাড়াতাড়ি ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার বিপদ না কাটিলে তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারে না জানাইয়াছে। কিন্তু ভূপতি জেদ করিয়া সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করিয়া বাড়িতে লইয়া আসিয়াছে।

সেই ডাক্তার বলিয়াছেন—"আপনি ভুল করছেন মশাই। স্নেহ ভালোবাসা বড় জিনিস, কিন্তু রোগ, হাসপাতালের এই হৃদয়হীন কলের মতো সেবাতেই সারে। আর ক'টা দিন রাখলেই ত আর ভয় থাকত না।"

ভূপতি অদ্ভুত উত্তর দিয়াছে— "আপনাদের সব কথা যদি বিশ্বাস করতে পারতুম!"

কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া দিন দিন আশ্চর্যভাবে বিনতি সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকে এমন করিয়া তুচ্ছ করিবার জোর সে কোথায় পাইল কে জানে? তাহার চোখে যে শাণিত অবজ্ঞা আজকাল উদ্ধত হইয়া আছে তাহাতেই কি তাহার সেই গোপন নূতনলব্ধ শক্তির ইঙ্গিত আছে!

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে মাত্র কয়েকদিন। ব্যাপারটা বোধ

হয় এমন কিছু নয়। ভূপতি অফিস হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় না ছাড়িয়াই একদিন বলিয়াছে— "শিগ্‌গির তৈরি হযে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।"

অত্যন্ত অস্বাভাবিক আদেশ। গত তুই বৎসব স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে ছাড়া আর সে কোথাও গিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

বিনতি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিযাছে— "কোথায ?"

"বায়স্কোপের তুটো পাশ পেয়ে গেলাম এমনি। পয়সা দিয়ে ত আব হবে না। চলো দেখেই আসি।"

"তুমি দেখে এসো।" —বলিয়া বিনতি চলিযা যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ভূপতি দরজা আগলাইযা বলিযাছে—"কেন, তুমি যাবে না কেন! আমার সঙ্গে যেতে কি ভয় করে নাকি ?"

বিনতি হাসিয়াছে একটু। আজকাল সে হাঁসে। বলিযাছে—"ঘবেই যখন কাটাতে পারলুম এতদিন, তখন বেরুতে আর ভয় কিসের ?"

ভূপতি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন তলাইযা দেখিবার চেষ্টা কবিযা বলিয়াছে—"তাহ'লে চলো না।"

"আচ্ছা চলো।"

একবার ট্রাম বদল করিয়া আর একটা ট্রামে উঠিবার সময বিনতি বলিযাছে— "কাছাকাছি বুঝি বায়স্কোপ ছিল না।"

"ছিল, কিন্তু অমনি দেখবার পাশ ছিল না।"

সিনেমা সত্যই শহরের আব এক প্রান্তে। ভূপতি সেখানে গিয়া স্ত্রীকে উপরে মেয়েদের সীটে উঠাইযা দিয়াছে। বিনতি একবাব বলিয়াছিল—"এক সঙ্গে বসলেও ত ক্ষতি ছিল না।"

"না নিচে বড় ভিড়, কষ্ট পাবে।"

বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া সিনেমাব ঝির সঙ্গে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তাহার পর কি করিত বলা যায় না। কিন্তু পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লোকটা হাসিয়া বলিল— "সখ ত মন্দ নয়, এই এত দূর এসেছিস বৌকে বায়স্কোপ দেখাতে।"

"তাহ'লে আর সখ কিসের!" —বলিয়া ভূপতি নিজেও বায়স্কোপের হলে গিয়া ঢুকিয়াছে। বন্ধুটিও পাশেই বসিয়াছিল, সে একবার ভূপতিকে চিম্‌টি

কাটিয়া বলিয়াছে— "অত ঘন ঘন ওপরে তাকাস নি। তোর বৌ পালিয়ে যাবে না।"

ভূপতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া বলিয়াছে— "না না ভারি লাজুক। ঠিকমতো জায়গা পেলে কিনা দেখছিলুম।"

বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার খানিক পরেই কিন্তু উসখুস করিতে করিতে হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

"আবার কি হ'ল ?" — বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

"কিছু না, আমি আসছি।"

বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছে— "বুঝেছি ; এমন বায়স্কোপ দেখানো কেন ? ঘরে শিক্‌লি দিয়ে রাখলেই পারতিস্।"

ভূপতি আর কোন কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া একদিকে চালাইতে বলিয়াছে।

ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিবার পরও ড্রাইভারকে থামিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্ত মুখে ভূপতি কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সেকথা আর বলা হয় নাই। ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দরজাটা নিজেই খুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে সে বলিয়াছে— "এসো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছো।"

বিনতি ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়াছে— "হ্যাঁ তোমায় বেরুতে দেখলাম যে।"

"লক্ষ্য করেছিলে বুঝি ?"

"তা করছিলাম।"

খানিকক্ষণ আর কোনো কথা হয় নাই। বিনতি হঠাৎ বলিল—"তুমি এমন কাঁচা কাজ করবে ভাবিনি। তোমায় দেখতে না পেলেও কিছু আসতো যেত না। আমি বাড়ির ঠিকানা জানি। তোমার নামটাও বলতে পারতাম লোককে ! একসঙ্গে এমন ক'রে না হোক খানিক বাদেই গিয়ে উঠতাম। সব দিক ভেবে বোধ হয় কাজটা করো নি।"

"না, সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমি ত নাও ফিরতে পারো, সেইটের ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।"

"মনের ঘেন্নায় মানুষ কি করতে পারে, কেউ জানে কি ?" —বিনতির সেই

বুঝি শেষ কথা। তাহার পর ট্যাক্সিতেই তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে নিঃশব্দে। মৃত্যুর মতো সে-নিঃশব্দতা সমস্ত সংসার এখন ভারাক্রান্ত করিয়া আছে।

অন্যান্য কথা হয়তো তাহারা আবার কহিবে, সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আহত করিবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু তবু অন্তরের এ-নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়। জীবনের একটি মাত্র বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এ-নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল— জীবনের কি আশ্রয়? পবস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।

# ভবিষ্যতের ভার

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই-এর বয়স অনেক হয়েছে— ষাটের চেয়ে সত্তরের কাছাকাছি। দড়ির মতো পাকানো লম্বা দেহটি, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। আজকাল গোঁফ-চুল সবই পেকেছে। চোখ বুজিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, "আপনাকে নিয়ে এই পোনেরোজন হেড মাস্টারকে আসতে যেতে দেখলাম। আজকের কথা ত নয়— এ-ইস্কুল সবে তখন আরম্ভ হ'ল। দশ আনির বড় কর্তা তখন বেঁচে, ভারি ভালো লোক ছিলেন! সেক্রেটারি তখন অনাথবাবু কিনা, তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার এই বা'র-বাড়িটা ত প'ড়েই থাকে, এব দুটো ঘরে তোমাদের ইস্কুল হয় না, হ্যা?'

"সেই বড় বড় দুটো ঘর নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ হ'ল। সে কি আজকের কথা, এই এক-চল্লিশ বছর হ'ল!"

চোখ বুজিয়ে শীর্ণ মাথাটি একটু নুইয়ে একধারে কাৎ ক'রে কথা বলা পণ্ডিতমশাই-এর অভ্যাস। মুখখানা যৌবনে কি রকম ছিল এখন দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। এক-একজন লোকের যৌবন ছিল ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তারা যেভাবে জীবন আরম্ভ করে, শেষ যেন তেমনি ক'রেই করে।

দেহে বা মুখে অতিরিক্ত মাংস পণ্ডিতমশাই-এর এক রত্তিও নেই। কোনো কালে ছিলও না বোধ হয়। তাহ'লে চামড়া শিথিল হয়ে দু-একটা আরও রেখা মুখে দেখা যেত বোধ হয়।

প্রথম দেখলে মনে হয়, সে মুখ সদা-প্রসন্ন। বিশেষ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সে-প্রসন্নতা মনের নয়, মুখের মাংসপেশীর মাত্র!

পণ্ডিতমশাই ব'লে যাচ্ছিলেন, "গবর্নমেণ্টের ইস্কুল হ'লে এতদিন কবে পেন্‌সান পাবার কথা। ইস্কুল ঠাঁই নাড়া হ'লই ত ছ'বার।" —কথা কইতে

কইতে পণ্ডিতমশাই-এর টিকেটা নিভে এসেছিল। চোখ চেয়ে তিনি তাতে ফুঁ দিতে সুরু করলেন।

টিফিনের সময়ে মাস্টারদের বিশ্রাম করবাব ঘবে ব'সে কথা হচ্ছিল। ঘবটি শুধু মাস্টারদের,—বিশ্রামের যতটা হোক বা না হোক, শয়ন আহারাদির বটে। ছোট ছোট বেঞ্চি জুড়ে এক পাশে সেকেণ্ড পণ্ডিত অন্য পাশে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের জল খাবার কলসীটাও ঘরের এককোণে থাকে,—আজ বাইরে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন বাসি জল না ফেলা ও কেউ তদারক না করায় নাকি এত বেশি পোকা হয়েছিল যে, ধমক দিয়েও ছেলেদের জলে পোকা হবার নালিশ বন্ধ কবা যায়নি। অবশেষে কাল থেকে কলসীটাকে রোদে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়াল পযন্ত পেরেক পুঁতে দড়ি খাটানো। তাতে পণ্ডিতমশাইদের ক'টি ময়লা ছেড়া কাপড়জামা ঝুলছে। সংখ্যায় সেগুলি অত্যন্ত কম, তাদের নতুন ব'লে ভ্রম করবারও উপায় নেই।

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই বাইরে কোনো ছাত্রের বাড়ি পড়িয়ে খেয়ে আসেন।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর খাবার ব্যবস্থাটা এইখানেই হয়। এক কোণে লোহাব একটা তোলা উনুন, ক'টা অত্যন্ত নোংবা কলঙ্ক-পড়া পেতলের থালা বাটি বাসন ও গোটাকতক তরকারির খোসা প'ড়ে আছে। ঘরের সিমেণ্ট অবিকাংশ জায়গায়ই উঠে গেছে—জঞ্জাল ও ধুলো নির্বিঘ্নে বহুদিন ধ'রে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে—তাদের সে-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা সম্প্রতি আছে ব'লে মনে হয না।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এব রান্নার দৌলতে এক ধারের দেয়াল কড়িকাঠ ও ছাদ ধোঁয়ার কালিতে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত। অন্যান্য অংশে কালি না থাকলেও ঝুলের অভাব নেই। জোড়া বেঞ্চিব এক ধাবে বিছানাটি গুটিয়ে রেখে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই কাপড় সেলাই করছিলেন। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না ক'রেই বললেন, "কাপড়ের দরটা তবু কিছু নেমেছে, কি বলেন?"

কেউ কিছুই বলল না। ফোর্থ পণ্ডিতমশাই উত্তরের অপেক্ষামাত্র না ক'রে সেলাই ক'রে চললেন।

লোকটিকে সবাই একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে—এমন কি নিরীহ সেকেণ্ড

পণ্ডিতমশাই পর্যন্ত। চেহারাটি তাঁর ভক্তি বা সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মতো নয় বটে! মাথায় খাটো, চৌকোণা দেহটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কালো বড় বড় লোমে আচ্ছন্ন— মুখে খোঁচা খোঁচা সুবৃহৎ গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল। এই লোমশ কদাকার দেহটি তিনি আবার সর্বদা অনাবৃতই রাখেন —ধুতি ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে কদাচিৎ দেখা যায়; ক্লাশে পড়াবার সময় একজোড়া খড়ম পায়ে থাকে বটে। কথা বেশি তাঁকে বলতে শোনা যায় না, কিন্তু যে ক'টি কথা কন্ তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্যহীন। কথা বলার পর নিজেই বোধ হয় নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হন। কথাটা যেন তিনি বলেন নি এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করেন তখন। লোকটির মুখে একটা সশঙ্ক দীনতার গভীর ছায়া আছে, নিজের ও পরের কাছে সর্বদাই যেন তিনি কি লাঞ্ছনা আশঙ্কা করছেন।

টিকে বেশ ধ'রে উঠেছিল; প্রস্তুত কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে হাতটি এগিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই বললেন— "নিন্ মশাই!"

বললাম, "মাপ করবেন।"

হেড পণ্ডিতমশাই পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বললেন, "তামাক খান না, ওই সিগারেটগুলো খান ত! ওগুলোর কাগজ যে মশাই থুতু দিয়ে জোড়ে— তা জানেন? সত্য ওই মেম মাগীদের থুতু —"

ঘৃণায় এক ধাব্‌ড়া থুতু পণ্ডিতমশাই ঘরের দেয়ালেই ফেললেন। তার পর হুঁকোর খোলটি ডান হাতের কর্কশ চেটো দিয়ে মুছে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন— "পায়েস ছেড়ে আমানি!"

পণ্ডিতমশাই সকল দিক দিয়ে আদর্শ স্কুলের পণ্ডিত। কোনো খুঁত নেই, বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু বেশি হবে হয়তো, কিন্তু মনের বয়স তাঁর নিরূপণ করা কঠিন। সে-মন তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন্ বৃদ্ধ-প্রপিতামহের সঙ্কীর্ণ জগৎ থেকে বহন ক'রে এনেছেন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সে-মনের সমস্ত সংস্কার ও দম্ভস্ফীত অন্ধতাকে লালন করেন।

যে বর্তমান পদে পদে তাঁর জগতের সব-কিছুর মূল্য পালট ক'রে দিচ্ছে, তার ভালো মন্দ সব-কিছুকে নির্বিচারে দাঁত খিঁচোনই তাঁর একমাত্র সুখ। রক্তহীন শীর্ণ চেহারা; দীর্ঘকালের অজীর্ণ রোগ ও এই বিদ্বেষ

মিলে মুখে একটা স্থায়ী বিরক্তির ছাপ এঁকে দিয়েছে। জুতো পায় দেন না— জামা গায় দেন না, উড়ানি ও চাদর সম্বল। মোট কথা, কঠোরভাবে তিনি ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্তব্য পালন করেন এবং সেজন্য তাঁর অহঙ্কারের সীমা নেই।

হুঁকোয় আরও দুটো টান দিয়ে বললেন, "তার চেয়ে বিড়ি ভালো। —ও ম্লেচ্ছর থুতু খাওয়ার চেয়ে ভালো।"

"A lot you know" —সেকেণ্ড মাস্টারমশাই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে সিগারেট সমেত ঠোঁট দুটি এক পাশে ফাঁক ক'রে বললেন, "কি জানেন সিগারেটের? Have you any idea? কলে মিনিটে হাজার হাজার তৈরি হয়ে আসছে— untouched by hand— এ কি আপনার নোংরা হাতে গুড় আর তামাক পাতা চটকানো!"

সেকেণ্ড মাস্টারমশাইয়ের বয়স অল্প। যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভাঙা-গালে ও বসা-চোখে ঠুলির মতো বড় গগ্‌ল চশমাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। পা ফাঁক ক'রে হাত পেছনে নিয়ে দাঁড়ালে ঠিক মর্কট ব'লে ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান নাকি অসীম এবং সে-জ্ঞানের পরিচয় তিনি সুযোগ পেলে কখনো দিতে ছাড়েন না।

হেড পণ্ডিতমশাই চটে গিয়েছিলেন। এক ধারের ঠোঁট ঘৃণাভরে একটু তুলে নোংরা কালো ক'টি দাঁত বার ক'রে বললেন, "আপনি কি বিলেত গিয়ে দেখে এসেছেন? ওদের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত ত দৌড়! ওরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির— সব ছাঁকা সত্যি কথাগুলি আপনার মতো ভক্তদের জন্যে লিখে রেখেছে! বেদ মিথ্যে হবে তবু বিলেতে ছাপা বিজ্ঞাপন সে কি কখনও মিথ্যে হতে পারে? রামঃ—!"

সিগারেট আমি খাই না, সেকথা জানিয়ে তখন আর লাভ নেই।

তর্ক অনেক দূর চলত হয়তো। কিন্তু ছেলেগুলো হুড-হুড় ক'রে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল।

"স্যার! টিফিনের ঘণ্টা হয়ে গেছে স্যার! তবু ফণে ঘণ্টা বাজাতে দিচ্ছে না স্যার!"

হাঁপাতে হাঁপাতে নালিশটুকু শেষ ক'রে ছেলেরা একটা ভয়ঙ্কর কিছু প্রতি-বিধানের আশায় সমস্ত মাস্টারদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে রইল।

থার্ড পণ্ডিতমশাই দেহের তুলনায় অত্যন্ত অপরিসর একটি বেঞ্চের উপর শুয়ে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছিলেন, এখন স্থূল দেহভার অতি কষ্টে তুলে চোখ রগড়ে' বললেন— "সব হাড় ভেঙে দেব, পাজী কোথাকার, গোলমাল কিসের রে!" —তারপর আবেষ্টনটা স্মরণ হওয়ায় আমাদের দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বললেন, "কি হয়েছে, এ ঘরে কেন?"

ছেলেগুলো এবার সমস্বরে পূর্বের নালিশের পুনরাবৃত্তি করল।

"কই, ঘণ্টা কোথায় দেখি চল্!"

"ফণের কাছে স্যার!"

"চল্, ফণের পিঠের আজ চামড়া থাকবে না।"

এসব কাজে থার্ড পণ্ডিতমশাই-এরই উৎসাহ বেশি; স্থূল শিথিল দেহের সমস্ত মাংসপেশী প্রতি পদভরে নাচিয়ে তিনি ছেলের দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ফণে স্কুলের দুর্দান্ত বিভীষিকা। প্রতিদিন সে স্কুলের একঘেয়ে ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সবাই পেছনে গেলাম। দেখা গেল ঘণ্টাটা টেবিলের ওপর যথাস্থানেই আছে। শুধু ফণের কোনো চিহ্ন নেই এবং টিফিনের ছুটি মিনিট পোনেরো আগে শেষ হবার কথা।

ক'টা ছেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে চারিদিক খুঁজে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে, "ফণে, স্যার, দেয়াল টপ্‌কে পালিয়েছে— বইগুলো স্যার ফেলে গেছে কিন্তু"— ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর বৃহৎ মুষ্টির গাঁট্টা খেয়ে নীরবে ক্লাশে গেল।

ঘণ্টা বাজল। মৌচাকের মতো গুঞ্জনের সঙ্গে স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল।

শহরতলির সামান্য বাংলা স্কুল।

শহরতলিটিও প্রাচীন ও দরিদ্র। যে নগণ্য পাকা বাড়িগুলি এখনো তার গৌরব রক্ষা করে তাদের সবারই অতি জীর্ণ দশা। রাস্তাগুলি অপরিসর ও অপরিষ্কার এবং তারই ধুলোর ওপর দিয়ে প্রতিদিন সেখানকার তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতিকষ্টে করুণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে নগ্ন দারিদ্র্যকে নামমাত্র আবরণে ঢাকবার কঠিন চেষ্টায় যাতায়াত করে।

প্রতিদিন সাড়ে দশটায ভাঙা স্কুলবাড়ির আলোকবিরল পাঁচটি ঘরে তাদেরই শ'খানেক ক্ষীণদেহ পুত্র-পৌত্র জীর্ণ মলিন বেশে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণের উপযুক্ত হবার আশায় এসে জড়ো হয়।

.. .. ..

স্কুলের হেডমাস্টার। পোনেরো দিন হ'ল কাজে ঢুকেছি।

বাড়িতে মামা বলেন— "এখন কাজে ঢুকেছিস্ থাক— নেই মামার চেয়ে কানামামা ভালো! কিন্তু চারিধারে নজর যেন ঠিক থাকে। যত পারিস অ্যাপ্লিকেশন্ ক'রে যাবি, স্টেট্‌সম্যান রোজ পড়িস ত!"

চুপ ক'রে থাকি।

মামা আরও বলেন, "সাধ ক'রে কেউ কি আর মাস্টারি করে! বলে, দশ বছর মাস্টারি করলে গোরু হয়, বিশ বছরে গাধা! ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পাঁচ বছর মাস্টারি করেছে শুনলে মার্চেণ্ট আপিসে ঢুকতেই দেয় না—"

মামার সব কথা কানে যায় না। অনেক সুবৃহৎ আশা ও কল্পনা মনকে অধিকার ক'রে থাকে।

স্ত্রী ভাতের থালা রেখে বাতাস করতে করতে হয়তো বলে, "কিন্তু মাইনে যে বড় কম, চলবে ত?"

এবার মুখ খোলে।

"আজকের বাজারে চাকৃরি করলে, কী এর চেয়ে ভালো ক'রে চলত? বেলা দশটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সাহেবের গালাগাল হজম ক'রে না-হয় আর ক'টা টাকা বেশি পেতাম। সে না-হয় কেমিকেলের চুড়ি পরতে— আর এ না-হয় কাঁচের চুড়ি পরবে— এ কি তার চেয়ে খুব খারাপ চলা হ'ল?"

বলতে বলতে খাওয়া থামিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। উমা তাড়াতাড়ি সাগ্রহে মাথা নেড়ে মতে সায় দেয়।

আরও উত্তেজিত হয়ে বলি, "এ কত বড় সম্মানের কাজ!"

"নিশ্চয়ই! তুমি কিন্তু মোটে খাচ্ছ না! ও-চচ্চড়ি আবার ফেলে রাখলে কেন?"

"এই যে, খাই।" —তাড়াতাড়ি কয়েক গ্রাস মুখে তুলে গিলে ফেলে বলি,

"শুধু সম্মান? এ কত বড় কাজ বলো দেখি! কেরানিগিরির সঙ্গে এর তুলনা হয়! না খেতে পেয়ে মরলেও যে এতে সান্ত্বনা থাকবে— কিছু ক'রে মরলাম। এ ত আর মামা যা বোঝে সেই ছেলে-ঠ্যাঙানো নয়। মানুষ জাতটাকে গ'ড়ে তোলবার ভার আমাদের ওপর, তা জানো? প্রাণ দিয়ে করলে এর চেয়ে বড় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর আছে! বিলেতে, তুমি যা বললে বুঝবে— শুধু কি ক'রে শেখানো উচিত তাই ঠিক করবার জন্যে কত লোক জীবনপাত করছে! এ ত আর মাটি-কাঠ-পাথর নিয়ে কাজ নয়, আসল মানুষ নিয়ে কাজ···"

"ও সেই তোমার আনা ওলটা, বুঝেছ না! খুব ত তেঁতুল দিয়ে একবার সেদ্ধ ক'রে ফেলেছি, আর বোধ হয় লাগবে না— লাগছে কি?"

"না, বেশ লাগছে!"

"তবু লাগছে?"

বিরক্ত হয়ে বলি, "আর কিছু ত বোঝ না— বাংলাটাও কি বুঝতে নেই! বেশ লাগছে মানে ভালো লাগছে।"

.. .. ..

স্কুলে যাই।

থার্ড পণ্ডিতমশাই গেট্ থেকেই পরম পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর মতো সুপুষ্ট নাতিলঘু বাঁ হাতখানি কাঁধের ওপর রেখে এক পাশে টেনে নিয়ে যান ও সুবৃহৎ ফোলা মুখখানি মুখের অস্বস্তিকর-রকম নিকটে এনে, হাপরের মতো অতিগোপন ফিস্‌ফিস্ স্বরে বলেন, "নতুন এখানে ঢুকলেন ত! হালচালও এখানকার কিছু জানেন না। তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছি!" —সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আরক্ত চোখ দুটি স্ফীত ও বৃহত্তর হয়ে তাঁর উপদেশ সমর্থন করে।

তিনি ব'লে যান, "পরের কথায় হেলবেন না মশাই, কারুর না, এই যে আমি বলছি আমার কথাতেও না, ও আমার কাছে ন্যায্য-কথা,— আমি ব'লে ত আর পীর নাই। একেবারে আপ্‌রাইট অ্যাজ এ কোকোনট ট্রি। নতুন পেয়ে সবাই একবার বাজিয়ে দেখবে কিনা, দুনিয়ার নিয়মই এই! কিন্তু বোল্ দেবেন একেবারে কাটা-কাটা— ঢিমে-তেতালা কখনো নয়, নেভার্।"

হাপুরে ফিস্‌ফিস্ ক্রমে সুস্পষ্ট হাঁড়িগলায় এসে পৌছোয়। "একটু ফ্রেণ্ডলি অ্যাড্‌ভাইস্ দিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন!" একটি মোলায়েম হাসি দিয়ে মনে করবার সব-কিছু মুছিয়ে দিয়ে হঠাৎ মুখটা আবার নামিয়ে এনে

পণ্ডিতমশাই চুপি চুপি বলেন— "একটা মজা দেখবেন? হট্ ক'রে আজ জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন দেখি, সেভেন্থ ক্লাশের রেজেষ্ট্রিতে চোদ্দজনের নাম, আর ক্লাশে পোনেরোজন হয় কি ক'রে! অমনি ঘুরতে ঘুরতে ক্লাশে ঢুকে বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস ক'রে বস্‌বেন, বুঝেছেন? তারপর দেখবেন রগড়খানা! অনেক মজা আছে মশাই এইটুকুর মধ্যে— বহুত রগড়—"

হঠাৎ সুর বদ্‌লে পণ্ডিতমশাই বলেন, "চলুন!" এবং স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন, "সেভেন্থ ক্লাশে, বুঝেছেন! অমনি বেটপ্‌কা জিজ্ঞেস ক'রে বসবেন!"

মনটা দমে' যায় একটু হয়তো।

ঘণ্টা বাজে। স্কুল বসে। পাশের ঘরের গোলমালে পড়ানো যায় না। উঠে গিয়ে দেখি, সেকেণ্ড মাস্টারমশাই এসে পৌছন নি; কোনদিনই তিনি সময়ে এসে পৌছন না। ছেলেগুলোকে নিজের ক্লাশে নিয়ে এসে বসাই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে দু'খানা মোটা মোটা বই হাতে ক'রে সেকেণ্ড মাস্টার-মশাই আসেন। বইগুলোর নাম পড়া যায় এমন ভাবেই টেবিলের ওপর রেখে বলেন, "আপনি আবার কষ্ট ক'রে এ-ঘরে এসেছেন। কিছু দরকার ছিল না।" বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, "পড়বেন নাকি একখানা? নিন্ না, ওয়েল্‌সের এখানা নিন্— গকিরখানাও নিতে পারেন, যেটা খুশি—! আমার ওসব দু'দু'বার পড়া হয়ে গেছে, তবু আবার পড়ি— স্‌প্লেণ্ডিড্ বুক্‌স্! কোন্‌টা দেব?"

বিনীতভাবে বলি, "এখন পড়বার সময় হবে না।"

বইগুলো তুলে নিয়ে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তিনি বলেন, "এ সব বালাই বুঝি নেই আপনার? মন্দ নয়; আমার কিন্তু মীট্ অ্যাণ্ড ড্রিঙ্ক মশাই।"

রুগ্ন বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ ও শীর্ণ খর্ব দেহ দেখলে সেকথা বিশ্বাস হয় বটে!

ছেলেদের ডেকে নিয়ে, দেরি হবার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে, তিনি চলে যান।

দেরি করা সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরেই বলব বলব ক'রেও কিছু বলতে পারছি না।

আবার পড়ানয় মন দিই। ফার্স্ট ক্লাশের তিনটি মাত্র ছেলে। কুঁজো হয়ে বুড়োর মতো মাথা নিচু ক'রে নির্জীবের মতো আনমনা ভাবে চুপ ক'রে থাকে। এক এক সময় মিছেই বকে মরছি মনে হয়, মনে হয় কিছুই শুনছে না। চোদ্দ পোনেরো বছর সব বয়স— মুখে জৌলুস নেই— চোখে জ্যোতি নেই! —হঠাৎ নিজের ওপর বিরক্তি ধরে। মনে হয়, আমার শুষ্ক বই-এর ব্যাখ্যার চেয়ে আলো বাতাস ও পুষ্টির এদের ঢের বেশি প্রয়োজন।

তবু পড়িয়ে চলি। কোথা থেকে, মাঝে মাঝে একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসে। ছেলেগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে— নাকে কাপড় দেয়।

"কিসের দুর্গন্ধ বলো ত?"

ক্ষ্যাপাটের মতো একটা অত্যন্ত নোংরা রোগা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কোটের নিঃসঙ্গ বোতামটিকে বাঁ হাতে নাড়তে নাড়তে বোকার মতো হেসে হড়-বড় ক'রে বলে, "পায়রা পচেছে স্যার, ওই যে পায়রাগুলো আছে স্যার, তাই খোপের মধ্যে পচে' গেছে স্যার, প্রায় স্যার পচে' যায়। ভয়ানক গন্ধ স্যার! হোয়াক্ থু!" —ছেলেটা জানালায় গিয়ে থুতু ফেলে।

বারান্দায় কার্নিশের ওপর অনেকগুলো পায়রা থাকতে দেখেছি বটে।

উৎকট দুর্গন্ধ। একটা কিছু বিহিত করা দরকার।

মাস্টারমশাইরা বলেন— "ওখানে কে উঠবে মশাই। ও খানিক বাদে গন্ধ আপনিই যাবে'খন।"

বেয়ারাটা মই ছাড়া অতদূর উঠতে পারবে না বলে।

বাইরে যাবার ছুতো ক'রে ছেলেগুলো বাইরে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে দেখে।

মাস্টাররা নাকে কাপড় দিয়ে এসে ওপর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন।

সেকেণ্ড মাস্টারমশাই রুমাল নাকে দিয়ে বলেন, "রট্‌ন্ প্লেস্, পায়রাগুলো পর্যন্ত রট্‌ন্।"

একটা ছেলে হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সঙ্গে জানালার গরাদে, দরজার মাথা ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে অর্ধেক পথ উঠে গিয়ে বলে, "আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার?"

"আমি উঠে পেড়ে দেব স্যার!" ভেংচিয়ে ছড়ি তুলে থার্ড পণ্ডিতমশাই বলেন, "তোমায় কে বাহাদুরি দেখাতে বলেছিল বাঁদর? নেমে এস, দেখাচ্ছি— সব কাজে বাঁদরামি!"

তাঁকে থামিয়ে বলি, "পারে যদি উঠুক্ না; আর কোনরকম বন্দোবস্ত যখন হচ্ছে না—"

"আস্কারা পায় মশাই!"

ফণে ততক্ষণ কারুর কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে দরজার মাথায় গিয়ে উঠেছে। কড়িকাঠের ফোকরের ভেতর হাত ভ'রে একটা মরা আধপচা পায়রার ছানা বা'র ক'রে হেসে বলে, "পায়রার ছানা স্যার! পায়রাগুলো হাতে আবার ঠুক্‌রে দেয়!"

ছেলেটা স্কুলের চক্ষুশূল এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির একমাত্র ব্যাঘাত। তবু ছেলেটার উজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা চোখ দুটি কেমন যেন ভালো লাগে। এখানকার নির্জীব স্থবিরতার মাঝে ও-ই যেন একটুখানি সজীব চঞ্চলতা—!

দুর্গন্ধ পচা পায়রার একটা কিনারা হয়। মাস্টার ও ছেলেরা আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। থার্ড পণ্ডিতমশাই যাবার সময় আব একবার ইসারা ক'রে তাঁর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান।

একটু ঘুরে দেখতে বেরোই।

সেকেণ্ড মাস্টারমশাই বই পড়ছিলেন। আঙুল রেখে সেটি মুড়ে অত্যন্ত অলসভাবে ঈষৎ বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ান। ছেলেগুলো লেখা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলেন, "আমার মেথড্ হচ্ছে কী জানেন— খালি লেখা, ছেলেদের খালি লিখতে দেওয়া। আমি এই ছ-মাসে এ মেথডে ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট পেয়েছি। শুধু মুখে পড়ানর চেয়ে এ ঢের এফেক্‌টিভ্। চোখ, কান ও হাতের সেন্সেশান্ সমস্ত দিয়ে ব্রেন নলেজ্‌টা রিসিভ্ করে কিনা!" একটু দর্পের হাসি হেসে আবাব বলেন, "কাজটাতে একদম আমার লাইকিং নেই যদিও, তবুও মেথড্ অফ টিচিং নিয়ে একটু আধটু এক্সপেরিমেণ্ট করেছি,— আপনি 'ড্যাল্টনের মেথড্' সম্বন্ধে পড়েছেন নিশ্চয়!"

শুক্‌নো একচিম্‌টে মানুষটির ছোট্ট মুখের অর্ধেকের বেশি 'গগ্‌ল্'টাই অধিকার ক'রে আছে। ওইটুকু মুখ থেকে এই সব অহঙ্কারের কথা ভারী হাস্যকর লাগে।

বলি, "ছেলেদের 'অ্যাটেণ্ডেন্স'টা এ ক'দিন খাতায় তুলতে ভুলে গেছেন, অনুগ্রহ ক'রে আজ তুলে রাখবেন।"

"ও, 'সরি'— মনে ছিল না।"

যেতে যেতে বুঝতে পারি লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

একই ঘরের দুই প্রান্তে হেডপণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাশ। টুঁ শব্দটি নেই। দুইজনেরি বিশ্বাস তাঁর মতো ডিসিপ্লিন কেউ রাখতে জানে না এবং প্রত্যেকেই অপরের এই 'ডিসিপ্লিন' রাখবার ক্ষমতাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এক ঘরে দু'জনার ক্লাশ থাকলে আর রক্ষে নেই। দু'জনে প্রতিযোগিতা ক'রে ডিসিপ্লিন রাখতে সুরু করেন।

ছেলেরা পাংশুমুখে সভয়ে নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত টানতে দ্বিধা করে।

নিস্তব্ধ ক্লাশে শুধু দুই পণ্ডিতমশাই-এর গলা শোনা যায়— মাঝে মাঝে।

"পেন্সিল ঠুকছে কে রে! শব্দ-টব্দ করা চলবে না বাপু; এটা মামার বাড়ি নয়,— ইস্কুল। এদিকে আয় দেখি।"

চপেটাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যুত্তরে থার্ড পণ্ডিতমশাই এক পর্দা চড়িয়ে ধরেন— "পা দোলাচ্ছিস কেন রে কেষ্টা? কি ব'লে দিয়েছি আমি কাল? শুধু চুপ ক'রে থাকলেই আমার ক্লাশে সাত খুন মাফ্ হবে না বাপু, এ বড় কঠিন ঠাঁই; হাত, পা, মাথা কিচ্ছু নড়বে না —একেবারে পুতুলটি হয়ে থাকতে হবে।"

হেডপণ্ডিত মনে মনে বোধ হয় এর পাল্টা চাল খোঁজেন।

নিস্তব্ধ ক্লাশ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

থার্ড পণ্ডিতমশাই ইসারায় আমায় সে-কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন।

ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল—

হেডপণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর শাসনে রুদ্ধবেগ সমস্ত দৌরাত্ম্য সুদ সমেত তারা ফোর্থ পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাশে মুক্ত ক'রে দেয়।

কেউ তাঁকে মানে না। চারিধারে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। পণ্ডিতমশাই পাখার বাঁট দিয়ে এলোপাথাড়ি প্রহার ক'রে তাড়াবার চেষ্টা করেন। ছেলেদের ভারি একটা খেলা মনে হয় বোধ হয়। পাখার বাঁটের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা হাসতে থাকে।

"স্যার, নগেন স্যার, চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে।"

"না স্যার" —অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নগেন নিজের জায়গায় গিয়ে হাসে।

অগত্যা পণ্ডিতমশাই ওঠেন, দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, "সক্কলের এক ঘা ক'রে বেত।" এবং পরক্ষণেই দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ ক'রে অকারণ হাসিটুকু প্রকাশ পায়।

ছেলেরা হৈ চৈ করে— "হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার!" এবং স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে হাসে।

পণ্ডিতমশাই পাখার বাঁটের এক এক ঘা ক'রে মেরে যান।

"হ্যাঁরে অনিল, তোর না ফার্স্ট বেঞ্চিতে জায়গা?"

ছেলেরা চিৎকার ক'রে বলে, "হ্যাঁ স্যার, ও একবার মার খেয়েছে স্যার, আবার খাবার জন্যে নেমে এসে বসেছে স্যার— !"

"আর তোকে মারব না ত।"

অনিল অনুনয় ক'রে বলে, "আর একবার স্যার!"

একটা ছেলে চেঁচিয়ে জানায়, "ওই আপনার ডাল ভিজে গেল স্যার, বৃষ্টি পড়ছে।"

পণ্ডিতমশাই-এর ডাল রকে খবরের কাগজের ওপর শুকোয়। তাড়াতাড়ি মার ফেলে পণ্ডিতমশাই ডাল তুলতে দৌড়ান। সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে।

ধীরে ধীরে সেখান থেকে চ'লে আসি। কিছু বলতে পারি না কেন জানি না। আসবার পথে দেখি, বৃদ্ধ সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই ক্লাশে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। মাথাটা চেয়ারের পেছনে কাত্ হয়ে ঝুলে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখ তাঁর চিরপ্রসন্নতার আভাস হারিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ও কাতর দেখায়।

আবার টিফিনে ফণের নূতন কীর্তির তদন্ত করতে হয়। সেকেণ্ড পণ্ডিত-মশাই-এর ঘুমোবার সময় সে নাকি রেজেষ্ট্রি খুলে সমস্ত অনুপস্থিত চিহ্নগুলি উপস্থিতের চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। শুধু নিজের নামটি ক'রেই সে নাকি ক্ষান্ত থাকেনি, অত্যন্ত পরার্থপরতার সঙ্গে ক্লাশের সকলকেই নিজের গৌরবে সমান অধিকার দিয়েছে।

স্কুলের দিন এমনি ক'রে কাটে।

"কাপড় কেনাটা এবারে না-হয় থাক্—" উমা বলে।

বুঝি সবই। তিনমাস ধ'রে অত্যন্ত পুরোনো কাপড় দুটো সেলাই ক'রে

কোনোরকমে চালাবার ইতিহাসটাও তার জানি। তবু চুপ ক'রে থাকি। কিছুদিন ধ'রে আর একটা টিউশনির চেষ্টা দেখছি; এখনো জোগাড় ক'রে উঠতে পারিনি।

"মুদি কাল আবার এসেছিল, ওর আর কেরোসিন তেল-ওয়ালারটা দিয়ে দিলেই এখন চলবে। অন্যগুলো দু'দিন দেরি করলে ক্ষতি নেই।" —একটু হেসে উমা আবার বলে, "খোকার জামার কাপড় আর কিনতে হবে না, তোমার সেই ছেঁড়া শার্টটা থেকে খোকার কেমন জামা করেছি দেখবে?"

অত্যন্ত খুশির ভান ক'রে উমা তাড়াতাড়ি জামাটা এনে দেখায়। হাসিমুখে বলি—"বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত! ওই ছেঁড়া জামাটা থেকে এমন সুন্দর হ'ল? তুমি দেখছি অ্যারেবিয়ান্ নাইট্সের জাদুকরী!"

এবার সত্যিকারের আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, "তোমার সব কথায় ঠাট্টা!"

কিন্তু আনন্দটাকে বেশিক্ষণ ধ'রে রাখা যায় না। কখন দেখি তা উবে গেছে।

মনে মনে সঙ্কল্প করি, এবার আর একটা টিউশনি জোগাড় করবই।

ম্লানমুখে উমা এক সময় বলে, "মামারা আর এখানে আসবেন না, বোধ হয় কিছু মনে ক'রে গেছেন।"

"কেন?"

"যত্ন-টত্ন কিছুই ত করতে পারিনি। সত্যি তাঁদের ভালো ক'রে যত্ন না করতে পেরে এমন লজ্জা হ'ত!" —ব'লে উমা একটু হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, "তাঁরা ত আর রোজ আসেন না, পাঁচ দশ বছরে একবার! তাও যত্ন করতে পারলাম না!"

সত্যি কথা। কিন্তু যত্ন না করতে পারাতেই মুদির কাছে দ্বিগুণ ঋণ হয়ে গেছে। স্বজনপ্রীতি হয়তো অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস, কিন্তু তার পরিচয় দেবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আত্মীয়স্বজন আসার আনন্দের পেছনে অত্যন্ত স্থূল অত্যন্ত হীন দুর্ভাবনাটাকে কোনরকম ধমক দিয়েই চেপে রাখবার উপায় নেই।

"তুমি অত ভাবছ কেন বলো ত? এ-মাসে না-হয়, আর-মাসে কাপড়চোপড় কিনলেই ত হবে। ত্রিশটা দিন বই ত নয়— ও-মাসে ত আর উপ্রি খরচ নেই।"

কিন্তু ও-মাসেও হয় না।

হঠাৎ ডাক্তার ও ডাক্তারখানার বিল বেড়ে ওঠে। খোকার অত্যন্ত অসুখ। অনেক কষ্টে সেরে ওঠে।

উমা বলে, "দেখ, এ-মাসটাও কাপড় না হ'লে চ'লে যাবে। সেমিজটায় তালি লাগিয়ে নিয়েছি, কাপড়ের তলায় থাকবে, তালি থাকলেই বা কে দেখতে যাচ্ছে।" খানিক থেমে বলে, "তোমার জুতো জোড়াটা যেন এবারেও কিনতে ভুলে যেও না।"

"পাগল হয়েছ আমি নেহাৎ আহাম্মুক তাই জুতো কিনব বলেছিলুম। হাফ্‌সোল আর হীল্ লাগিয়ে এই তিনটে জায়গায় তালি দিলে এ-জুতোকে আর ছ'মাসের মতো দেখতে-শুনতে হবে না। কি রকম মজবুত জুতো এ—!"

উমা কি জানি কেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

খানিক বাদে বলে, "খোকার একটা বিলিতি দুধ এনো!"

"এই সেদিন বিলিতি দুধ এল, এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এ রকম খরচ করলে ত পারা যায় না।" —একটু বিরক্তই হই।

মুখ ম্লান ক'রে উমা বলে— "এ রকম আর কী খরচ করি। ডাক্তার তবু কতবার ক'রে খাওয়াতে বলেছিল, আমি ত শুধু সকালে একবার রাত্রে একবার খাওয়াই, আর বাকি ত শুধু অ্যারারুট দিই।"

জোর ক'রে বলি— "ডাক্তাররা ও-রকম ঢের বলে। অ্যারারুট বেশি ক'রে দিও। বিলিতি দুধ যখন ছিল না তখন আর এদেশে ছেলে বাঁচত না?" নিজের বেদনাময় সন্দেহের কাঁটাটাও বোধ হয় ওই দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

ইনফ্যাণ্ট-ক্লাশের ছেলেগুলো বসতে পায় না, মাটিতে বসে। ক'টা বেঞ্চির অত্যন্ত দরকার। ঘরটাও বড় অন্ধকার; পেছন দিকে একটা জানালা ফোটালে ভালো হয়।

সেক্রেটারিমশাই অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর হাত নেই। বললেন, "বোর্ড থেকে না হুকুম দিলে আমি ত কিছু করতে পারি না।"

অনেক দিন বাদে বোর্ড থেকে সংবাদ এল। জানালাটা সম্বন্ধে এখন কিছু করা যায় না। জানালার পেছনের জায়গাটাই অপরের। তারা বোধ হয় জানালা খুলতে দেবে না। তা ছাড়া, বাড়িওয়ালা থাকেন বিদেশে, তিনি

জানালা হয়তো খুলতে চাইবেন না—ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা। সুতরাং জানালা খোলা হবে না।

বেঞ্চি সম্বন্ধে কথা এই যে, ইনফ্যাণ্ট-ক্লাশের ছেলের সংখ্যার কিছু ঠিক নেই। কখনও বাড়ে কখনও কমে। সুতরাং তার জন্যে স্কুলের টাকার এই টানাটানির সময বেঞ্চি কেনা সুবুদ্ধিব কাজ নয়। অন্য ঘর থেকে একটা নিয়ে চালিয়ে দিলেই হবে।

হয়তো কথাগুলো বিবেচকেব মতো। কিন্তু মনটা ভালো নেই। কিছুদিন আগেই বোর্ড থেকে এক রহস্যময় আদেশ এসেছে মাস্টারদের ওপব —আর স্কুলে নির্দিষ্ট পাঠ্যের অতিরিক্ত কিছু পডিয়ে যেন সময় নষ্ট করা না হয়।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল মাঝে মাঝে বাইবের বই থেকে ছেলেদেব আমি গল্প-গাছা বলি বটে। সেটা দূষণীয় ভাবিনি এবং তা লুকোবার কোনো চেষ্টাও আমার ছিল না। কিন্তু সে-সংবাদ বোর্ডেব কানে হঠাৎ গেলই বা কি ক'বে তাও বুঝতে পারি না।

কিছুদিন আগে ইনফ্যাণ্ট-ক্লাশকে একঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়াব নিযম নিয়েও একটু গোল হয়েছে।

হুকুম এসেছে— "অনুগ্রহ ক'রে প্রচলিত নিয়ম পবিবর্তন করবেন না।"

পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাব করতে গিযেও অমনি বিফল হযেছি।

থার্ড পণ্ডিতমশাই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, "আপনারা ছেলে-মানুষ—এখনও সরল প্রকৃতিব, ওসব সংসাবের মার-প্যাঁচ ত এখনও বোঝেন না। আপনি সরল মনেই গেলেন নতুন বই বদলাতে, লোকে ত আর তা বুঝবে না। তারা ভাবলে, আপনি বইওয়ালাদের কাছে ঘুষ খেয়েছেন। ও-রকম খায় যে মশাই। আপনি যে সরল মানুষ তা ত আর লোকে বুঝবে না ”

সমস্ত গা'টা কেমন যেন রী-রী ক'রে উঠেছে। পণ্ডিতমশাই-এর আকস্মিক অন্তরঙ্গতার কারণও বুঝে উঠতে পারিনি। স্কুলে ঢোকবার প্রথম দফাতেই তাঁর সঙ্গে তাঁর একটা অনুরোধ নিয়ে একটু ঠোকাঠুকি হয়েছিল।

অনুরোধ না রাখার পরের দিনই তিনি হঠাৎ টিফিনের সময় নিজে থেকেই

ব'লে উঠেছিলেন, "হেডমাস্টার মশাই বলছিলেন, সব ছেলের নাম ত রেজেস্ট্রিতে নেই— সেটা ত ভালো কথা নয়।"

অত্যন্ত 'কিন্তু' হয়ে ফোর্থ পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "দেখুন, এই তিনদিন বাদেই ওর বাপ এসে ভর্তি ক'রে দেবে, এই দু'দিন অমনি বসছে। অমনি আসে আমি আর বারণ করতে পারি না···"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম— "আমি ত এ-রকম কোনো কথা বলিনি, আপনিই ত বরং আমায় এ-খোঁজটা করতে বলেছিলেন থার্ড পণ্ডিতমশাই!"

সেইদিন থেকে পণ্ডিতমশাই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলতেন! হঠাৎ তাই এই আত্মীয়তা একটু বিস্ময়কর লাগল সেদিন।

টিফিনের ঘণ্টায় বিশ্রাম-ঘরে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। কোথাকার রেলভাড়া ক'পয়সা কমেছে উৎসাহের সঙ্গে সেই আলোচনা চলে।

পাশে ব'সে সেকেণ্ড মাস্টার থার্ড পণ্ডিতমশাইকে কোন্ কোন্ বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর কিরূপ অন্তরঙ্গতা আছে তারই গল্প বলেন। তিনি যে নিজেও একজন সাহিত্যিক এ-কথা সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন এবং এই বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ হবার পর থেকে নিজেদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমস্ত স্কুল একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাড়াছাড়া দু'একটা কথা শুনতে পাই—

"এ-ইস্কুলে আর ক'দিন আছি বলুন······কি জানেন, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের সঙ্গে এসব কাজ করা চলে না······কোনরকমে প'ড়ে আছি বই ত নয়······ লেখাটা পেইং হ'তে আমাদের দেশে একটু দেরি লাগে কিনা···বিশেষতঃ ভালো লেখা······বিলেতে হ'লে কি আর ভাবতে হ'ত! নতুনের কদর কি এদেশে বোঝে······"

এই ছোট্ট শুক্‌নো মানুষটির দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগ্য এই দেশ অত্যন্ত নির্বোধ ব'লেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অবিলম্বে দিতে পারছে না। পণ্ডিতমশাইও শোনেন ব'লে মনে হয় না।

এই নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়েমি অসহ্য বোধ হয়। হাঁপিয়ে উঠি।

ফণেও স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে স্কুল চলে।

তার শেষ কীর্তি পকেটের ভিতর জ্যান্ত হেলে সাপ এনে ক্লাশের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। থার্ড পণ্ডিতমশাই-এর কাছে বেদম মার খেয়ে তারপর সে

আর স্কুলে আসেনি। তার বাপ এসে স্কুলে ব'লে গেছে— তার নাকি বিদ্যা হবার কোনো আশা নেই— সবাই তাই বলে।

দু'একটা ছেলে এসে খবর দিয়েছিল— সে নাকি এবার তার বাপের ব্যবসা দেখবে। সবাই বলেছিল— "বেনের ছেলে ত!"

দুটো টিউশনিই গেছে।

খোকার অত্যন্ত লিভারের দোষ হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

আজকাল আবিষ্কার করেছি, রাত্রে শুধু দুটি ছাতু খেয়ে থাকলে শরীর ভারি হাল্কা থাকে, অজীর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উমা বলে— "ও-সব সেমিজ-টেমিজ আজকালের ফ্যাশান বই ত নয়! বয়স হয়েছে, আর বাপু লজ্জা করে পরতে— তা সেকেলে বলুক আর যাই বলুক লোকে।"

উমার বয়স উনিশ হয়েছে বটে।

সেদিন অতিকষ্টে রাগ সামলেছি।

মাথাটা সকাল থেকে অত্যন্ত ধরা। তবুও পড়িয়ে যাই।

পড়াতে পড়াতে একটি ছেলের প্রতি কেমন সন্দেহ হয়— শুনছে না। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারে না। ধমক দিয়ে আবার পড়াতে আরম্ভ করি।

হঠাৎ চোখে পড়ে ছেলেটা বই আড়াল দিয়ে অন্য কী পড়ছে।

বই-এর পেছনে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ধরা পড়ে।

সমস্ত রক্ত যেন এক মুহূর্তে মাথায় উঠে যায়—

"পাজি কোথাকার! আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে আর তুমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছ!" —কান ধ'রে হিড হিড় ক'রে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসি।

নিজের পৈশাচিক রাগে নিজেই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে তাকে ছেড়ে দিই। সামান্য কারণে এমন রাগ ত আমার কখনো হ'ত না!

এবার বর্ষাটা বড্ড বেশিদিন ভোগাচ্ছে। জুতোটা আরও দু'মাস বেশ পায়ে-দেওয়া যেত। বর্ষার জন্যেই যা অনবরত ভেতরে জল ঢুকছে। তা ব'লে

এই ক'দিন বর্ষার জন্যে এমন জুতোটা ফেলে দিয়ে আবার এক জোড়া কেনা ত আর যেতে পারে না!

সর্দিটা বোধ হয় এই ভিজে পায়ে থাকার জন্যেই বাড়ছে। মাথাটা আজকাল রোজই ধরে। কেমন যেন গায়ে জোর পাই না।

উমা চিন্তিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে বলে—"তোমার কিন্তু গলার হাড় দেখা দিচ্ছে! তুমি আজকাল মোটে ভালো ক'রে খাও না।"

হেসে তার পিঠ চাপড়ে' বলি, "হাড় থাকলেই দেখা যায়—"

স্কুলের শেষ তুটো ঘণ্টায় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার বলেছে, "কিছুদিন রেস্ট্ নিন্ না— আপনিই সেরে যাবে।" বলি, "হ্যাঁ, এইবার নেব ভাবছি— আচ্ছা এর কোনো ওষুধ-টোষুধ দেওয়া চলে না ত?"

"কিছু না। শুধু বিশ্রাম নিলে আপনি সেরে যাবে।"

ক্লাশে শেষ দু'ঘণ্টায় কিছুতেই বই খুলে পড়তে পারি না।

আর সত্যিই মাঝে মাঝে লিখতে দেওয়া ত আর খারাপ নয়। লেখাটাও ত দরকার। আমি ত আর ফাঁকি দেবার জন্যে লেখাচ্ছি না— লেখার ভেতর দিয়েও ত ছেলেদের বেশ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়। ভেবে-চিন্তে লেখার একটা খেলাও ত বা'র করা যেতে পারে।

ছেলেদের বলি— "কে কোন্ অক্ষর নিবি বল্।"

"এফ, স্যার"— "আর"— "সি"……

"বেশ। আজকের পড়া থেকে নিজের নিজের অক্ষর যে-ক'টা কথার আগে আছে খুঁজে-খুঁজে খাতায় লিখে ফেল দেখি। দেখি কার ভাগ্যে ক'টা অক্ষর পড়ে।"

বেশি ক'রে ছেলেদের আর বোঝাতে হয় না। ক'দিন ধ'রেই তারা এ খেলা করছে— জানে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ স্যার।"

এই ত বেশ লেখার পদ্ধতি! ধরতে গেলে মাথা থেকে বেশ ভালো মতলবই বেরিয়েছে!

একটা ছেলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাতা দিয়ে বলে, "আমার 'ওয়াই' ছিল স্যার, হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা এবার 'ই' ধরো—"

ছেলেরা কী বোঝে জানি না ; কেউ আর খাতা নিয়ে আসে না।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি।

চম্‌কে দেখি—

ঘুমোচ্ছিলাম···

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম !

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে গা চুলকোবার যোগাড় করছে, এমন সময়ে ওপরে আওয়াজ হ'ল— "হুম, হুম!" দিনদুপুর হ'লে কি হয়— জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চম্‌কে এদিক-ওদিক চেয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দে লাফ। এ-ডাল থেকে আর ডালে, সে-ডাল থেকে একেবারে আর এক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আর একটু হ'লেই হয়েছিল আর কি! গেছো প্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হোক, দিনকানা ব'লে আর কখনও তাকে হনু ক্ষেপাবে না।

শিকার ফস্‌কে চক্‌চকে ছুরির মতো চোখ তুলে, চিতা একবার গেছো প্যাচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে একবার চুক্‌লি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছোপ্যাচা হুতুম নির্বিকার— ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি যেন। আধবোঁজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললে— "কাজটা কি ভালো হচ্ছিল বন্ধু— বিশেষ এই দিনদুপুর বেলা?"

চিতা নিচে থেকে ফ্যাঁস ক'রে উঠ্‌ল— "দিনদুপুর বেলা মানে?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে— "মানে, আজকাল তোমরা বনের শাস্তরটাস্তর সব উল্টে দিলে কিনা! দিন রাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনী রাতে পর্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চটে' উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বললে— "রেখে দাও তোমার ও-সব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস ক'রে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের ত আর আমার মতো সাত সন্ধ্যে নিরক্ত উপোস করতে হ'ত না, ক্ষিদেয় পেট পিঠ একও হয়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হোক একটা খরগোসও মিল্‌ত।"

হুতুম চোখ বুঁজেই বললে— "এত অধর্ম ছিল না ব'লেই মিল্‌ত।"

চিতা চটে' কাঁই হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চুকলি খাবার পর গেছোপ্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাৎ উঁচু আর পল্‌কা ব'লেই তাকে এবার একটা হাই তুলে স'রে পড়তে হ'ল। যাবার সময় শুধু একবার ব'লে গেল— "দিনেব চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক্ তোর!"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বললে— "হুম"।

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হনু এসে হাজির। মৌতাতে গেছো প্যাঁচার চোখ তখন আবার বুঁজে আসছে।

হনু বললে— "দেখলে দাদা চিতার নেমকহারামিটা! তুমি না থাকলে ত সাবড়েই দিয়েছিল!"

হুতুম বাজে কথা বেশি কয় না, বললে— "হুম"।

হনুর একটু বেশি কিচির-মিচির করা স্বভাব। সে ব'লেই চলল— "অথচ এই আর-অমাবস্যায় ওর কি উপকারটা না করেছি? বারশিঙার জলায় মাছেব লোভে গেছলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চা-বাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে সে খবর ত' রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেই হয়ে গেছ্‌ল আর কি!"

হুতুমের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে হনু আবার বললে— "আমিই প্রাণ বাঁচালাম আর আমাকেই কিনা তাগ্‌!"

হুতুম এবার চোখ খুলে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে— "এ ত আর নতুন দেখছিস্ না বাপু! ও-জাতেব ধারাই ত এই। থাবায় যারা নোখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম!"

হনু পিঠ চুলকে বললে— "কিন্তু কি করা যায় বলো ত' দাদা! বনে ত' আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নিচে কেঁদো; দাঁড়াই কোথায়?"

হুতুম বললে— "হুম"।

হনু হতাশভাবে বললে— "একটি উপায় বাৎলাতে পারো না হুতুমদা! তোমার এমন মাথা!"

মাথার প্রশংসায় একটু খুশি হয়ে হুতুম বললে— "উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?"

"পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমি ত নয়, বনের সবাই অতিষ্ঠ

হয়ে উঠেছে। এই ত' কাল কেঁদো বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা রফা করেছে। বয়ার ত' রেগে আগুন হয়ে গেছে ; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।”

হুতুম তাচ্ছিল্যভরে বললে— “ও সব চারপেয়ের কর্ম নয়।”

হনু হুতুমের এই দুর্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ, খুব ধীর ; কিন্তু মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটে ব'লে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বললে আর রক্ষা নেই।

হনু নরম হয়ে তোষামোদ ক'রে বললে— “দু'পেয়ে ব'লেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।”

হুতুম খুশি হয়ে বললে— “তবে শোন্।” কিন্তু কথা আর কিছু হ'ল না। দূরের মাদার গাছের ডালের ওপর বুঝি একটা কেন্নোর মতো পোকা একটুখানি উঁকি মেরেছিল। শোঁ ক'রে একটা শব্দ হ'ল ; তারপরেই দেখা গেল হুতুম উড়ে গেছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল, কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে স'রে পড়ল। হুতুমের মর্জির খবর সে বাখে।

‘তরঙ্গিয়া’র জঙ্গলে সত্যিই বড় গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে ? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সেকথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করেনি। বনের ঘুপ্সি অন্ধকারে ব'সে শলা-পরামর্শ চলে, শোনা যায় হা-হুতাশ, কিন্তু সব চুপি-চুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওৎ পেতে কে জানে ! কে জানে কোন্ ডালে চিতা আছে ঘুপ্টি মেরে।

এ-বছর ভয়ানক খরা। বারশিঙার জলা ছাড়া সবজায়গার জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ানো যায় কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখনও হয়নি। কেঁদো তখন বনে এসেছে, দু-দশটা মেরেছে আবার চ'লে গেছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়্বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর ক'দিন থাকা যায় ! তেষ্টায় পাগল হয়েই বুনো

মোষের মা কাকিনী গেছ্‌ল মরিয়া হ'য়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পেছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দান গেল ভেঙে।

সেই থেকে বনের কেউ আর ঘেঁষতে চায় না সেদিকে। 'তুন্' পাহাড়ে চিকারার দল ছট্‌ফট্ করছে, জলে নামতে সাহস হয় না। কল্‌জে ফেটেই ক'টা মরল। 'ঝাঁকাল' হরিণের নতুন লোমের জৌলুস নেই—সেই ফ্যাকাশে হলদেই দেখায়। মেটে কাল গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে 'গারি' নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে; গায়ের লোম গেছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল ব'সে। ঢুলানি নিচে দিয়ে যেতে যেতে ওপরে খস্‌খসে আওয়াজ শুনে চম্‌কে কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল। হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে—"না গো না, চিতা নয়, আমি হনু!"

হতাশভাবে ঢুলানি বললে—"আর চিতা হ'লেই বা কি! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড জুড়োয়। এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বললে—"অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে?"

ঢুলানি এ-কথায় সান্ত্বনা পায় না। বললে—"থাকবে ব'লেই ত মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে?"

হনু গম্ভীর হয়ে বললে—"আছে বৈ কি, কিন্তু উপায় করতে হবে!"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হয়ে বললে—"উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি?"

"সেদিন গেছ্‌লাম ত তাই হুতুমের কাছে। কিন্তু জানো ত ওদের চাল? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি ওপর দিকে চেয়েছিল এতক্ষণ, এবার বললে—"দুটো পাকা নোনা ফেলে দাও ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার ত ভুলেই গেছি।"

হনু ক'টা পাকা দেখে নোনা ফেলে দিয়ে বললে—"আচ্ছা, ঝোপে-ঝাড়ে ঘোরো, চন্দ্রচূড়ের দেখা পাও না, না-হয় কালকেউটের? ওদের ব'লে দেখলে বোধ হয় কাজ হয়; এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে চিবোতে ঢুলানি বললে— "পাগল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুব্‌লে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে

ডিমের ছা মাকে কাটে।

— ওরা ত আর মার দুধ খায় না।"

হনু মাথা নেড়ে বললে— "তা বটে। তা না হ'লে ওই বারশিঙার জন্যের বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তা ত দেবে না— তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। নাঃ, হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।" ঢুলানি গাছের গায়ে দু'বার শিঙ্‌ ঘ'সে চ'লে যেতে যেতে বললে— "কি হয় না-হয় খবরটা দিও।"

হনু এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে ব'সে বললে— "সন্ধ্যাবেলা 'থলায়' গেলেই পাব ত?"

ঢুলানি বিষণ্ণভাবে বললে— "থলায় কি আর কেউ যায়? সে-আমোদের দিন গেছে। খবর দিও 'তুন' পাহাড়ের তলায়..."

ঢুলানি আরও কিছু হয়তো বলতো; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল কাছেই কেঁদোর কাসি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিলে ছুট্‌। হনু দুটো ডাল আরও ওপরে উঠে বসেছে ততক্ষণে।

ক'দিন বাদে আবার হুতুমের সঙ্গে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে, আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভালোরকমই হয়েছে মনে হ'ল। দু'চোখ বুঁজিয়ে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসেছিল।

আগের রাত্রে নতুন শিঙের চামড়া ঘ'সে তোলবার সময় 'কাল শিঙে' চিতার হাতে মারা গেছে। হনু সেই খবরটা 'তুন' পাহাড়ে চিতারার দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল, হঠাৎ গাছের কোটর থেকে 'হুম' শুনে চম্‌কে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বললে— "এই যে দাদা! ক'দিন ধ'রে তোমাকে বাদাম খোঁজা করছি।"

হুতুমের মেজাজটা আজ ভালো, বললে— "কেন হে?"

"কেন, আবার বলতে হবে? তোমার মতো বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু'পেয়ে থাকতে এ-বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও। দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাৎলাও।"

হুতুম বললে— "হুম, বলব'খন।"

হনু অস্থির হয়ে উঠেছিল ; বললে— "না, বলব'খন নয়, এখনই। তোমার দেখা ত' আর তপিস্যে করলেও মেলে না, এখন যখন পেয়েছি আর ছাডছি নে।"

হুতুম বললে— "হুম বলছি, উপায় ত' বলতে পারি, কিন্তু লাভ কি?"

"কি যে বলো হুতুমদা, লাভ কি? এই নখ-চোরা দুটো মরলে আর আমাদের ভাবনা কি?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে— "আর ভাবনা থাকবে না ত?"

"নিশ্চয়ই না।"

হুতুম বললে— "হুম, তবে শোনো। বাবশিঙাব জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে যে দু'পেয়েদের গাঁ —চিনিস?"

হনু বললে— "খুব চিনি, আমার ভাই খাটো ল্যাজকে সেখানেই ত' ধ'রে বেখেছে।"

হুতুম বললে— "হুম! সে গাঁ থেকে দু'পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হয়ে বললে— "বাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বললে— "হুম, আসবে রে, আসবে। 'তুন' পাহাডেব রাঙা নুড়ি দেখেছিস্, ভোরবেলাব সূর্যিব মতো লাল। সেই নুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে ত অবাক। বললে— "সে নুড়ি ত' চেখে দেখেছি, না যায় দাঁতে ভাঙা, না আছে কোন রস। সেই নুড়ি নিয়ে কি হবে দু'পেয়ের?"

হুতুম একটু চটে' উঠে বললে— "তুই দু'পেয়ের হালচাল কি জানিস্?"

হনু অগত্যা চুপ করল। হুতুম আবার বললে— "কসাড বনের ধাবে গারো-বাদাব পাশে দু'পেয়েরা আসে বেত কাটতে, তাদেব সেই নুড়ি দেখাতে হবে।"

"কেমন ক'রে দেখাব?"

"কেমন ক'রে আবার দেখাবি! বেত-বনে নুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা; এদিকে ওদিকে আর কিছু ছড়াস্। দু'পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হয়ে বললে— "তা না-হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কি হবে? কেঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে?"

হুতুম গম্ভীর হয়ে বললে— "সে-ভাবনা তোর কেন? যা বললাম কর্ আগে, তারপর ব'সে ব'সে দেখ্ কি হয়। অতই যদি বুঝবি তাহ'লে গায়ে পালক গজাবে যে!"

হাজার হ'লেও হুতুম জ্ঞানীগুণী লোক। এ ঠাট্টা নীরবে হজম ক'রে হনু বললে— "তবে কুড়ুই গে নুড়ি, কেমন? ঠিক বলছ ত' হুতুমদা, এতেই হবে?"

হুতুম শুধু বললে— "হুম।"

□ □ □

তারপর ক'বছর কেটে গেছে। 'তরঙ্গিযা'র জঙ্গলের আর সে-চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হ'য়ে গেছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। 'তুন' পাহাড়ের ওপরে আর নিচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু'পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খান্ খান্ করে। গোটা পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে।

হনুর আজকাল ভারী বিপদ। বন্ধুবান্ধব কেউ আর বড় 'তরঙ্গিযা'য় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোনরকমে সে প'ড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদাম গাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গেছে ক'মে, দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড় কম দেখে। হনু 'দাদা' ব'লে ডাক দিতে প্রথমটা ত' চিনতেই পারল না।

তারপর মিটমিট ক'রে খানিক ঠাউরে বললে— "কে হনু নাকি? আছিস কেমন?"

হনু ম্লানভাবে বললে— "আছি আর কেমন দাদা।"

হুতুম আবার চোখ বুঁজবার উপক্রম করছিল, হনু বললে— "তরঙ্গিয়া'র জঙ্গলের কি হাল হয়েছে দেখেছ ত' দাদা!"

হুতুম একটু অবাক হযে বললে— "কেন, কেঁদো আর চিতা ত অনেকদিন মারা পড়েছে! সেই খরার বছরেই না?"

"তা ত' পড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও যে লোপাট হয়ে গেলুম। সারাদিন ঘুমোও, খোঁজ ত' আর কিছুর রাখো না? 'তুন' পাহাড়ের চিতারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু'পেয়ের যে বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে তাতেই

চিতারার দফা-রফা। গাউজ'দের যে ক'টা বাকি ছিল কোন্ বনে যে গেছে কোন পাত্তা নেই। ঝাঁকাল দু'একটা আছে এখনও, কিন্তু আর বেশি দিন নয়, বাজ-লাঠিতে গেল ব'লে। বুড়ো মযাল পর্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে। দিনরাত গুড়ুম গুড়ুম, দিনরাত খটাখট। এ-গাছ পড়ছে, ও-গাছ পড়ছে। দু'দণ্ড ত' আর স্বস্তি নেই।"

হুতুম বললে— "হুম।"

"তোমাব কথায় নুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা ত' ভালোই হ'ল। আজ দু'জন, কাল চাবজন, দু'পেয়েরা ক্রমে ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল 'তরঙ্গিয়া'য। তারা কেঁদোকে মাবল বাজ-লাঠিতে, চিতাকে ধবল ফাঁদে। আমরা ত' একেবারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা, তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? 'দুন' পাহাড়ে তাবা যেদিন বাসা বাঁধল তারপর থেকেই আমাদেব হ'ল সর্বনাশ! কেঁদো আর চিতা তবু একটা-দুটোব বেশি মাবত না, এদেব হাতে দলকে দল সাবাড়।"

হুতুম গম্ভীর মুখে বললে— "হুম।"

"ভালো করতে গিযে এ কি হ'ল বলো ত?" হনু কাঁদো-কাঁদো হযে বললে— "তরঙ্গিয়া'ব এ-দশা ত চোখে দেখা যায না।"

হুতুম চোখ বুজে প্রশান্তভাবে বললে— "যা হবার ঠিক তাই হয়েছে, চোখ বুঁজে থাকতে শেখ, কিছু দেখতে হবে না!"

সত্যই এ-কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে-দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নাই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীন্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তাহা নয়, এই দুইটি জীবনের গভীব মর্ম বুঝিবার মতো দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়। হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আব কতটুকু! নিজেকে ছাড়াইয়া আশপাশের কয়েকজনকে বিলাইতেই ত' তাহা ফুরাইয়া যায। আর উদারতা? এই শব্দটিকে এ পর্যন্ত কত ভাবেই না লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছি!

তবু একবার বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখি—

বিশ্রী বাদলেব রাত। সারাদিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায় নাই, ঝুপ্ ঝুপ্ কবিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছে, গভীর রাত্রেও তাহার বিবাম নাই। কয়দিনে এ-বৃষ্টি থামিবে কে জানে।

শহরের এক প্রান্তের যে-রাস্তাটিতে আমাদের গল্প সুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায। গোরুর গাড়ি ও মোটরলরির চাকায় তাহার যে হাল হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। দিনরাত্রেব অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাহার আরও শ্রী ফিরিয়াছে, পাশের নর্দমার সহিত তাহাকে আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রাস্তাটির নাম না-ই বলিলাম— দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপ্‌রিগুলি তাহার শোভা-বর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।

গভীর বাদলের রাতে রাস্তাটি একেবারে নির্জন হইয়া আসিয়াছে। আলোর ব্যবস্থা কোনকালেই ভালো নয। যেটুকু ছিল বৃষ্টিতে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণধ্বনিমুখর অন্ধকারে দেখা যায়, রাস্তার ধারে একটি চালার সামনে স্তিমিতভাবে অত গভীর রাত্রেও কেরাসিনের ডিবিয়া জ্বলিতেছে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরাসিনের ধূমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিম্বা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোন অর্থই আর নাই। প্রত্যহের অভ্যাসবশতঃই ক্লান্ত হতাশ চোখে পথের দিকে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সে বসিয়া আছে।

কেরাসিনের ডিবিয়ার মৃদু আলোয় তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না। হাত দিয়া শিখাটিকে আড়াল করিবার দরুন তাহার মুখে ও দেহে গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।

ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কে একবার বলিল, "হ্যাঁ লা রজনী, বার-দরজা বন্ধ করতে হবে না! সমস্ত রাত ব'সে থাকবি না কি? এ-বৃষ্টিতে যে পথে কুকুর-বেড়াল বেরোয় না!"

দরজা হইতে রজনী কর্কশকণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় যে উত্তর দিল অন্য সময় হইলে তাহা হইতেই একটা তুমুল ঝগড়ার সূত্রপাত হইতে পারিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাগুলা বলা হইয়াছিল নিদ্রার ঘোরে সে বোধ হয় ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। আগামীকল্যের জন্য মুখরোচক কলহটি সে মুলতুবি রাখিল এমনও হইতে পারে।

গায়ের কাপড়টা আরও একটু ভালো করিয়া জড়াইয়া রজনী দরজাতেই তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। কাপড়-চোপড় তাহার ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানটায় পা রাখিয়াছিল সেখানেই কাদা হইয়াছে প্রচুর। পা দুইটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গিয়াছে মনে হইতেছিল। তবু ইহার মধ্যে রজনীর উঠিলে চলে না। হয়তো এই দুর্যোগের রাত্রেও মাতাল হইয়া কেহ এ-পথে আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতে পারে! নেশার ঝোঁকে সে ত আর বাদবিচার করিবে না!

আরও ঘণ্টাখানেক এই ভাবেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ রজনী সচকিত

হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের রাস্তাটা যেধারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ভদ্র হইবার চেষ্টা করিয়াছে, খোলার চালা পরিত্যাগ করিয়া একটি-দুইটি কোঠা ও ভদ্রগৃহস্থ বাড়ি দুই পাশে পাইয়াছে, সেখান হইতে যেন কাদার ভিতর কাহার পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। পদশব্দ ক্রমশঃই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নাঃ, কোন মাতালের পায়ের শব্দ এ নয়। কাদার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

রজনী নিরাশ হইল। জলবৃষ্টির ভিতর দিয়া কেহ যে উর্ধ্বশ্বাসে তাহার ঘরে আশ্রয় লইতে আসিতেছে না, ইহা ঠিক। একলা বসিয়া থাকিতে একটু বুঝি তাহার ভয়ও করিতেছিল। ভয় অবশ্য তাহার অমূলক, মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।

রজনী জোর করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর হইতে কৃষ্ণকায় একটি বিশাল মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্যের বিষয় রজনীর দরজার কাছে আসিয়াই সে থামিয়াছে। পিছন দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর রজনীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাহারই কাছে আসিয়া চাপা-গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, "চ, তোর ঘরে চ।"

রজনী সত্যই এই আকস্মিক সম্ভাষণে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটা সে কোন কথা বলিতেই পারিল না। স্থানুর মতো যেখানে বসিয়াছিল সেখানেই নিশ্চল হইয়া রহিল।

কিন্তু তাহার বাকস্ফূর্তি হইবার পূর্বেই লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ নিচু হইয়া ফুঁ দিয়া তাহার কেরাসিনের আলোটি নিভাইয়া দিয়া সে বলিল, "ঢঙ্ ক'রে তবু ব'সে আছে দেখ— কই তোর ঘর?"

এই অদ্ভুত ব্যবহারে ভীত হইয়া রজনী চিৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু লোকটা তাহার পূর্বেই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়াছে। রজনীর কণ্ঠ আর শোনা গেল না।

লোকটা চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ভয় নেই, চেঁচাস্ নি।"

রজনী ভীত ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটার হাত ঠেলিয়া দিবার একটু চেষ্টা করিল।

কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা। লোকটা অসুরের মতো শক্তিতে তাহার গলার কাছটা চাপিয়া ধরিয়া আছে, বেশি জোর জবরদস্তি করিলে বুঝি টিপিয়াই মারিবে।

অগত্যা বাধ্য হইয়াই সে চুপ করিল। লোকটা নিজেই উৎসাহী হইয়া টিনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার বলিল, "কি, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব সারারাত!"

রজনী সত্যই ভয় পাইয়াছিল, বলিল, "না, তুমি যাও!"

লোকটা অন্ধকারে রজনীর কণ্ঠ খুঁজিয়া লইয়া এক হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "দূর, কোথায় যাব এত রাতে!"···

আরও কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহিরে রাস্তায় কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লোকটার ভাব-ভঙ্গিও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই রজনীর মুখে হাত ঢাকা দিয়া তীক্ষ্ণ চাপা গলায় সে বলিল, "টুঁ শব্দটি করেছিস কি খুন ক'রে ফেলব।"

রজনী অবশ্য চেষ্টা করিলেও শব্দ করিতে পারিত না, লোকটা যে জোরে হাত চাপা দিয়াছে। বাহিরের পদশব্দ তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া বুঝি খানিক থামিল। কয়েকটা লোক কি যেন বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আবার পদশব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতেই লোকটা তাহার হাত তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "কেমন ভয় দেখিয়ে দিলাম, দেখলি?"

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠাট্টার নয় তাহা রজনী বুঝিয়াছিল। লোকটাকে মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিলেও সে মৃদুস্বরে একবার আপত্তি জানাইয়া বলিল, "আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যাও— আজ আমার শরীর খারাপ।"

লোকটা এবার জোরে হাসিয়া উঠিল, "হুঁ, শরীর ত বেজায় খারাপ, তাই বাদ্‌লা রাতে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলি— না? নে ছেনালি রাখ্। কোথায় তোর ঘর?"

নিরুপায় হইয়া রজনী বলিল, "দাও, টাকা দাও তাহ'লে আগে।"

অন্ধকারে তাহার হাতের মধ্যে সত্যই একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া লোকটা বলিল, "নে; হ'ল ত!"

রজনী এবার ধীরে ধীরে পাশের দাওয়ায় উঠিয়া তাহার ঘরের চাবি খুলিল। ঘর বলিলে তাহাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়; দুধারে দুই টিনের পার্টিশনের

মধ্যবর্তী খানিকটা অপরিসর স্থান মাত্র। মেঝেতে কোনওকালে বোধ হয় সিমেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। নোংরা একটি বিছানা ও একটি ভাঙা তোরঙ্গই অবশ্য অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে— মেঝের বাকি অংশ যেটুকু দেখা যায় তাহা বহুদিনের বহু মানুষের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

উপরে খোলার চাল। সেখানকার একটি বাঁশ হইতে তার দিয়া টাঙানো চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠনটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। রজনী ঘরে ঢুকিয়া তাহার আলোটাই একটু বাড়াইয়া দিল। তাহাতে আলোকের অভাব কিন্তু দূর হইল না। শিখাটি আরও বেশি ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল মাত্র।

মেঝের উপরকার ময়লা ছিন্ন বিছানায় একটা বালিশের উপর কনুই-এর ভর দিয়া লোকটা তখন বসিয়াছে।

রজনী তাহার দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি করলে বলো ত? জুতোটা বাইরে খুলে রেখে আসতে হয় না! সমস্ত ঘর যে কাদায় কাদা হয়ে গেল —এ মুক্তো করবে কে?"

সত্যই লোকটার ছেঁড়া জুতার সঙ্গে রাস্তার প্রচুর কাদা ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

ঘরে আসিয়া লোকটার চেহারা ও মেজাজ দুই-ই যেন বদলাইয়া গিয়াছে মনে হইল। রজনীর কথায় হাসিয়া জুতা-জোড়া পা হইতে খুলিতে খুলিতে সে বলিল, "ঈস্, কি আমার রাজপ্রাসাদ রে! জুতোর কাদায় নোংরা হয়ে যাচ্ছে!"

কথাগুলার পিছনে কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইল না। গলার স্বরে ও বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া রজনী বলিল, "তোমারই বা কি এমন সোনার খড়ম যে বিছানায় উঠতে চায়!"

ছেঁড়া জুতা দুইটা পা হইতে খুলিয়া উপুড় করিয়া ধরিতেই পোয়াখানেক ময়লা জল তাহা হইতে বাহির হইল। লোকটা হাসিয়া বলিল, "এমন জুতোর তুই নিন্দে করিস্! দেখেছিস্ এ ড্যাঙ্গায় হ'ল জুতো, আর জলে নামলেই নৌকো!"

ময়লা জলে ঘরটা আরও নোংরা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এবার রজনী রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

লোকটাকে এই সময়ের মধ্যে সে বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

বাহিরে তাহাকে যতখানি বিশালকায় মনে হইতেছিল ততখানি জবরদস্ত চেহারা তাহার নয়। মাঝারি দোহারা গড়ন। কেমন একটু পাকাইয়া গিয়াছে। হাত-পায়ের শিরগুলো দড়ির মতো মোটা মোটা। মুখখানা চোয়াড়ে হইলেও কেমন যেন কুৎসিত নয়। চোখে ও ঠোঁটের কোণে সর্বদাই একটু হাসির ভাব লাগিয়া আছে— নির্দোষ ব্যঙ্গের হাসি। সমস্ত মুখখানা বুঝি সেইজন্যই একেবারে আকর্ষণ শক্তি হারায় নাই। বয়স অবশ্য তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। রজনীর মনে হইল ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে কোন বয়স তাহার হইতে পারে। কিন্তু বয়স যাহাই হউক লোকটার স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট আছে।

লোকটা তাহার ভিজা জামা খুলিতেছিল, বলিল, "শুক্‌নো একটা কাপড় থাকে ত দে— পরি।"

"শুক্‌নো কাপড় কাঁদছে! থাকলে আমি এই ভিজে কাপড়ে থাকি!" —বলিয়া রজনী হাসিল।

"ওই ভিজে কাপড়ে থাকবি নাকি সারারাত?" লোকটা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

"তা ছাড়া কি করব?"

লোকটা "হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিছানার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা কি জিনিস পড়িয়াছিল। রজনী হঠাৎ সেইদিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ওতে কি আছে দেখি!"

এই সামান্য ব্যাপারে লোকটা এমন চটিয়া যাইবে কে জানিত। নিমেষের মধ্যে পুঁটুলিটাকে রজনীর নাগালের বাহিরে সরাইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "খবরদার বলছি, ওধারে হাত বাড়ালে হাত ভেঙে দেব।"

খর্‌খর্‌ করিয়া রজনী জবাব দিল, "ঈস্‌, কি আমার সাতরাজার ধন নিয়ে এসেছিস, ছুঁলে ক্ষয়ে যাবে!"

লোকটা এ-কথার উত্তর দিল না। পুঁটুলিটা নোংরা একটা বালিশের তলায় রাখিয়া তাহার উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কথায়-বার্তায় এতক্ষণ তাহাদের পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ বিরোধের ভাব যেটুকু কাটিয়া গিয়াছিল সেটুকু আবার এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। এই লোকটাকে শেষমুহূর্তে পয়সার লোভে ও পীড়নের ভয়ে ঘরে স্থান দেওয়ার

জন্য এখন রজনীর আফশোষ হইতেছিল। সে ত তখন ইচ্ছা করিলে চেঁচাইয়া বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিতেও পারিত। লোকটা কিছু এক মুহূর্তেই তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত না। এই উগ্র প্রকৃতির অপরিচিত লোকটার সহিত সারারাত একত্র কাটাইবার চিন্তায় রজনীর ভয় করিতে লাগিল। লোকটা খুনে-ডাকাত কি না কে জানে! সারারাত সে জাগিয়া কাটাইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। ঘরের দরজায় ভিতর হইতে চাবি দিয়া চাবিটি গোপনে আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া আলো নিভাইয়া যখন সে শুইয়া পড়িল তখন রাত প্রায় দুইটা।

অনেক রাত পর্যন্ত সে জোর করিয়া জাগিয়াছিল। কিন্তু ভোরের দিকে শরীরে আর সহিল না। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার মনে নাই।

সকালে সচকিত হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে রজনী টের পাইল বাড়িতে বিষম হট্টগোল বাধিয়াছে। বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীরা তাহার রাত্রের অতিথির কথা জানে না। কয়েকজন তাহার ঘরে ঢুকিয়া তীব্রস্বরে ভর্ৎসনাও করিতে স্বরু করিয়াছে।

"হ্যাঁ লা, তোর আক্কেল কি বল্ দেখি! সদর-দরজা হাট ক'রে, নিজের দরজা খুলে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস্!"

রজনী ধড়মড় করিয়া এবার বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই ঘরে কেহ কোথাও নাই। দরজা সত্যই খোলা!

কে আরেকজন বলিল, "আমরা সবাই ত বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছি, যদি সব চুরিই হয়ে যেত!"

কিন্তু চুরি যা হইবার রজনীরই হইয়াছে। তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া যে দরজার তালা খুলিয়াছে টাকাটি লইতে সে ভোলে নাই। রজনীর সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অশ্রুর উৎস একেবারে শুকাইয়া না গেলে সে বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিত। কিন্তু তবু কাহাকেও সে কিছু বলিল না। এই নিদারুণ প্রবঞ্চনার কথা কাহাকেও বলিয়া সে হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না।

তাহাদের রাস্তারই এক গৃহস্থবাড়িতে গতরাত্রে সিঁধ কাটিবার চেষ্টা কাহারা করিয়াছিল বলিয়া দুপুর বেলা যখন সংবাদ পাওয়া গেল তখনও মনের সন্দেহ সে মনেই চাপিয়া রাখিল।

বিশাল পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত, এমনি স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।

এই মিলনই একাধারে প্রথম ও শেষ হইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ।

দুপুর বেলা। রজনীর তখনও রান্নার আয়োজন চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া শিলে করিয়া সে বাট্‌না বাটিতেছিল, হঠাৎ দরজার সামনে একজনকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।

লোকটা দিব্য ভোল ফিরাইয়া আসিয়াছে। ফরসা কাপড়, গায়ের জামাটাও বোধ হয় নূতন। তালিমারা জুতাটায় আর কিছু না হউক বেশ করিয়া কালি মাখাইয়া চকচকে করা হইয়াছে। মাথার ঝাঁকড়া চুলের মাঝখান দিয়া লম্বা টেরি-কাটা।

তবু রজনী চিনিল। লোকটা দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। রজনী মুখ তুলিতেই কাছে আসিয়া বলিল, "কি গো চিনতে পারো?"

ঘৃণায় রাগে সহসা রজনীর সমস্ত শরীর রী রী করিয়া উঠিল। জীবনের উপর, ভাগ্যের উপর যত আক্রোশ তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়াছিল সমস্ত যেন আজ মিলিত হইয়া পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোন জবাব না দিয়া উন্মত্তের মতো নোড়াটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

নোড়াটা লাগিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় উপযুক্ত সময়ে লোকটা মাথাটা সরাইয়া লইয়াছিল। নোড়াটা প্রচণ্ড শব্দে সামনের টিনের দেওয়ালে গিয়া লাগিল।

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা শব্দ শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। লোকটা তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

নোড়ার আঘাতটা ফস্কাইয়া যাওয়ায় মনে মনে আশ্বস্ত হইলেও রজনীর রাগ তখনও যায় নাই। চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া সে জানাইতে লাগিল যে এই বদমায়েস লোকটাই সেদিন তাহাদের রাস্তার গৃহস্থ-বাড়িতে সিঁদ কাটিয়াছে এবং তাহার আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিয়া পুলিসে দেওয়া হউক।

চিৎকার শুনিয়া বাড়ির সমস্ত মেয়েরা এবং কয়েকটি পুরুষ তখন জড়ো

হইয়াছে। লোকটা এমন কাণ্ড হইবে বোধ হয় আশা করে নাই। মুখে হাসির ভান করিলেও সে এবার পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

কিন্তু এতগুলা লোক তাহাকে একা পাইয়াছে। রজনীর কথা বিশ্বাস হউক আর না হউক তাহারা এমন মজা ছাড়িবে কেন? একজন হঠাৎ সাহস করিয়া তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "শালা চোর, আবার ভদ্রলোক সেজে এসেছ!" আর যায় কোথায়! অন্য সকলে বোধ হয় এই প্রেরণাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। সকলে মিলিয়া লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল, চড়, লাথি যে যাহা পারিল মারিতে কসুর করিল না। লোকটা জোয়ান, কিছুক্ষণ সে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মারও সে সেইজন্যই বেশি খাইল। তাহার জামাকাপড় ছিঁড়িয়া আধমরা না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ কেহ নিরস্ত হইল না। বোধ হয় হাঙ্গামের ভয়েই শুধু পুলিসে দিতে তাহারা বাকি রাখিল।

রজনী মারামারিতে যথাসম্ভব যোগ দিয়াছে। এখন দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাল পাড়িতেছিল, "আঁচল থেকে টাকা খুলে নেবে না, পাজী বদ্‌মাস কোথাকার!"

বাড়ির বাহিরেও তখন পথিকদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। অতিরঞ্জিত হইয়া ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মুখে মুখে ফিরিতেছে। নানাজনে নানারকম মন্তব্যও করিতেছিল।

লোকটা তখন অবসন্নভাবে উঠানের উপর পড়িয়া। গায়ের মাথার অনেক জায়গা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। কাতরভাবে সে ধুঁকিতেছিল।

কে একজন বাহির হইতে খবর দিল যে মারামারির সংবাদ শুনিয়া পুলিস আসিতেছে।

আরেকজন বলিল, "পুলিস এলে ত যারা মেরেছে তাদেরও ছাড়বে না বাপু! চোরকে ধরিয়ে দিতে পারো, মারবার তোমরা কে? আর মার ব'লে মার! লোকটা ত মরে গেছে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, যুক্তিযুক্তও বটে। যাহারা এতক্ষণ সোৎসাহে হাত চালাইয়াছিল তাহারা যে যার সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

জনমতের গতি ফিরিয়াছে। একজন বলিল, "চোর ব'লে যে মারলে, চোর চিনলে কে শুনি? চোর কি ওর গায়ে লেখা আছে!"

বাহির হইতে একজন আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "তুমিও ত আচ্ছা লোক হে, মার খেয়ে চুপ ক'রে পড়ে আছ! থানায় চলো একটা ডায়েরি ক'রে আসি, মারার মজাটা সব টের পেয়ে যাবে!"

উঠিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই বোধ হয় লোকটা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যাহারা মারিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই পুলিসের ভয়ে রাগটা তখন রজনীর উপর গিয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতর হাঙ্গামা হইবার ভয়ে বাড়ির অধিস্বামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর কাছে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "দোষ ত এই মাগীর। 'চোর' 'চোর' ব'লে পাড়া মাথায় ক'রে তুললে কে? এখন ঠেলা সামলাক্।"

রজনীর গালাগাল খানিক আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটার এই পরিণতি দেখিয়া ভয়ে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু'একজন প্রহৃত লোকটাকে তখনও থানায় গিয়া ডায়েরি করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

বাড়িওয়ালী আবার তীব্রস্বরে বলিল, "ঢঙ্ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়! লোকটা ওইখানেই প'ড়ে থাকবে নাকি? থানা পুলিস না হ'লে সুখ হচ্ছে না, —না!"

কেন বলা যায় না, প্রহৃত হইয়াও থানায় যাইবার আগ্রহ লোকটার বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালীর ধমক্ খাইয়া ভয়বিহ্বল রজনী তাহাকে আসিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে সে নিজেই কষ্ট করিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে রজনীর কাঁধে ভর দিয়া তারই ঘরে গেল।

থানায় খবর দিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল তাহারা ইহাতে খুশি হইতে পারিল না। বাহিরের দরজার কাছে ঘোঁট অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

লোকটা কোনপ্রকার হাঙ্গামা না করিয়া রজনীর ঘরে যাওয়ায় বাড়িওয়ালী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রজনীর ঘরে ঢুকিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু মূল্যবান্ সদুপদেশ দিয়া যখন সে বিদায় হইল তখনও রজনী জল দিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলি ধোয়াইয়া দিতেছে।

বাড়িওয়ালী চলিয়া যাইবার পর লোকটা একবার উঠিবার চেষ্টা করিল।

ভীত পাংশুমুখে তাহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিয়া রজনী বলিল, "উঠছ কেন? কোথায় যাবে?"

যন্ত্রণাবিকৃত মুখেও হাসির চেষ্টা করিয়া লোকটা বলিল, "থানায় যাব নারে, যাব না। ভয় নেই! পেটটায় বড় বেদনা, বেটারা বড় জোর লাথি মেরেছে, একটু সেঁক দিতে পারিস?"

রজনী তাহার আয়োজনেই বাহিরে গেল।

নায়ক নায়িকার দ্বিতীয় মিলন এমনি করিয়াই হইল।

লোকটা কয়দিন ধরিয়া রজনীর ঘরেই আছে। মার খাইবার দিন হইতে তাহার প্রবল জ্বর। যাইবে সে আর কোথায়? রজনীকে বাধ্য হইয়াই সেবা করিতে হইতেছে। ব্যাপাটার সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বাড়ির আর সকলে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘরে বসাইয়া একটা লোকের দিনের পর দিন শুশ্রূষা করা রজনীর সাধ্য নয়। প্রথম দিন লোকটা পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই কোনমতে চলিতেছে। রজনী এ-দায় হইতে কোনরকমে নিষ্কৃতি পাইলেই বোধ হয় বাঁচে। পুলিসের ভয়েই সম্ভবতঃ সে এ পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করিতে পারে নাই।

কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সারিবার কোন লক্ষণ নাই! রজনীর ধৈয আর কতদিন থাকে! সকালে ঘায়ের পটি খুলিতে খুলিতে সে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিয়াছে, "ভিট্‌কেলমি ক'রে ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকা হবে শুনি? আমি আর পারব না, তা যা হয় হোক।"

'যা হয় হোক'টা পুলিসের ব্যাপার সম্বন্ধে। রজনীর সে-ভয় এখনও বুঝি একটু আছে।

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "পারবি নে কি? এতগুলো কর্‌করে টাকা কি মাগ্‌না দিলাম!"

"ঈস্‌, কত তোড়া তোড়া টাকাই না দিয়েছিলি! আট দিন ধ'রে ওষুধ পথ্যি সব পাঁচ টাকায় হচ্ছে— কেমন?"

"নাই বা হ'ল। তুই দিবি টাকা। হাতে হাতকড়া থেকে বেঁচে গেছিস জানিস!"

রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, "হ্যাঁ হাতে হাতকড়া সবাই দিচ্ছে! যা না তুই পুলিসে। আমিও বলতে জানি, সিঁদ-কাঠি নিয়ে প্রথম দিন ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই?"

লোকটা রাগিয়া বলে, "তুই দেখেছিস্?"

"দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে ত ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু?"

লোকটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "বুঝিছিস্ ত বুঝিছিস্? অঘোর দাস কারুকে ভয় করে না।"

নীরবে খানিকক্ষণ ঘা ধোয়ানো চলে। অঘোর এক সময় বলে, "জ্বরে জ্বরে মুখটা বড় খারাপ হয়েছে। আজ একটু অম্বল রাঁধতে পারিস?"

রজনী ঝঙ্কার দিয়া বলে, "হ্যাঁ পারি না, উনুনের ছাই রাঁধতে পারি! সখ কত! ঘায়ে পুঁজ শুকোচ্ছে না, অম্বল খাবে!"

অঘোর সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও এ-আশ্রয় পরিত্যাগ করে নাই। দিনে রাত্রে রজনীর সঙ্গে রোজ তাহার ঝগড়া বাধে। রজনী গালাগাল দিয়া বলে, "কাল যদি তুই বাড়ি থেকে দূর না হ'স ত মুড়ো ঝাঁটা মারব।"

অঘোর প্রচণ্ড শপথ করিয়া জানায় যে পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে রজনীর আর মুখদর্শন করিবে না। কিন্তু যাই-যাই করিয়া যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। ছন্নছাড়া জীবনে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যের দ্বারা চিরদিন বুঝি সে বিতাড়িত হইয়াই ফিরিয়াছে। একটুখানি নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্থান তাহার কখনও মিলে নাই। তাই যাইতে তাহার সহজে মন ওঠে না। রজনী অন্য সময়ে গাল পাড়িলেও সকালবেলা ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার কথাটা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়।

অঘোর একেবারে অবুঝ নয়। ইতিমধ্যে একদিন বাহির হইয়া সে কয়েকটা টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রজনীর হাতে দিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফরমাস যাহা করিয়াছে তাহার বহর বড় কম নয়।

রজনী টাকা কয়টা রাগের মাথায় মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছে, "আমার টাকার দরকার নেই, অমন টাকা আমি ঢের দেখেছি। আমি কি তোর কেনা বাঁদি যে যা হুকুম করবি তাই করব!"

টাকা ফেলিয়া দেওয়ায় প্রথমটা মুখ গম্ভীর করিয়া অঘোর বলিয়াছে, “দেখ্, লোক আমি বড় ভালো নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভালো হবে না।”

কিন্তু খানিক বাদে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, “আহা, রাগ করিস্ কেন? তুই রাঁধিস্ ভালো তাই না বলছি। সাধ ক'রে কি এখানে প'ড়ে থাকি? তোর রান্না খাওয়ার পর মুখে আর কিছু রোচে না।”

“থাক, আর আদিখ্যেতায় দরকার নেই।”—বলিয়া রজনী শেষ পর্যন্ত নিজেই টাকাগুলা তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়াও বেশিদিন চলিল না। একদিন টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়াই অত্যন্ত কুৎসিতভাবে ঝগড়া করিবার পর অঘোর সত্যই সকালবেলা চলিয়া গেল।

বাড়িওয়ালী সংবাদ পাইয়া রজনীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, “কি ব'লে যেতে দিলি তুই, তবু ত খরচটা চালাচ্ছিল!”

রজনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, “খরচ চালাচ্ছিল না আর কিছু! খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল। আপদ গেছে বেঁচেছি!”

তাহার পর আপন মনেই বলিল, “এবার এলে দরজা থেকেই খ্যাংরা মেরে বিদায় ক'রে দেব।”

কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে তাহাদের দরজার কড়া নড়িয়া ওঠামাত্র ধড়্ফড় করিয়া উঠিয়া প্রথম দরজা খুলিতে যে গেল সে রজনী। অত রাত পর্যন্ত অকারণে কেন সে জাগিয়াছিল কে জানে!

সত্যই অঘোর ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত। জামায় কাপড়ে ধূলি কাদা লাগিয়াছে। কপালের উপরে পূর্বের যে ক্ষতটার দাগ এখনও মিলায় নাই তাহা হইতেই আবার রক্ত বাহির হইতেছে।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি হয়েছে?”

“ও কিছু না!”—বলিয়া পকেট হইতে অঘোর যাহা বাহির করিল তাহা দেখিয়া রজনীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এত টাকা একসঙ্গে সে কবেই বা দেখিয়াছে!

অঘোর হাত বাড়াইয়া তাহাকেই সেগুলা দিতে যাইতেছিল। রজনী সভয়ে হাতটাকে সরাইয়া বলিল, "না, না, ও চাই না।"

তাহার মনের সন্দেহ দৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় তাহার বাড়িয়াছে। অঘোর হাসিয়া বলিল, "কেন রে, হ'ল কি ?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে রজনী বলিল, "সত্যি বল্ দেখি, তুই চুরি করেছিস কি না !"

অঘোর তাহার দিকে তাকাইয়া মুচ্ কিয়া একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। রজনী আবার বলিল, "বল্ আমার গা ছুঁয়ে।"

"যদি ক'রেই থাকি।"

"যদি ক'রেই থাকি ! ধরা পড়লে কি হ'ত ?"

"কি আর হ'ত —জেল। আর বেশি কিছু ত নয়। সে আমার অভ্যেস আছে।"

রজনী সভয়ে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পালাতে গিয়েই কপালটা কেটেছে ত ?"

কপালের রক্তটা কাপড় দিয়া মুছিয়া অঘোর বলিল, "বেটারা ঢিল ছুঁড়ল যে !"

রজনী হতাশভাবে বলিল, "অমনি ক'রেই তুই কোন্ দিন ম'রে যাবি !"

"তা গেলেই বা কা'র কি ? অঘোর দাসের জন্যে তিনকুলে কাঁদবার কেউ নেই।"

রজনী তখন কোন কথা আর বলিল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে বিছানায় শুইয়া হঠাৎ অঘোরের গলায় হাত রাখিয়া রজনী বলিল, "একটা কথা বলব, রাখবি বল্ !"

নিদ্রাজড়িতস্বরে অঘোর বলিল, "কি ?"

"তুই আর চুরি করতে পাবি নি !"

ঘুমের ঘোরে 'আচ্ছা' বলিয়া অঘোর পাশ ফিরিয়া শুইল।

রজনী কিন্তু তাহাকে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে দিল না, হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ও রকম 'আচ্ছা' বললে হবে না, তুই দিব্যি ক'রে বল্, 'কখনও আর চুরি করব না' !"

কাঁচা ঘুম ভাঙায় অঘোর চটিয়া গিয়াছিল, বলিল, "তবে কি ডাকাতি ক'রে খাবো ?"

"না, তুই একটা কাজকর্ম দেখ্।"

"কাজকর্ম দেবে কে ? তুই বাজে বকিস নি, ঘুমোতে দে।"

কিন্তু রজনী ছাড়িল না। আবার তাহার হাত ঝাঁকানি দিয়া একটু কঠিনস্বরে বলিল, "না তোকে চুরি ছাড়তেই হবে, না হ'লে এখানে আর আসতে পারি না।"

"ও, তবেই ত আমার গোকুল অন্ধকার হয়ে যাবে।"—বলিয়া অঘোর আবার পাশ ফিরিল। কিন্তু এবারে খানিক বাদে প্রথম কথা সেই কহিল, বলিল, "কাজকর্ম পাওয়া কি এতই সোজা রে। আর তা ছাড়া দলের লোকেরা ছাড়বে কেন ? যদি বা একটা ভালো কাজ পাই, পুলিস আর দলের লোকেরা পেছু লেগে অস্থির ক'রে দেবে না ?"

"দল তুই ছেড়ে দিবি।"

"এদেশে থাকতে আর তার জো নেই।"

রজনী ইহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে তুই এদেশ ছেড়ে চ'লে যা।"

অন্ধকারের মধ্যে অঘোরের হাস্যধ্বনি শোনা গেল। বলিল, "তুই যাবি সঙ্গে ?"

রজনী সত্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যাব কি ক'রে ?"

দু'জনেই তাহার পর নীরব। অঘোর একবার খানিক বাদে রজনীকে ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমোলি নাকি ?"

"না।"

"তুই যেতে পারবি না কেন ?"

রজনী হতাশস্বরে বলিল, "আমার এখানে কত দেনা, বাড়িওয়ালীর কাছে, কিস্তিদারের কাছে, যেতে চাইলে তারা ছাড়বে কেন ?"

হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া অঘোর বলিল, "আমি যদি সব দেনা শোধ ক'রে দিই !"

কিন্তু রজনীর এ-কথায় বিশ্বাস নাই। বলিল, "সে অনেক টাকা। তুই পারবি কেন ?"

"হুঁ, অঘোর দাস ইচ্ছে করলে কি না পারে! তুই বল্ তাহ'লে যাবি আমার সঙ্গে? তাহ'লে তোকে সত্যি কথাটা বলি, এ-কাজে মাঝে মাঝে মাইরি ঘেন্না ধ'রে যায়। খালি সাবধান, খালি সাবধান, শুয়ে ব'সে একটু স্বস্তি নেই। চ, একেবারে দিল্লী আগ্রাই যাব চ'লে।"

রজনী কিন্তু তাহার উৎসাহে বাধা দিয়া বলিল, "তুই কি ক'রে টাকা যোগাড় করবি? এমনি চুরি ক'রে ত? সে আমার দরকার নেই।"

হাত বাড়াইয়া রজনীকে অন্ধকারে কাছে টানিয়া অঘোর বলিল, "এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি এই শেষ বার। ব্যস্, তারপর চুরিবিদ্যেয় খতম্।"

পরদিন বিকাল বেলা অঘোর নতুন একটা প্রকাণ্ড তোরঙ্গ ঘাড়ে করিয়া আনিয়া রজনীর ঘরে ঢুকিল।

রজনী বিস্ময়ে আনন্দে হাসিয়া বলিল, "ওমা, বাক্স আনতে বলেছিলাম ব'লে ওই অতবড় একটা ঢাউস জিনিস আনতে হয়? ওর ভেতর শুবি নাকি?"

অঘোর মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে তোরঙ্গের তালা খুলিয়া ফেলিল। ভেতরের জিনিসপত্র দেখিয়া রজনী ত অবাক। অঘোর কাপড়-জামা হইতে থালা গেলাস পর্যন্ত কত জিনিসই না কিনিয়া আনিয়াছে! রজনী পরিহাস করিয়া বলিল, "ঈস্ করেছিস কি? এত সাজসরঞ্জাম কেন বল্ ত?"

"বিয়ে করতে যাচ্ছি যে!"

"মরণ আর কি! আধবুড়ো এমন চোয়াড়ের কাছে মেয়ে দেবে কে?" —বলিয়া রজনী হাসিতে লাগিল।

অঘোর গম্ভীর হইয়া বলিল, "না দেয়, চুরি ক'রে নেব।" রজনীর হাসি তাহার পর আর থামিতে চাহে না।

গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান্ নরনারীদের জীবন-লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়!

ভাবী-সংসার সম্বন্ধে দুইজনের ইতিমধ্যে অনেক মধুর আলাপ হইয়া গিয়াছে।

রজনী বলিয়াছে, "যাচ্ছি বটে তোর সঙ্গে, কিন্তু সেখানে যা-খুশি করবি

আর আমি মুখ বুঁজে তাই সইব মনে করিস্ নি যেন। রজনী তেমন মেয়ে নয়। অত নেশাভাঙ্ করা তোর চলবে না।"

অঘোর বলিয়াছে, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু আমিও লোক বড় ভালো নয়, বুঝেছিস্। এখানে যা করিস্ করিস্, সেখানে একটু বেচাল দেখলে আর আস্ত রাখব না।"

সেই রাত্রে অঘোর আবার বাহির হইল। আর কুড়িটা টাকা হইলেই রজনীর ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া তাহাদের সব খরচ কুলাইয়া যায়। অঘোর তাহাদের বিদেশ যাওয়ার উপকরণস্বরূপ অকারণে অনেকগুলা বাজে জিনিস কিনিযা পয়সা নষ্ট করিযা আসিয়াছে। রজনী সেইগুলাই বেচিয়া টাকা যোগাড় করিবার কথা বলিয়াছিল। অঘোরের আর নিজেকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। কিন্তু অঘোর সে-কথায় হাসিয়াছে মাত্র। বলিয়াছে, "অঘোর দাস জিনিস বিলিয়ে দেয়, বেচে না, বুঝেছিস্? তুই বাঁধা-ছাদা ক'রে সব ঠিক হয়ে ব'সে থাক্ দিকি, কাল ভোরেব গাড়িতেই কলকাতাকে কলা দেখিযে চ'লে যাব!"

□ □ □

আদালতে কাজের চাপ সেদিন অত্যন্ত বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার কোনমতে পূজার ঠাট্টুকু বজায় রাখিয়া বলির পর বলি শেষ করিয়া চলিতেছে। ছোটখাটো অপরাধের বিচার— রায় দিতে বিলম্ব হইবারও কারণ নাই। অনেকগুলি অপরাধীর বিচার হইয়া যাইবার পর একজন আসামী হঠাৎ কাঠগড়ায় উঠিয়া বিষম গোলমাল সুরু করিয়া দিল। বুড়ো মদ্দ— ছাড়া পাইবার জন্য তাহার মিনতি ও শিশুর মতো কান্না দেখিয়া আদালতের লোকের পক্ষে হাসি সম্বরণ করা কঠিন।

বিচারক নামটা ভালো শুনিতে পান নাই। জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার গড় গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, আসামীর নাম অঘোর দাস, লোকটা দাগী চোর, ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে এবং সেদিন আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি।

আসামী তখন কাঠগড়া হইতে দুই হাত জড়ো করিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল— হুজুর, ধর্মাবতার তাহাকে যেন এইবারটি মাফ করেন।

সে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যই আর সে এমন কাজ করিবে না। সত্যই সে এ-পথ ছাড়িয়া দিতে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার তাহাকে ধমক্ দিলেন, পুলিসপ্রহরী একটা রুলের গুঁতা দিল, কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, চোখের জল মুছিতে মুছিতে একই কথা সে বার বার বলিতে লাগিল।

লোকটার কান্না একটু অসাধারণ হইলেও এই ধরনের বদমায়েসির সহিত বিচারকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের বক্তব্য শেষ হইবার পর তিনি রায় দিলেন। ইন্‌স্পেক্টার তাহা অনুবাদ করিয়া অঘোর দাসকে জানাইল। পাঁচ বৎসর তাহার জেল হইয়াছে।

অঘোর দাস খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাব পর সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা একেবারে অদ্ভুত। দেখা গেল, হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুঙ্কার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।

পুলিসপ্রহরী ও কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সেই মুহূর্তে তৎপর হইয়া তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে কি কেলেঙ্কারি যে হইত কে জানে! তারপর তাহারা তাহাকে পিছমোড়া করিয়া ধরিয়া রুলের গুঁতা দিয়া আবার কাঠগডায় আনিয়া ফেলিল। সে উন্মত্তের মতো তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে তখনও গর্জাইতেছে।

বিচারক বয়সে নবীন এবং সত্যই ভালো লোক। তাঁহার হৃদয় মন এখনও কঠিন হইয়া উঠে নাই। বিচার জিনিসটা এখনও তাঁহার কাছে শুষ্ক আইনের প্রয়োগকৌশল মাত্র নয়। আসামীর পিছনে রক্তমাংসের মানুষ আছে ইহা এখনও তাঁহার স্মরণ থাকে।

লোকটার অস্বাভাবিক কান্নার পর এই প্রকার আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল লোকটার এই অদ্ভুত ব্যবহারের গূঢ় কোন অর্থ থাকিতেও পারে।

বিচারককে আক্রমণের অপরাধে আসামীর নূতন করিয়া বিচার হইল। বিচারক মহাশয় এবারে শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করিয়া ত দিলেনই, মনে মনে

সঙ্কল্প করিলেন তাহার সম্বন্ধে কর্মচারীকে দিয়া ভালো করিয়া পরে খোজ লইবেন।

. . . . . .

বিচারকমহাশয় অবশ্য নানা কাজের চাপে সেকথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বা দোষ কি! অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনও নিশ্চয় কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরাসিনের ডিবিযার ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিযার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী একরাত্রের অতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।

কাঠা আষ্টেক পুকুর-ভরাট জমি!

—তারই ইতিহাস!

ভরাট হ'য়ে প'ড়ে আছে প্রায় বছর পাঁচ ধ'রে, এখনো মাটি ভালো ক'রে বসেনি। বর্ষার জলে জলময় হ'য়ে যায়— আশপাশের গৃহস্থপল্লী হ'তে শিশুরা নৌকা ভাসাতে ও অপেক্ষাকৃত দুরন্ত হ'লে মাতামাতি করতে আসে। বাঘ্‌ভেরেণ্ডা, কুক্‌সিমে, ছাগলবঁটি ইত্যাদি ছোট গাছের ঝোপে ইতিমধ্যেই ছেয়ে গেছে। জল না থাকলে সারাদিন গোচারণের মাঠরূপে ব্যবহৃত হয় ও বিকালে ছেলেদের খেলার জমিতে পরিণত হয়।

এমনি ক'রেই দিন যাচ্ছিল, এমন সময়— খবরের কাগজের কোন্ কোণে কি বিজ্ঞাপন বেরুল ও জমিটুকুর ভাগ্যবিধাতাদের ইচ্ছায় সাদা কাগজের ওপর ক'টা কালির আঁচড়ে তার নিত্য নিয়মিত জীবনধারা আবার নতুন পথে প্রবাহিত হ'ল।

রাস্তার পাশে ঝক্‌ঝকে দীর্ঘদেহ মোটর এসে নিঃশব্দে থামে, শীর্ণদেহ অকালবৃদ্ধ মাড়োয়ারি মালিক, কণ্ট্রাক্টার সঙ্গে ক'বে ভালো ক'রে সমস্ত তদারক ক'রে যায়।

স্থির হয় পাকা মোকাম এখন এ নরম জমিতে করা নিরাপদ নয়। কিন্তু জমিটা ফেলে রাখলে ত' টাকাটা ব'সে থাকে!

যে কাঠের বোর্ডটায় বড় বড় সাদা অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা ছিল— প্লট নং ১১৩ —সেটা একদিন তুলে নিয়ে গেল। তার জায়গায় আরেকটা কাঠের বোর্ড পোঁতা হ'ল— "সেন অ্যাণ্ড সেন, বিল্ডারস্ অ্যাণ্ড কণ্ট্রাক্টারস্" —মাটির দোতলা ব্যারাক তৈরি সুরু হ'ল।

কণ্ট্রাক্টার এই পরামর্শই দিয়েছিল।

"বেশ ত, একটা temporary mud barrack তৈরি ক'রে দিন, এক একটা ঘর আলাদাভাবে বেশ ভাড়া দেওয়া যাবে! এখন demandই

হ'চ্ছে তাই! কুলি মজুর these poor people, এরা আশ্রয় পাচ্ছে না, এদের— this will be a boon to them; তারপর মাটি বসলে যখন হোক ভেঙে দিলেই চলবে। ততদিন বা জমিটা ব'সে থাকে কেন?"

'মাড্‌ব্যারাক' তৈরি হ'ল। উপরে ও নিচে সাতাশখানা ঘর। ব্যারাকের পেছনের জমিতে পায়খানা ও কল চৌবাচ্চা। দোতলার সামনে বারান্দা দেওয়া; একতলার সামনে খানিকটা সিমেণ্ট-দেওয়া রক। সব ঘর নম্বর দেওয়া, নিচের দক্ষিণ দিকের প্রথম ঘর থেকে গুন্‌তি আরম্ভ। নিচে ঘর সর্বসমেত চোদ্দটি, উপরে তের। নিচের ও ওপরের ব্যারাকের প্রান্তস্থ ঘর-চারটিতেই দু'টি ক'রে জানালা। আর কোন ঘরেই সে-সব হাঙ্গামা নেই; একেবারে পুবমুখো একটি ক'রে দরজা ও গোরুর চোখের সঙ্গে তুলনায় লজ্জা না পায় এমনই এক-একটি পশ্চিমমুখো গবাক্ষ। ঘরগুলির দেওয়াল করোগেট টিনের আর চাল খোলার।

মালিকের হোম্‌রা-চোম্‌রা এক খোট্টা দরোয়ান এসে প্রথম দক্ষিণের পয়লা নম্বর ঘরটি অধিকার করলে। শাস্ত্রসম্মত দরোয়ানের সমস্ত লক্ষণগুলিই তার ছিল, কেবল চুম্‌রাবার গোঁফজোড়া বাদে। এবং অলক্ষণের মধ্যে ছিল পিঠের বাঁ পাজরার নিচেই এক প্রকাণ্ড টিউমার। তার রূপো-বাঁধানো মোটা বাঁশের লাঠি ছিল, বাজখাঁই গলার আওয়াজ ছিল, ভাঙ ও গাঁজার নেশা ছিল, লম্বাচওড়া বুলি ছিল, বাঙালির অসারতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল ও তার নামের পেছনে একটা সিং ছিল। ব্যারাক তদারক করবার ও ভাড়া দেবার বন্দোবস্তের ভার ছিল তার ওপরই।

দোতলার পোনেরো নম্বর ঘরের সামনের বারান্দায় একদিন দেখা গেল এক অতিজীর্ণ পুরাতন বহু বর্ণের কাঁথা শুকোচ্ছে দুপুর বেলায়। তালির অত্যাচারে আদিম জমির কোন অস্তিত্বই নেই। বর্ণবৈচিত্র্যেরও কারণ ঐ বিভিন্ন তালির বিভিন্ন বর্ণের কাপড়। দূর থেকে দেখলে সেটিকে কোন সার্কাসের ক্লাউনের পরিচ্ছদ ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। কাঁথার স্বত্বাধিকারীকে দেখলে অবশ্য ক্লাউন ব'লে ভ্রম হবে না।

প্রথম যেদিন লোকটি আসে, হনুমান সিং তখন ভাঙ্‌ ঘুঁট্‌ছিল। সামনের দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে সে বলল, "হিঁয়া ভিখ্‌ নেহিঁ মিলেগা।"

ভিক্ষা ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে যে আগন্তুক লোকটি আসতে পারে

তার আকৃতি ও বেশভূষা দেখে তা' কল্পনা করা কঠিন বটে। চেহারাটা লম্বায় চওড়ায় বেশ অসাধারণ, কিন্তু যেমন অপরিষ্কার তেমনি কুৎসিত। মাথাটা আকারে প্রকাণ্ড, তেমনি চওড়া কপাল, কিন্তু নাকটি থ্যাবড়া— একমাত্র পাতিহাসের ঠোঁটের সঙ্গে তার তুলনা করা চলতে পারে। সমস্ত মুখে এতটুকু সুকোমল চামড়া নেই, যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্রান্তরের মতো কোন বীভৎস ব্যাধির অত্যাচারের চিহ্নেই বুঝি ক্ষতবিক্ষত! মাথার চুল সামান্য কিন্তু ধুলায় তেলে জট-পাকানো। তেমনি মোটা অপরিষ্কার দাড়িগোঁফের জঙ্গল সারা মুখে— ক্ষৌরকারের সঙ্গে তাদের পরিচয় কখনও হয়েছে কিনা গবেষণার বিষয়। গায়ে ওই কাঁথা এবং পরনে মান্ধাতার আমলে গেরুয়া রঙে ছোপানো এবং এখন বর্ণাতীত বর্ণের তালি-গৌরবে প্রায় কাঁথার মতোই সমৃদ্ধ, চটের মতো মোটা কাপড়ের থান— সেটি লুঙ্গির ধরনে পরা।

এই বস্ত্র এবং হাতের একটি পিতলের ঘটি ছাড়া আর কোন অস্থাবর সম্পত্তির কোন চিহ্ন কোথাও ছিল না। সুতরাং তাকে ভিক্ষুক ব'লে ঠাওরাবার জন্য হনুমান সিং-এর কল্পনাশক্তিকে বাহবা দেওয়া যায় না।

আপাতপ্রতীয়মান ভিক্ষুক মাথাটা শুধু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললে অবিচলিত স্বরে, "ভাড়া মিলেগা?"

হনুমান সিং ব্যাঙের মতো উবু হ'য়ে ব'সে শিলের ওপর নোড়া ঘস্‌ছিল; ঘসা থামিয়ে সেই অশোভন অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে ঘাড় অতিকষ্টে তুলে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে আগন্তুকের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললে— "ক্যা?" —এক্ষেত্রে নিজের কর্ণকে অবিশ্বাস করা যেতে পারে।

লোকটি তেমনিভাবে সাম্‌নে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললে, "ভাড়া মিলেগা?" —এবার একটু অধিক উচ্চস্বরে।

তার শ্রবণশক্তির ওপর এই কটাক্ষ হনুমান সিং-এর বোধগম্য হ'ল কিনা বলা যায় না। সে খানিক নির্বাক থেকে বললে, "কৌন্‌ ভাড়া লেগা? —তুম্‌?"

লোকটি মাথা নেড়ে জানালে— "হাঁ।"

"এক্‌ এক্‌ কামরাকে ভাড়া দশ রূপেয়া!" —ব'লে হনুমান সিং নিশ্চিন্ত মনে ঘাড় নামিয়ে আবার শিল-নোড়ায় মনোযোগ দিলে— যেন আগন্তুকের দুঃসাহস ও দুরাশার এই যথেষ্ট ভৎর্সনা।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, "আভি দেনে হোগা?"

আবার ঘর্ষণ শব্দ থামল। "যো রোজ ভাড়া লেগা ওহি রোজ দেনা পড়েগা!"

"তব লেও।" কাঁথার ভেতর থেকে লোমশ সুপুষ্ট পেশীবহুল বাঁ হাতটা বেরিয়ে এল। এবার হনুমান সিং উঠে দাঁড়াল। সন্দিগ্ধভাবে নোটটা হাতে নিয়ে বললে, "আজসে রহোগে?"

"তবে কি ভাড়াটা তোমার শ্রীমুখের দর্শনি দিলুম বাপু?"

হনুমান সিং ভালো বুঝতে না পেরে বললে, "দর্‌শনি কাহে বোল্‌তা?"

"ও অম্‌নি বোলতা বাপু, এখন শোনো, দোতলার ওই দক্ষিণের শেষ ঘরটায় এখনও কেউ ভাড়া আসেনি, —ওইটে আমি নেব, বুঝেছ?"

"হাঁ হাঁ বুঝেছে, বুঝেবে না কেনো, হাম্ কি বেকুব আছে? লেকিন্ থোরা ঠাহ্‌রো!"

হনুমান সিং ঘরের ভিতর থেকে একটি লম্বা খাতা বা'র ক'রে নিয়ে এল, তারপর পেন্সিলটা মুখে পুরে সরস করবার জন্য একবার লেহন করে বললে, "তুম্‌রা নাম কেয়া বাংলাও।"

"নাম! নাম কি হবে?"

"লিখা হোবে, আবার কি হোবে! বাংলাও জল্‌দি।"

"এই ত মুস্কিলে ফেললে বাপু, দশ বছর ত' আর কেউ নাম জিজ্ঞেস করেনি, সে কি আর মনে আছে ছাই!"

হনুমান সিং চটে' উঠে বললে, "ঈ কা তামাসা হোতা?"

"বামঃ। তামাসা করবার কি এই সময়! তোমার নামটি কি শুনি দরোয়ানজি?"

"হাম্‌রা নাম কাহে পুছ্‌তা! হামারা নাম হনুমান সিং হ্যায়! আভি তুম্‌রা নাম বাংলাও।"

"আমার নাম লেখ রামচন্দ্র।"

লিখতে গিয়ে হঠাৎ সচেতন হ'য়ে চটে' উঠে দরোয়ানজি বললে, "ঝুট্ বাত্!"

"না ভাই নাম ভাঁড়িয়ে কিছু লাভ আছে কি—তুমি লেখ না, কোন ভয় নেই।"

হনুমান সিং তিনবার পেন্সিল চুষে দু'বার মাথা চুল্‌কে অবশেষে লিখতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু এই চোট্টার নাম রামচন্দ্রই বা কেমন ক'রে লেখা যায়!

অবশেষে মাথায় এক বুদ্ধি জোগালো, লিখলে— "কৌশল্যাকি—" পেন্সিলের দুর্বল শিষ ওইখানে পৌঁছেই গেল ভেঙে। বাকিটুকু হনুমান কোনদিন শেষ করেছিল কিনা জানা যায় নি।

পোনেরো নম্বর ভর্তি হ'ল।

বেশভূষা একান্ত কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও পোনেরো নম্বরের এই অধিবাসীটির কার্যকলাপে রহস্যের নামগন্ধ ছিল না। তথাকথিত রামচন্দ্র কাপড়কাচা সাবানের ফেরি করে। সন্দিগ্ধ হ'য়ে হনুমান সিং কয়েকদিন লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করলে। আবিষ্কার করলে শুধু এইটুকু যে কৌশল্যা-নন্দনের বাঁধাবাড়ার কোন বালাই নেই। ভোর না হ'তে সাবানের থ'লে কাঁধে ক'রে সে বেরিয়ে যায়, দুপুরে ফিরে আসে। আবার বেরিয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে এসে সে ঘরের দরজা দেয়। রাত্রে কোন কোনদিন মোটেই আসে না, কিন্তু সে কদাচিৎ।

অর্থাৎ এই ঝুটা রামচন্দ্রকে চোট্টা ব'লে হাজতে দেবার না হোক, ব্যারাক থেকে বা'র ক'রে দেবার একটি অতিপ্রবল অহৈতুক বাসনা মনে জাগ্রত হ'লেও তার বিরুদ্ধে নালিশ করবার কিছু না পেয়ে হনুমান সিংকে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

হনুমান সিং-এর গোপন বিদ্বেষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রামচন্দ্র কিন্তু দেখা হ'লেই একান্ত প্রীতিতে দিনের মধ্যে দশবার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রে বলে, "তবিয়ৎ আচ্ছা, হনুমান্‌জি?"

মনে মনে তার মুণ্ডপাত ক'রে হনুমান সিং গম্ভীরভাবে বলে, "হুঁ।"

"তোমার সুই আছে হনুমান্‌জি? কাঁথাটা একটু সেলাই করব।"

"উ সাতাইশ লম্বর মে দেখো!"

সাতাশ নম্বর ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছে।

সাতাশ নম্বরের কাছ দিয়েই নিচে নামবার সিঁড়ি। নামতে-উঠতে সর্বদাই চোখে পড়ে দুটো উলঙ্গ জীর্ণদেহ ছেলে অত্যন্ত অপরিষ্কার অবস্থায় পথ জুড়ে সিঁড়ির ওপর ব'সে ব'সে পরস্পরের সঙ্গে ক্রন্দনের পাল্লা দিচ্ছে। একটি বামনাকার অত্যন্ত স্থূলকায় মসী-কৃষ্ণবর্ণের লোক একটি পাঁচ হাত কাপড় কোনরকমে কোমরে জড়িয়ে বারান্দায় ব'সে থাকে এবং ভেতরের কোন গোপনচারিণীর উদ্দেশে ক্ষণে ক্ষণে সুমধুর কবিতা রচনা করে।

"হুঁ, কাজ হ'চ্ছে! গুষ্টির শ্রাদ্ধ হচ্ছে! চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চট্‌কানো হচ্ছে — গেলা হবে। ছেলে দুটোকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে দিলে রাক্ষুসী!"

অথবা—"শহরে কলেরা আছে, বসন্ত আছে, প্লেগ আছে, নিমোনিয়া আছে, কালাজ্বর আছে, ক্ষয় কাস আছে, এখানে একটা নেই রে! এই মাগীটা আর ছেলে দুটোকে কোন রোগে ধরে না রে।"

ঘরের দরজার ছেঁড়া চটের পর্দার ওপার থেকে প্রতি শ্লোকের সমাপ্তিতে শুধু একটি সাদর সম্বোধন আসে নিয়মিত ভাবে তীক্ষ্ণ কাঁসা-গলায়, "ঘাটের মড়া!"

ছেলে দুটো ভীষণদর্শন লোকটির আবির্ভাবে ক্ষণেকের জন্য কান্না থামিয়ে সভয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। পোনেরো নম্বর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের ছুঁচটা একটু দিতে পারেন? আমারটা সেলাই করতে গিয়ে ভেঙে গেল।"

স্থূলকায় লোকটি ক্ষুদ্রকায় দুটি হস্তি-চক্ষু নিমীলিত ক'রে শ্লোক রচনায় নিবিষ্ট ছিল বোধ হয়। চম্‌কে উঠে চোখ খুলে বললে, "এ্যাঃ—ছুঁচ!" তারপর খানিক পোনেরো নম্বরের আপাদমস্তক পর্যালোচনা ক'রে বললে—"ওই পোনেরো নম্বরে থাকা হয়, না? কিসের ব্যবসা? দেখে ত' মনে হচ্ছে—গলা কাটার। না, না, ছুঁচ-টুঁচ হবে না!" তারপর পর্দার অপর প্রান্তের উদ্দেশে, "এ-হারামজাদীকে ত' ব'লে ব'লে পারলাম না! যত বলি, দামী কাপড়-চোপড়গুলো বাইরে শুকোতে দিও না, কোন্ দিন সর্বস্ব যাবে, তা এ ছোটলোকের বেটি শুন্‌বে!"

'ছোটলোকের বেটি' সমস্ত কথা শুনেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু পর্দার ওপার থেকে শুধু সেই প্রাচীন সম্বোধন অব্যর্থভাবে এল, "ঘাটের মড়া।"

দামী কাপড়-চোপড়ের মধ্যে বাইরের বারান্দার রেলিংয়ে শুকোচ্ছিল একটি ম'সে-ধরা বহুদিনের ব্যবহারে জ্যাল-জেলে আদ্দির পাঞ্জাবি, একটি সমবয়সী দিশি ধুতি ও একটি মোটা সুতোর শাড়ি। প্রথম দুটিতে হয়তো এই পরিবারের কোন আদিম যুগের সচ্ছলতার সাক্ষ্য ছিল।

সেই দামী কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রামচন্দ্র নীরবে আপনার ঘরের দিকে ফিরে গেল।

ছেলে দুটো আবার নির্ভয়ে কান্নার প্রতিযোগিতা সুরু করল।

সকালে ও সন্ধ্যার পর দোতলার বারান্দা দিয়ে যাতায়াত একপ্রকার অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। পাচ-পাঁচটা কয়লার তোলা উনুন বারান্দায় ধরাবার

জন্য তখন বা'র ক'রে দেওয়া হয় এবং সেই পাঁচটি উনুনের মিলিত ধোঁয়া সমস্ত বারান্দাটি এমন ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে যে তার মধ্যে নিশ্বাস নেওয়া ত' দূরের কথা, দৃষ্টি পর্যন্ত চলা ভার!

দোতলার আর পাঁচটি ঘর ভাড়া হয়েছে!

রামচন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উঠে দম বন্ধ ক'রে বারান্দাটুকু দ্রুত বেগে পার হবার মতলব করছিল, কিন্তু এই ধোঁয়ার মাঝেও সাতাশ নম্বরের সামনে জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যদিন এই ধোঁয়া দেবার সময়টাতে যে যার দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে। আজ কিন্তু দেখা গেল, দোতলার ভাড়াটেদের আসতে কারুর বাকি নেই। এমন কি, নিচে থেকেও কয়েকজনের আগমন হয়েছে।

সাতাশ নম্বরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কাঁসা-গলার কান্না শোনা যাচ্ছিল। বাইরে উনিশ নম্বরের বুড়ো শশিশেখর বামনাকার স্থূলকায় লোকটির হাত ধ'রে বলছিল—"ও আর কিছু নয়, একেবারে খোদ ওলাবিবির দয়া হয়েছে মোহনবাবু। তবে ভয় নেই, যেমন-যেমনটি বল্লাম— করুন দেখি, চব্বিশ ঘণ্টায় আরাম হ'য়ে যাবে।"

বুড়ো শশিশেখরের মাথাটা যেন গলার ওপর ভালো ক'রে এঁটে বসবার সময় পায় নি, অত্যন্ত আল্‌গাভাবে রাখা আছে। সর্বদাই সে-মাথা ঘাড়ের ওপর নড়ছে ও দুলছে। ভয় হয় কখন্ টাল না সামলাতে পেরে হড়্‌কে প'ড়ে যায়! মাথা দোলাতে দোলাতেই শীর্ণ শির-ওঠা পাকানো হাতখানি দিয়ে পাশের একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকের ছেঁড়া ও ময়লা কোটের হাতটায় একটা টান দিয়ে শশি বললে, "আর কি দেখবে হে ভূতনাথ, চ'লে এস। ওদিকে যে ঘোড়ের কিস্তিতে দাবা ধরা পড়েছে হে!"

দাবা যার অমন বেঘোরে মারা যেতে বসেছিল, সেই হতভাগ্য লোকটি বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ছিল। নেহাৎ যন্ত্রচালিতের মতোই সে বোধ হয় এখানে এসে পড়েছিল— যে-ঘটনা এখানে এতগুলি লোককে আকৃষ্ট করেছিল তার সম্বন্ধে কোন কৌতূহলের আভাসমাত্রও তার দৃষ্টিতে ছিল না। এবং শুধু দৃষ্টিতে নয়, তার সমস্ত দেহে বেশভূষায় আচরণেও ওই এক অসীম প্রাণহীন অবসন্ন ঔদাসীন্য! কিছুতেই যেন তার কিছু আসে যায় না। এ ঔদাসীন্য বৈরাগ্য অবশ্য নয়। অনশন-জীর্ণ

মনের রক্তহীন পাণ্ডুরতা। তার সস্তা ছিটের পুরোনো কোটটিতে কবে কোন্ ফাল্গুন উৎসবে কোন নির্বোধ ছেলে রঙ দিয়েছিল তাকে রঙিন করতে। নিদারুণ পরিহাসের মতো সে-রঙ এখনো সমস্ত জামাটিতে লেগে আছে, তবে জামাটা পুরোনো ও ময়লা হওয়ার দরুন আজকাল যেন রক্তের মতো দেখায়। গায়ের মাপের চেয়ে বড় হওয়ায় আস্তিন দুটো সর্বদাই হাত ছাড়িয়ে ঝুলে থাকে; সেগুলো গুটিয়ে রাখবার উৎসাহটুকুও তার নেই। শুক্‌নো চড়ানো-গালের দু'পাশে, চিবুকে ও ঠোঁটের ওপরে যে সামান্য দাড়ি ও গোঁফের রেখা আছে, তার বর্ণ কি এক অস্বাভাবিক তামাটে গোছের। হাত-পা'গুলি বেঢপ্ ও অপরিপুষ্ট, খর্ব দেহের তুলনায় অত্যন্ত বেশি দীর্ঘ।

কোন নগণ্য প্রেসে সে নগণ্য কম্পোজিটারের কাজ করে সারাদিন। এবং সন্ধ্যার পর এসে আজকাল শশিবুড়োর পাল্লায় প'ড়ে বাজির পর বাজি দাবা খেলে, যতক্ষণ না শশি দাবা খেলার সমস্তরকম লাঞ্ছনায় তাকে লাঞ্ছিত ক'রে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে নিজে থেকে ছক্ উল্‌টে দেয়। দিনের পর দিন এমন ক'রে পরাজিত হ'য়েও এ পর্যন্ত খেলতে বসতে আপত্তি সে কখনও করেনি। নিয়মিত-ভাবে শশির আহ্বানে তার ঘরে গিয়ে বসেছে ও নিয়মিতভাবে তার উপহাস অপমান মাথা পেতে নিয়ে শশির ক্লান্তি না হওয়া পর্যন্ত খেলায় যোগ দিয়েছে।

আজ তেমনই যন্ত্রচালিতভাবে শশির আহ্বানে বিপদগ্রস্ত দাবার উদ্ধার চেষ্টায় সে গেল। কেন যে সে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সেখানে অত লোকের ভিড় হবার কারণই বা কি— সে-প্রশ্ন তার মনে উদয় পর্যন্ত হ'য়েছিল কি না সন্দেহের বিষয়।

বাইশ ও তেইশ নম্বরের মন্মথ পঁচিশ নম্বরের তারিণীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "অমন উজবুক কখনও দেখেচিস্? কিসের ভয়ে ও শশির হুকুমে অমন কুকুরের মতো ওঠে বসে জানি না!"

তারিণী উজবুকের উটের মতো চলবার ধরন খানিক লক্ষ্য ক'রে বললে, "দেশে নাকি ওর মাগ্ ছেলে আছে!"

মন্মথর অবস্থা ভালো— এক সঙ্গে যে ব্যারাকের দুটো ঘর ভাড়া নিতে পারে তার অবস্থা আর মন্দ কি ক'রে বলা যায়। সে ভেংচে বললে, "মাগ্ ছেলে না আরও কিছু! মাগ্ পুষতে পয়সা লাগেহে বাপু! ওসব উজবুকের কর্ম নয়!"

"আরে আমি যে ওর বৌয়ের চিঠি লুকিয়ে প'ড়েছি!"

প্রসঙ্গটা সময়োচিত হচ্ছে না দেখে মন্মথ তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "কিন্তু মোহনবাবু, ওই শশি চক্কোত্তিটি একটি আস্ত ঘুঘু! ওর একটি কথায়ও বিশ্বাস করবেন না। ছেলেটাকে একটা ভালো ডাক্তার-টাক্তার আনিয়ে দেখান, বুঝেছেন! বাবা কি ধোঁয়া! দম বন্ধ হ'য়ে গেল! আয় রে তারিণী—"

ভেতরে শিশুর কাৎরানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, তার সঙ্গে রমণী-কণ্ঠের মৃদু কান্নার রব।

মোহন দরজা থেকে ধমক দিয়ে বললে, "তবু গোঙায় মাগী! গোঙালে তোর ছেলে ভালো হবে?"

রামচন্দ্র একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কখন থেকে অসুখটা আরম্ভ হয়েছে?"

মোহনচাঁদ দরজা ধ'রে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইল, উত্তর দিলে না; শুধু একবার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে বুঝিয়ে দিলে অযাচিত সহানুভূতিতে তার কোন প্রয়োজন নেই।

নিচের দশ ও এগারো নম্বর ঘর দুটি ভাড়া নিয়ে যে হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষটি ভাজা ছোলা, ছাতু ইত্যাদির দোকান করেছে সে দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। এই মেয়েমানুষটি আসার পর প্রথম কিছুদিন তার বিষয় নিয়ে ব্যারাকময় খুব আন্দোলন চলেছিল এবং মন্মথ ও তারিণী প্রভৃতি কযেকজন তাকে উঠিয়ে না দিলে এ-ব্যারাক ছেড়ে দেবে এমন ঘোষণাও করেছিল। মেয়েমানুষটির যৌবন পার হয়ে গেলেও দেহের বাঁধুনি ছিল এবং রং কালো হ'লেও মুখে এমন একটি শ্রী ছিল যাকে বালকোচিত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—দেখলেই মনে হ'ত একটি বালককে যেন স্ত্রীলোকের পোষাকে সাজানো হয়েছে। পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে সে এগারো নম্বর ঘরে থাকে ও দশ নম্বরে তার 'ভুজা'র দোকান চালায়।

একদিন সকালে উঠে মন্মথ ব্যারাকময় ব'লে বেড়িয়েছিল— "আমি ত পাত্তাড়ি গুটোলেম বাবা! বদ্‌খেয়াল নেই বলব, এমন ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আমি নই, কিন্তু এই একচালে মাথা দিয়ে যার তার সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না।"

সবাই অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছে, "ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপারের কথা আর ক'য়ে কাজ কি ভাই! যত সব মেড়ুয়াবাদীর কাণ্ড হয়েছে! এখানে মানুষ থাকে! শুযোরের খোঁয়াড়!"

এমনি ক'রে বহুক্ষণ ধ'রে হেঁয়ালি গেয়ে ব্যাপারটাকে রহস্যাবৃত ক'রে সকলের কৌতূহল পুরোমাত্রায় উস্কে দিয়ে মন্মথ জানিয়েছিল যে ভুজার দোকানের ঘোমটার তলায় যে খেম্টা নাচ চলেছে— সেটি সে কাল স্বচক্ষে দেখেছে ও স্বকর্ণে শুনেছে ; সুতরাং তার পক্ষে বেবুশ্যের সঙ্গে একচালে মাথা দিয়ে থাকা অসম্ভব। হাজার হোক কায়স্থের ছেলে, তার ঠাকুরদার নাম করলে এখনও তিনটে গাঁয়ের লোক কোমর বাঁধে— সে কেমন ক'রে এমন অশুচি জায়গায় যার তার সঙ্গে থাকে বলো— ?

তারিণী বলেছে, "তাই ত ভাবি, একটা মন্দ রোজগেরে নেই, মাগী পাঁচ্-পাঁচটা ছানার আদার জোগায় কেমন ক'রে !"

বুড়ো শশি আল্গা মাথা দোলাতে দোলাতে বলেছে— "শুন্তে ভুল হ'ল যে হে ! শুধু পাঁচ নয়, সাড়ে পাঁচ !"

হাসি থামলে মন্মথ বলেছিল—"ঠিক সাড়ে পাঁচও নয়, পৌনে ছয় হ'তে চল্ল।" আবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেছ্ল।

মোহনচাঁদ বলেছিল— "সাড়ে পাঁচই হোক আর পৌনে ছয়ই হোক— এগুলি আমদানি হচ্ছে কেমন ক'রে ?"

'তবে আর বলছি কি—?" —ব'লে এইবার মন্মথ গত রাত্রের স্বকর্ণে-শোনা ও স্বচক্ষে-দেখা ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছিল।

প্রথমে এমনি ক'রে আন্দোলনটা খুব প্রবলভাবেই সুরু হয়েছিল। প্রতিবেশিনীর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কোনরকম মাথা ব্যথা না থাকলেও পাছে সেকথা স্বীকার করলে ঠাকুরদাদার নামে তিন গাঁয়ের লোককে কোমর বাঁধাবার শক্তি লোপ পায়, এই ভয়ে সবাই প্রথমে পাল্লা দিয়ে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশও করেছিল।

কিন্তু কি কারণে বলা যায় না— আন্দোলনটা আপনা হতেই ধীরে-ধীরে থেমে গেল। 'ভুজা'ওয়ালী নিরুপদ্রবেই তার ব্যবসা চালায় আজকাল।

শুধু সাত নম্বরে যে তিনটে এঁচোড়ে পাকা বকাটে ছোঁড়া সারাদিন কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে অ্যাপ্রেন্টিসি ক'রে রাত্রে কালিতে ঝুলে ভুত হয়ে ফিরে আসে, তারা মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে হাসাহাসি করে, "রোজার ঘাড়ে যদি ভূত চাপে ভাই—"

রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর সেই ভুজাওয়ালীই দিলে, "এই ত দুপুর বেলায়

আমার ছেলিয়ার সাথে খেলা করতেছিল— দু' ভাই। তারপর কখন চোলে গেছে আমি খেয়াল ভি কোরি নাই। আমি ত আখন শুনলাম।" ভুজাওয়ালী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে, "আমার একটি লেড়কি এমনি ক'রে মোরে গেল বাবু, নফ্‌রাকে আমি লিয়ে যাই ততক্ষণ। ছেলেমানুষের এ বেরামের ঘরে থেকে কাম নাই।"

মোহন দাঁত খিচিয়ে বললে, "থাক্! তুমি চট্‌পট্ স'রে পড় দিকি এখান থেকে! আদিখ্যেতা করতে তোমায় কেউ ডাকেনি। কোথায় ওঁর পাঁঠা-পাঁঠি মরেছে সেই খবর শোনাতে এসেছেন!"

'আদিখ্যেতা' ও 'পাঁঠা-পাঁঠি'র অর্থ ভুজাওয়ালী বোঝেনি বটে, কিন্তু দাঁত খিচুনিটুকু বুঝে সে বিমর্ষমুখে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

"ঘাটের মড়া, এক-কড়ার মুরোদ নেই, মুখ আছে আঁস্তাকুড়ের মতো!"

যে-ছেলেটি সুস্থ ছিল, তার হাত ধ'রে মোহনের স্ত্রী নিজেই এবার বেরিয়ে এসে ভুজাওয়ালীর দিকে ফিরে বললে, "তুমি নে যাও ত' গা বাছা। এই একরত্তি ঘরে আমি কোথায় যে কি করবো ভেবে কূল পাচ্ছি না। যতক্ষণ না ফকির ভালো হয়, ততক্ষণ তুমি তোমার কাছেই রেখো, বুঝেছ? তোমায় আমি শেষে কিছু বকশিশ ধ'রে দেব'খন।"

"আমায় কিছু দিতে হবে না মা। আমার বড় মোন কেমোন কোরতে লাগলো, তাই আপনিই এলাম।"

শীর্ণদেহ উলঙ্গ ছেলেটা ভীত কাতরচোখে প্রত্যেকের মুখের দিকে নির্বোধের মতো চাইছিল। তাকে কোলের কাছে টেনে ভুজাওয়ালী বললে, "আমরা গোয়ালা মা! আমাদের ঘরে খেলে কোন দোষ হবে না।"

মোহনচাঁদ এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, এইবার ব্যঙ্গের স্বরে বললে, "পরম সৎ-জাতের কাছে ছেলে রাখা হচ্ছে। মাগী সৎ-গোয়ালা— তবে ছেলেগুলো একটা হাড়ি, একটা মুচি, একটা মেথর— এই যা!"

ভুজাওয়ালী হেসে বললে, "না বাবু, হাড়ি-মুচি কেনো হ'তে যাবো, আমরা খাটি গোয়ালা।"

"হ্যাঁ! আমি জানি, তুমি গোয়ালা; তুমি নিয়ে যাও।"

ভেতরে ফকির আবার বমি করছিল। স্বামীর দিকে একবার নিরতিশয় ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তালগাছের মতো লম্বা, যক্ষ্মারোগীর মতো রক্তহীন

কঙ্কালসার রমণীটি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কোনকালে দেহের বর্ণ তার সুগৌরই ছিল, এখন তা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে এবং গাল ব'সে গিয়ে দু'পাশের হাড় দুটো অত্যন্ত ঠেলে উঠে মুখখানাকে একান্ত কুৎসিত ক'রে দিয়েছে।

সেই দুই ঠেলে-ওঠা হাড়ের ওপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু চিকচিক করছিল।

রামচন্দ্র পূর্বের অবজ্ঞা অবহেলা ক'রে আবার বললে, "দেখুন, আপনার ছেলেকে আমি একটু দেখতে পারি কি?"

"আমার ছেলে কি তামাসা করছে যে রাস্তার লোকের জন্যে আমি দরজা খুলে রেখেছি?"

রামচন্দ্র অবিচলিত স্বরে বললে, "আমি দু'একটা ওষুধপত্তর জানি, হয়তো আপনার ছেলের উপকারও হ'তে পারে।"

"ওসব জুচ্চুরি বিদ্যে এখানে চলবে না বাপু! আমি রেলের ওপার থেকে আসি নি।"

মোহনচাঁদ সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

কিন্তু রামচন্দ্র যাবার উদ্যোগ করবার আগেই শীর্ণকায়া রমণীটি দরজা খুলে পর্দার ভেতর থেকে মুখ বা'র ক'রে বললে, "আপনি ভেতরে আসুন।"

সন্ধ্যা হয়-হয়। দোতলার অধিবাসীরা সকলে এখনও এসে পৌছোয় নি। শুধু শশিবুড়ো তার লোহার তোলা-উনুনটায় আগুন দিচ্ছিল। শশি কোর্টে প্রকাশ্যে দলিল-পত্র নকলের কাজ করে এবং গোপনে কি একটা অমনি হুবহু নকল করবার ব্যবসাও চালিয়ে থাকে। কিছুদিন হ'ল লিখতে গেলে হাতটা একটু অতিরিক্ত কাঁপে ব'লে শেষের লাভজনক ব্যবসায় একটু ভাঁটা পড়েছে। কোর্টের কাজ আগে শেষ হয় ব'লে দোতলার বাসিন্দার মধ্যে শশিই সবার আগে এসে পৌছোয়।

উনুনে আগুন দিয়ে শশি ঘরে এসে ঢুকল, তারপর টিনের তোরঙ্গ থেকে বা'র ক'রে সন্দেহজনক পানীয় খানিকটা গলাধঃকরণ ক'রে দরজার শেকল তুলে দিয়ে নিচে নেমে গেল। ভুজাওয়ালীর দোকান খোলা পড়ে ছিল। ভুজা-ওয়ালী সেখানে ছিল না। কিন্তু সে-সব ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শশি দোকানের পেছনের পর্দাটা ঠেলে নিঃসঙ্কোচে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো; কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া তার হ'ল না। বাঁশ-বাঁকারি দিয়ে তৈরি যে নিচু মাচাটি খাটরূপে

ব্যবহার করা হয়, তার ওপর কে একটা লোক জানালার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। ভুজাওয়ালী সেই মাচারই অপর প্রান্তে ব'সে তার সঙ্গে সহাস্যমুখে আলাপ করছিল।

দোকানী হিসাবে ভুজাওয়ালীর কর্তব্যচ্যুতিতে হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললে, "এ কি রকম দোকান করা শুনি! খদ্দের এসে জিনিস কিনতে পায় না, দোকানী দোকান ছেড়ে ঘরে ব'সে থাকে?"

মাচার ওপর উপবিষ্ট লোকটা এবার মুখ ফেরালে। সে মন্মথ। ভুজা-ওয়ালী চমকিত হ'যে উঠে বললে, "কি লিবেন আপনি?"

তাব দিকে ক্রুদ্ধ বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দাঁত দাঁতে চেপে শশি বললে, "এই— এই— ছোলা ভাজা আছে?"

ঈষৎ হেসে কটু বিদ্রূপের স্বরে মন্মথ বললে, "দাও গো, ছোলা ভাজা দাও শশিদাকে! দাঁত পড়ে গেলে কি হয? দাদাব আমাব সখ আছে গো এখনও। মাড়ি নেড়েই ছোলাভাজা খাবাব বাসনা রাখে।"

এ-মন্তব্যের কোন উত্তব না দিযে শশি জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি যে এত সকালে এখানে মন্মথ?"

"ছোলাভাজা খেতে দাদা! তোমাব আমাব একই দশা!" মন্মথ উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

নীরবে ছোলাভাজার ঠোঙাটি হাতে নিযে মুখ অন্ধকাব ক'বে শশি ওপবে উঠে এল, তারপর সক্রোধে ঠোঙাটা ঘবেব এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিযে টিনের তোরঙ্গটা খুলে আব খানিকটা রঙিন পানীয় গলাধঃকবণ করলে।

দরজার সামনে দিয়ে তখন রামচন্দ্র নিজের ঘবে ফিরছিল। শশি ডাকলে, "ওহে শোন শোন, ওহে রামচন্দ্র! ক'দিন থেকেই তোমায় একটা কথা বলি-বলি ক'বেও স্থবিধে পাচ্ছি না।"

সাবানের থলি বগলে ক'রে বামচন্দ্র দবজায় এসে দাঁড়াল। শশি বললে, "বলি, ওষুধপত্র শিখলে কোথায় হে? তোমার পেটে এত বিদ্যে আছে তা ত' জানতাম না!"

"আজ্ঞে, ওযুধপত্র আর কি জানি!" —রামচন্দ্রের মুখে চোখে সেই চিরন্তন সকৌতুক ব্যঙ্গের ভাব।

"খুব জানো হে, আবার জানা কা'কে বলে! ধুকুড়ির ভেতর তোমার

অনেক কিছু আছে সন্দেহ হচ্ছে বাবা! মনে মনে ও মোহনের বেটার হিসেব ত' আমি চুকিয়েই দিয়েছিলাম। তাকে চাঙ্গা করলে বাবা; তুমি ওষুধপত্র জানো না! বলি, কোপ্‌নি-টোপ্‌নির সাথে ঘুরেছিলে দিনকতক, —না?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শশিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে রামচন্দ্র বললে, "কোপ্‌নি-টোপ্‌নি কিছু নয়, ও সামান্য অসুখ হয়েছিল, দুটো হোমিওপ্যাথিক বড়ি দিয়েছিলাম, তা'তেই সেরেছে। ওষুধপত্র আমি কিছু জানি না।"

"উঁহু, ওসব বুলিতে আমি ভুলছি না বাবা! গোড়াতেই তোমার ধোকড়া-ধুকড়ি দেখে আমার মনে হয়েছে এ লোকটা গুণী না হ'য়ে যায় না! তবে পয়সার চেষ্টায় সংসারে এসে পতিত হয়েছে হয়তো। তা হোক, আমার একটি উপকার তোমায় করতে হবে। ভেতরে এসে ব'স না, বলছি।"

রামচন্দ্র কি ভেবে ভেতরে গিয়ে বসলো। শশি বলছিল, "অনেক ঘুরেছি বাবা এই কোপ্‌নির পেছনে পেছনে, সেবাও ঢের করেছি; তবে ঠিক-মতো ওষুধ কারুর কাছে পেলাম না। কোথায় কি ত্রুটি হ'য়ে গেছ্‌ল হয়তো! তুমি সংসারে যখন ঢুকেছ তখন তোমার কাছে সে ভয় ত আর নেই! আমার এই কাজটি তোমার করতেই হবে।"

শশি হঠাৎ গলা নামিয়ে আর একটু কাছে স'রে এসে বললে, "এই হাতটির জন্যে এই দু'বছরে দু'হাজার টাকার দাঁও ফস্‌কে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই হাতখানিকে সোনা দিয়ে মুড়লেও এর উচিত কদর হয় না।"

শশি আবার থামল। মনে মনে সে কি একটা বিষয় তোলাপাড়া যে করছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খানিক বাদেই সে হঠাৎ রামচন্দ্রের হাতখানা ধ'রে ফেলে বললে, "ভুল আমি করিনি বাবা, অত কাঁচা ছেলে আমি নই, তুমি একজন গুণী লোক— এ আমি হলপ্‌ ক'রে বলতে পারি। তবে দিলাম বাবা তোমার হাতে জান্‌-প্রাণ সঁপে; এখন তোমার খুশি হয় রাখো, না হয় মারো!"

রামচন্দ্র নীরবে ব'সে রইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে না উঠলে কিন্তু দেখা যেত কোন অজ্ঞাত কারণে তার সমস্ত মুখ চোখ অসম্ভব রকমের হিংস্র কঠিন হ'য়ে উঠেছে।

শশি বলতে লাগল, "তোমাদের মতো সাধু সিদ্ধপুরুষদের যদি বিশ্বাস না করবো, তাহ'লে আর করবো কা'কে বলো? তোমরা হ'লে মানুষের ছদ্মবেশে

দেবতা···এই হাতখানি এককালে দিনকে রাত, রাতকে দিন ক'রে দিয়েছে! স্বয়ং বিধেতা-পুরুষকে নিজের লেখা চিনতে ঘোল খাওয়াতে পারতুম, কিন্তু তলে তলে কোন্ শত্তুর যে কি তুক্ করলো— এই দুটি বছর কলম ধরেছি কি কাঁপুনি সুরু হয়েছে! ···মনের দুঃখে হাত কামড়ে রক্ত বা'র ক'রে ফেলেছি··· জলের মতো যা-কিছু ব্যয় করেছি; সাধু সন্ন্যাসীর পেছনে ছায়ার মতো ঘুরেছি, কিছুতে কিছু হ'ল না বাবা! ···কি হালই হয়েছে দেখ না? হাতি— ঘাল হয়েছি ব'লে ওই বেটা নেড়ি কুত্তা মন্মথ আজ আমায় অপমান করে!···দাও বাবা এই হাতখানি আরাম ক'রে, দু'মাসে দু'হাজার টাকা তোমার পায়ে ঢেলে দেব। ···আমার মৃগী রোগ আছে বাবা, সে আমি সারাতে চাই না; মাথাটা আপনা থেকে নড়ে, তা ও যেমন নড়ে নড়ুক, এই হাতখানি তুমি ভালো ক'রে দাও বাবা, আর কিছু না। এ নরক-যন্ত্রণা আর সইতে পারি না! ···কোর্টে সামান্য কপি করার কাজটাই যে কি কেঁদে-ককিয়ে ক'রে আসি তা ভগবান জানেন।"

শশি থেমে হাঁপাতে লাগল। ঘরের অন্ধকার গাঢ়তর হ'য়ে এসেছিল। অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব রইল। পাশের ঘরে খুট্‌খাট্ আওয়াজ হচ্ছিল।

শশি ডাকলে, "ভূতনাথ এসেছ নাকি হে? শুনে যাও ত একবার!"

ভূতনাথ দরজায় এসে দাঁড়াতে শশি বললে, "আলোটা জ্বাল ত' হে ঘরের।"

ভূতনাথ দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনের লণ্ঠনটা জ্বালালে। শশি বললে, "মাথায় আবার একটা পট্টি বেঁধেছ কেন হে?"

মৃদুস্বরে ভূতনাথ জানালে, "জ্বরের সঙ্গে মাথার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

জ্বর তার খুব বেশিই হয়েছিল। চোখ দুটো জ্বরের তাড়সে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

"এ-বেলাটা উপোস দাও, বুঝেছ? এত মাথার যন্ত্রণায় দাবা খেলেও কাজ নেই। আর শোনো, আমার উনুনটা এতক্ষণে ধরে' গেছে, হাঁড়িটা চড়িয়ে দুটো ডালে-চালে লাগিয়ে দাও দিকি! বড় জরুরি কাজ আছে, এখন আর উঠতে পারছি না।"

ভূতনাথ হাঁড়ি ও চাল ডাল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শশি আর একবার ডেকে বললে, "দু'পয়সার ছোলাভাজা কিনেছিলাম, খাওয়া আর হয়নি। শুক্‌নো শুক্‌নো খেলে তোমার কোন দোষ হবে না— বুঝেছ? ঠোঙাটা নিয়ে যাও।

আর শুকনো লঙ্কা বোধ হয় নেই ; বাজার থেকে দু'পয়সার এনে নিও, ওই ছোলার পয়সা আর তাহ'লে দিতে হবে না ; বুঝেছ !"

এত কথা বুঝেও ভূতনাথের মুখে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারবাহী অসহায় পশুর মতো সে-মুখে শুধু অসীম অবসন্ন ঔদাসীন্যের অচঞ্চল ছায়া। সে ছোলাভাজার ঠোঙাটাও নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রামচন্দ্র এতক্ষণ বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল। এইবার মুখ ফিরিয়ে শশির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "তোমার নাম শশি নয়!"

চট্ ক'রে নিচু হয়ে রামচন্দ্রের পায়ে হাতটা বুলিয়ে নিয়ে শশি বললে, "এই ত বাবা ঠিক চিনেছি। তোমরা হ'লে ত্রিকালদর্শী, তোমাদের অগোচর কি আর কিছু আছে। জানোই ত বাবা নামটা কি রকম বিপদে প'ড়ে পাল্টাতে হয়েছে।"

রামচন্দ্র প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে শুধু ঠোঁট দুটি নেড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সে নিজে বিষ খায় নি ত ?"

একটা ফড়িঙ্ বাতির চারিধারে ঘুরে ঘুরে চিম্‌নির কাঁচে মাথা ঠুকে মরছিল। কিছুক্ষণ সেই সামান্য মাথা ঠোকার শব্দটুকু ছাড়া ঘরে আর কোন শব্দের লেশমাত্র রইল না।

শশির বহু রেখাঙ্কিত কুঞ্চিত শীর্ণ মুখের ওপর যেন ক্ষণিক সন্দেহের ছায়াপাত হ'ল। তারপর চোখ দুটি মিট্ মিট্ ক'রে দুটো হাতে রামচন্দ্রের পা দুটো ধ'রে সে ভীত চাপা-কণ্ঠে বললে, "অপরাধ নিও না বাবা। কুড়ি বছর তার ভয়ে সারারাত ভালো ক'রে ঘুমোতে পারি নি। আমার সেই থেকেই মৃগী-রোগের সূত্রপাত। স্বীকার করছি- বাবা, এই মাত্র একবার তোমায় অজান্তে সন্দেহ ক'রে ফেলেছি, এক সেকেণ্ডের জন্যে। সত্যি বাবা, পেছন থেকে দেখলে তার সঙ্গে তোমার চেহারায় কোন প্রভেদ নেই। দোষ নিও না বাবা! আর ও-সব কথা জিজ্ঞেস ক'রে কেন আর দগ্ধে মারো ? তুমি ত' সবই জানো।"

হঠাৎ সবেগে শশির হাত দুটো পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে রামচন্দ্র উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শশি পেছন পেছন উঠবার চেষ্টা ক'রে বললে, "আমার কি করলে বাবা তাহ'লে ?"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

শশি দরজায় খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কি ভেবে হঠাৎ

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় তাড়া দিলে। শুধু তাড়া দিয়ে সে সন্তুষ্ট হ'ল না, টিনের বড় ট্রাঙ্ক ও কাঠের বাক্সটাও দরজায় লাগিয়ে রাখলে এবং পেছনের জানালাটা বন্ধ ক'রে সমস্ত ছিট্‌কিনিগুলো লাগিয়ে দিলে।

রান্না হ'লে ভূতনাথ কয়েকবার এসে ডাকাডাকি ক'রেও কোন সাড়া শব্দ পেল না। অবশেষে একবার ভীত ও বিস্মিত হয়ে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে ভেতর থেকে শশি জানালে— তার হঠাৎ অসুখ করায় সে আজ আর কিছু খাবে না। ভূতনাথ যেন সব জিনিস বাইরেই রেখে দেয় এবং শশীকে আর বিরক্ত না করে।

ঘুম না হওয়া পর্যন্ত সে-রাত্রিতে হনুমান সিং উপরের ঝুটা রামচন্দ্রের অন্তত লাখো বার মনে মনে মুণ্ডপাত করেছে। একবাব তাকে সাবধান করবার জন্যে উপরে উঠতে গিয়েও তার লোমশ বাহু দুটির কথা স্মরণ ক'রেই সে কার্যটি আগামী সকালের জন্যে মুলতুবি রেখেছে। রামচন্দ্রের ঘর ঠিক হনুমান সিং-এর ঘরের ওপরে এবং মাঝেকার ছাদের ব্যবধানটুকুও অতি পাত্‌লা। সুতরাং একটা লোক অনবরত সেখানে সশব্দে সারারাত পায়চারি করলে নিচের লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

গভীর রাত্রে সমস্ত ব্যারাক যখন নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে রামচন্দ্র নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে শশির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলে। শশির ঘুম হয়নি। সে ভিতর থেকে ক্ষীণ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কে?"

রামচন্দ্র গম্ভীর স্বরে আদেশ করলে, "দরজা খোলো।" ভেতর থেকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে রামচন্দ্র আবার দরজায় অধিকতর জোরে আঘাত ক'রে দরজা খুলতে আদেশ করলে। তবু দরজা কেউ খুলল না।

দরজায় সজোরে একটা পদাঘাত ক'রে রামচন্দ্র বললে, "আমার ভেঙে ঢোকবার ক্ষমতা আছে শশি!"

এবার ভেতর থেকে ক্ষীণ ভীত অনুযোগ এল, "রাত দুপুরে এ কি অন্যায় উপদ্রব!" প্রত্যুত্তরে রামচন্দ্র দরজায় আর একবার সবলে পদাঘাত করলে। এর পর ভেতরে বাক্স পেঁট্‌রা নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল এবং খানিক বাদে দরজা খুলে শশি আতঙ্কে পাণ্ডুর মুখ বা'র ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাতে কি দরকার?"

রামচন্দ্র উত্তর না দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজায় নিজেই তাড়াটা লাগিয়ে দিলে, তারপর একটি কোণ থেকে বলির জন্য নির্দিষ্ট ছাগের মতো কম্পমান শশিকে টেনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে নিজে তার পাশে উপবেশন করলে। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছিল। সেই লণ্ঠনের অনতিউজ্জ্বল আলোকে শশির স্তব্ধ ছাইবরণ মুখের পানে চেয়ে রামচন্দ্র একবার ঈষৎ হাসল। সে-হাসি ভয়ঙ্কর!

"সংসারটা একেবারে একঘেয়ে নয়। এখানে মাঝে মাঝে অসম্ভবও সম্ভব হয়, না শশি? আজগুবি ব্যাপারও ঘটে!"

শশি কোন উত্তর দিলে না। রামচন্দ্র বললে, "তোমায় একটি গল্প বলতে এলাম শশি। ভয় নেই— ছোট্ট গল্প; কিন্তু বোধ হয় নেহাৎ সাধারণ নয়! কেমন, গল্প শুনতে ভালো লাগে না?" ···উত্তরের জন্যে খানিক বৃথা অপেক্ষা ক'রে রামচন্দ্র বললে, "ধরো, তোমার নাম শ্রীপতি, আর আমার নাম বিজয়।" ···শশি অকস্মাৎ উন্মাদের মতো চিৎকার ক'রে উঠল, "আমি পুলিশ ডাকব। আমি······"

চকিতে তার কণ্ঠনালীর ওপর রামচন্দ্রের মুষ্টি অত্যন্ত দৃঢ় হ'য়ে উঠল— "তা' হবে না শ্রীপতি! এ-গল্পটি তোমায় শুনতেই হবে!"

শশি দুর্বলদেহে খানিকক্ষণ সেই বজ্রমুষ্টি কণ্ঠ হ'তে খোলবার চেষ্টা ক'রে হাঁপাতে লাগল। গলার শিরগুলো তার দড়ির মতো মোটা হ'য়ে উঠেছিল এবং রক্ত-জমাট মুখ থেকে কোটরাবিষ্ট চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবার প্রবল চেষ্টা করছিল।

তার কণ্ঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রামচন্দ্র বললে, "তাহ'লে শোনো। ধরো, তুমি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। একটি সুন্দরী মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছ, তার নাম ধরো, রাত্রি। বেশ সোজা গল্প, নয়? তারপর সোজাসুজি ভাবেই ধরো— তুমি অসচ্চরিত্র, মাতাল, নির্মম, খল, পিশাচ! তোমার স্ত্রীর নারীত্বকে অহরহ অপমান কর। সে তার নিজের সম্মানটুকু বজায় রাখতে চায় ব'লে তুমি বেশি ক'রে তাকে ভাঙবার চেষ্টা কর। ধরো, সে তোমায় মিনতি করে না, পায়ে ধরে না, ভালোবাসতে সাধে না, তোমার উপেক্ষা ও অপমান গ্রাহ্য করে না ব'লে তুমি দিনের পর দিন তাকে নোয়াবার, তাকে লাঞ্ছিত করবার বৃহৎ হতে বৃহত্তর আয়োজন কর! তাকে অপমান করবার জন্যে তার সামনে তুমি বাড়ির দাসীর সঙ্গেও কদর্য আলাপ করতে কুণ্ঠিত হও না। সে একদিন

তোমায় স্পষ্ট জানালে, সে তোমায় ভালো ত বাসেই না, বরং পশুর মতো ঘৃণা করে। তুমি পদাঘাতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মুখে থুথু দিলে!…”

শশি কাতর শব্দ ক'রে মেঝে থেকে উঠে ব'সে মুখ মুছলে।

“ভয় নেই, বেশি দীর্ঘ গল্প নয়! ধরো, সে তারপর ভয়ানক এক ব্যভিচার করলে। ধরো, বিজয় ব'লে একটি ছেলে তাকে ভালোবাসত— মাটির পৃথিবীতে যতখানি ভালোবাসা সম্ভব। এতদিন সে এই বিজয়ের বহু প্রণয়-নিবেদন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এবার এই বিজয়ের সাথেই সে পালিয়ে গেল। ধরো, বিজয় আর সে ধরা পড়ল। বিচার হ'ল। সে নাবালিকা প্রমাণ হ'ল। বিজয়ের জেল হ'ল। জেল থেকে বেরিয়ে বিজয় শুনলে, রাত্রি আত্মহত্যা করেছে। বিজয় বিশ্বাস করলে না। রাত্রি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সহস্র অত্যাচারেও নিজের জীবনের ওপর সে বিদ্রোহী হবে না; বিজয়ের মুক্তির অপেক্ষা করবে। কিন্তু রাত্রির নিজের হাতে লেখা আত্মহত্যার স্বীকারপত্র নাকি বিচারের সময়ে পাওয়া গেছ্‌ল। সে-পত্র জাল। — উঁহু, আর একটু বাকি আছে যে শ্রীপতি! এর মধ্যে অধীর হ'লে চলবে না ত!” শশির দুটো হাত সজোরে নিজের মুষ্টির মধ্যে চেপে রামচন্দ্র তাকে টেনে বসিয়ে দিলে।

“একটা মানুষের এক মুহূর্তে পশু হ'য়ে যাওয়া যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা' তোমার মতো চিরপশু বুঝতে পারবে না। তবু জেনে রেখো, সেই দিন বিজয় রক্তের পিপাসায় হিংস্র পশু হ'যে গেল। রাত্রির মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী— তার জীবনের হিসাব সে নিজহাতে তুলে নিলে। তখন, ধরো, তুমি সমস্ত টাকাকড়ি উড়িয়ে দিয়ে এক জঘন্য পল্লীতে জঘন্য সঙ্গীদের নিয়ে বাস করছ। বিজয় তোমায় খুঁজে বা'র করলে। কিন্তু তুমি প্রস্তুত ছিলে।

“সে-নাইট্রিক অ্যাসিডের নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন বিজয়েব সারামুখে এখনও আছে।”

রামচন্দ্র নিজের মুখখানা শশির দিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

“হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তোমার পাত্তা আর পাওয়া গেল না। তুমি একেবারে ডুব মেরেছ। কিন্তু পঁচিশ বছর ধ'রে বিজয় বেশ বদল করেনি। অসম্ভবও সংসারে কখনও কখনও সম্ভব হয় শ্রীপতি! শুধু বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার, তার বেশি উপার্জনও সে করবার চেষ্টা কখনও করেনি।

তোমার প্রাণ নিজের হাতে নেওয়া তার একমাত্র ধ্যান। না, না, ওসব চেষ্টা বৃথা শ্রীপতি!”

উন্মত্তের মতো শশি রামচন্দ্রের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিল, তার হাত দুটোকে মুচ্‌ড়ে ধ'রে রামচন্দ্র বলতে লাগল—“ধরো, পঁচিশ বছর পর এক দিন আপনা হ'তে তুমি বিজয়ের হাতে কল্পনাতীত ভাবে ধরা দিলে! ধরো, গভীর রাত্রে নিদ্রিত বাড়িতে একটি নিরালা ঘরে তুমি আর বিজয় ছাড়া আর কেউ নেই! তারপর—?”

ধীরে ধীরে রামচন্দ্র শশির কণ্ঠনালী চেপে ধরে, তার মাথাটা পেছন দিকে বেঁকিয়ে, ঘাড়টা দুমড়ে দিতে লাগল।

“একটু নাটুকেপনা করলাম শ্রীপতি! ক্ষমা কোরো! পঁচিশ বছর ধ'রে শুধু যে-ক্ষণটি কল্পনা ক'রে দুঃসহ জীবন বহন করবার জোর পেয়েছি—সেই পরমক্ষণটি কি এক মুহূর্তে নিঃশেষ ক'রে দিতে মন সরে! তাই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে অলঙ্কৃত ক'রে জীবনের এই একমাত্র আনন্দটি উপভোগ করলাম শ্রীপতি···।”

·· ·· ··

কিন্তু বিজয়ের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের তপস্যা সার্থক হয়েছিল কি?

পরের দিনের দৈনিক কাগজে বেরুল—“গত রাত্রের প্রবল ভূমিকম্প দুই মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বালিগঞ্জের·········রোডের একটি মাটির দ্বিতল বাটী একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। শশি চক্রবর্তী নামক এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যতীত সে-বাটীর প্রায় কুড়িজন অধিবাসীর আর কেহই রক্ষা পায় নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইলেও দারুণ আঘাতে তাহার সমস্ত অঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে······”

একটি ছোট জমির টুক্‌রোতে মানুষের কাহিনী যখন অমনি জটিল হয়ে উঠেছিল তখন পৃথিবীর জঠরে বৈজ্ঞানিকেরও অজ্ঞাত কোনও কারণে তরল অগ্নিস্রোতে চঞ্চলতা জেগেছিল। অর্থলোভী কণ্ট্রাক্টারের ফাঁকির সুযোগে পৃথিবীর জঠরের কাহিনী মানুষের কাহিনীকে স্পর্শ ক'রে গেল।

মাটির ইতিহাস বৈচিত্র্যহীন—সেখানে দিনের পর দিন পুরাতন কথারই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সেখানেও বিস্ময় আছে।

এক টুক্‌রো কাঠা-আষ্টেক পরিমাণ ভূমির ইতিহাসে একদিন একটি নয়, দুটি নয়, এক সঙ্গে তিনটি অসাধারণ, অতিবিরল কল্পনাতীত ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল।

.. .. ..

মাড়োয়ারি মালিককে কর্পোরেশনের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে বোধ হয় হয়েছিল। সে সামান্য ব্যাপার। ভাঙা বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এবার প্রকাণ্ড পাকা ইমারতের ভিৎ খোড়া হয়েছে। আবার রাস্তার সামনে সাইনবোর্ড পোঁতা হয়েছে— সেন অ্যাণ্ড সেন, বিল্ডার্স অ্যাণ্ড কণ্ট্রাক্টারস্‌।

কিন্তু সে আর একটা গল্প।
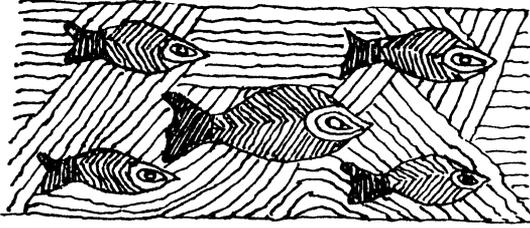
হিরণ্ময়ীর ব্যস্ততার আর সীমা নাই।

"বড় ঘরটা অমলার জন্যেই থাক, কি বলো গো? ছেলেপুলে ত তারই বেশি!"

খানিক বাদে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলেন, "কিন্তু বিমলাকে কোন্ ঘরটা দেওয়া যায় বলো ত, তার আবার কচি ছেলে!"

স্বামীর প্রতি ফরমাস অনবরতই হইতেছে, "আর একটা স্টোভ আনাও বাপু! কচি ছেলের ঘর, যখন-তখন দরকার হবে ত', ও একটায় হবে না।"

"আজকাল আবার যা মশা, মশারি তুমি 'দুটো না-হয় কিনেই আনো। ওরা ছেলেমানুষ সব গুছিয়ে কি আনতে পারবে।"

ছোট মেয়ে ক্ষ্যান্তও সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হইয়াছে— "আমি মা ন-দি'র সঙ্গে শোব কিন্তু ব'লে রাখছি!"

"হ্যাঁ মা, স্টেশনে এখনও লোক পাঠানো হ'ল না, ন-দি' আটটার ট্রেনে যে আসবে!"

"ন-দি' বোধ হয় হিন্দুস্থানী হয়ে গেছে মা, সেখানে নাকি বাঙলা কথা বলবার একটা লোকও নেই।"

ছোট মেয়ে ও তাহার ন-দিদি পিঠোপিঠি দুই বোন। বিবাহের পূর্বে দুই-জনকে ঠিক যমজের মতো দেখাইত, দুইজনে ভাবও ছিল অত্যন্ত বেশি, এক-দণ্ডের জন্যও ছাড়াছাড়ি হইত না। তাহার পর ন-দি'র বিবাহ হইয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর দুই বোনে দেখা নাই। ক্ষ্যান্তর বিবাহের সময় দেখা হইবার কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন-দি'র স্বামী লিখিয়াছিল, সময় বড় খারাপ, ছুটি চাহিলে মিলিবে না, কামাই করিলে চাকরি যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এবার আর এতদূর যাওয়া সম্ভব হইল না। ক্ষ্যান্তর বিবাহের রাত্রি ন-দি'র অনুপস্থিতিতে ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

তারপর এতদিন বাদে ন-দি' আসিতেছে। শুধু ন-দি' নয়, এ-বাড়ির সব

ক'টি মেয়েই অনেকদিন বাদে প্রথম এইবার মিলিত হইবে। বাড়িময় উৎসাহ, আনন্দ, ব্যস্ততার তাই আর সীমা নাই।

হিরণ্ময়ীর পুত্রসন্তান হয় নাই, কিন্তু তাহার জন্য তিনি দুঃখিত নন। মেয়েগুলিই তাঁহার প্রাণ।

বড় মেয়ে অমলার খুব ঘটা করিয়া কাছেই বিবাহ দিয়াছিলেন। তখন স্বামীর কারবারের অবস্থা ভালো, আঁচলা আঁচলা টাকা রোজ আসিতেছে বলিলেই হয়। তাহার পর মেজ মেয়ের বিবাহে কিন্তু অত ঘটা আর সম্ভব হইল না। ভাঁটার টান তখনই সুরু হইয়াছে। বড় লোকের ঘরে না হইলেও মেজ মেয়ের বিবাহ সৎপাত্রেই হইল। পাত্রটি বিদ্বান্, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া সুদূর বর্মা মুলুকে চাকরি পাইয়াছে। অত দূরে মেয়ে পাঠাইতে হিরণ্ময়ীর আপত্তি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর কথায় প্রবোধ মানিলেন। মেয়েছেলের আর দেশ বিদেশ কি— স্বামী যেখানে লইয়া যায় সেই তাহার দেশ বলিয়া নিজেকে বুঝাইলেন। বুঝাইলেন বটে, কিন্তু কমলা প্রথম স্বামীর ঘর করিতে যাইবার সময় কাঁদিয়া কাটিয়া এমন অস্থির হইলেন যে, পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সব মেয়েরই মায়ের প্রতি টান অত্যন্ত বেশি, কিন্তু তাহারও ভিতর কমলাকে আলাদা করিয়া ধরা যায়। মায়ের চেয়ে সে কম কাঁদিল না।

স্বামী ধমক দিয়া শেষে বলিলেন, "মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে কাঁদলে অকল্যাণ হয় তা জানো?"

অকল্যাণের ভয়ে হিরণ্ময়ী কান্না থামাইলেন কিন্তু চোখের জল থামিল না।

অমলা, কমলার পর সেজ মেয়ের বেলা নামের ঠিক মিল আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাহার নাম বিমলা। বিমলার বিবাহে একটু নূতনত্ব আছে। সে-ইতিহাস এখনও হিরণ্ময়ী সবিস্তারে পাড়ার লোককে বলিয়া বেড়ান। স্বামীর কারবার তখন ফেল পড়ে-পড়ে। কলিকাতার বড় রাস্তার প্রাসাদোপম বাড়ি বিক্রি করিয়া ছোট একটি গলির ভিতর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁহাদের দিন কাটিতেছে। স্বামী কারবারের ভাঙন ঠেকাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কম পণে বিমলার জন্য ভালো পাত্র খুঁজিবার চেষ্টায় হয়রান হইতেছেন।

মেয়েদের মধ্যে বিমলাই সবচেয়ে সুন্দরী; আর কিছু না হউক সুন্দর দেখিয়া একটি জামাই করিবার তাই হিরণ্ময়ীর বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে-ইচ্ছা বুঝি আর পূর্ণ হয় না।

হয়রান হইয়া ব্রজগোপালবাবু এক জায়গায় কথাবার্তা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পাত্রটির অবস্থা ভালো। কিন্তু চেহারা ভালো নয়। তাহার উপর দোজবরে। হিরণ্ময়ী এ-পাত্রে বিবাহ দিতে একান্ত নারাজ ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর কথায় মত দিতে বাধ্য হইলেন। এ-পাত্রকে জবাব দিলে আর ভালো পাত্র মিলিবে কি না সন্দেহ। তবু ত' মেয়েটার খাইবার-পরিবার দুঃখ থাকিবে না।

কিন্তু বিমলার ভাগ্যদেবতা অন্যরূপ বিধান করিয়াছিলেন। বিমলার বর হঠাৎ আপনা হইতে আসিয়া ধরা দিল।

মামাতো ভায়ের কাছে পাশ পাইয়া হিরণ্ময়ী মেয়েদের লইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সারাক্ষণ মুগ্ধ হইয়া থিয়েটার দেখিয়াছেন এবং গভীর রাত্রে ছ্যাকরাগাডি করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় থিয়েটারের নটীরা সত্যই সুন্দর, না রঙ মাখিয়া এমন রূপবতী হইয়া থাকে; ঘরপোড়ার দৃশ্যে সত্যই রঙ্গমঞ্চে আগুন লাগিয়াছিল কিনা ইত্যাদি সমস্যার আলোচনায় এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আর কিছু লক্ষ্য করিবার সময় পান নাই।

বিমলা তবু একবার বলিয়াছিল, "একটা মোটর তখন থেকে আমাদের পেছনে আস্তে আস্তে আসছে মা!"

হিরণ্ময়ী সে-কথায় কান দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

তার পরের দিন নূতন এক ঘটক আসিয়া হাজির। ব্রজগোপালবাবু ত' নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতেই পারেন না।

তাঁহার মতো বামনের ভাগ্যে এমন চাঁদ মিলিবে, এ-কথা তিনি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন। ব্যাপারটা অসাধারণ। হাতিবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের ছোট ছেলের সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া ঘটক আসিয়াছে।

ব্রজগোপালবাবু ঘটককেই কি যে সম্মান করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন— "আপনি পরিহাস করছেন না ত'? আমার মেয়ে তাঁদের দাসীগিরি করারও যোগ্য নয়। তাঁদের পছন্দই কি হবে!"

ঘটক হাসিয়া জানাইল— "আপনাকে সে-সব ভাবতে হবে না মশাই। যার ক'নে সে নিজেই পছন্দ করেছে। এখন চার হাত এক করলেই হয়।"

সত্যই ব্রজগোপালবাবুকে ভাবিতে হইল না। দত্ত-পরিবারের সকলের আদরের ছোট ছেলে নিজে যাহাকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে অবহেলা করিতে কেহ সাহস করিল না। একদিন সত্যই বিবাহ হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী শুধু সুন্দর জামাই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তব তাঁহার কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গেল। জামাই শুধু কার্তিকের মতো সুপুরুষ নয়, কুবেরের মতো ধনবানও বটে।

বিমলার বুঝি অনেক জন্মের তপস্যা— নহিলে থিয়েটারে একবার চোখের দেখা দেখিয়া তাহার জন্য অমন রূপবান্ ও ধনবান্ ছেলে পাগল হইবে কেন!

বিমলার পর নির্মলা। আলোব পর অন্ধকারও বুঝি বলা চলে। হিরণ্ময়ীর মেয়েদের মধ্যে এইটিকে কুৎসিত বলিলে মিথ্যা বলা হয় না! বিবাহ যেমন-তেমন করিয়া হইল। পাত্রটির বয়স হইয়াছে, লেখাপড়া তেমন জানে না, সামান্য আয়ের চাকরি করে বলিয়া এবং তিনকুলে কেহ নাই বলিয়া এতদিন বিবাহ করে নাই। দেখাইবার মতো জামাই নয়, তবু হিবণ্ময়ী বিশেষ দুঃখিত হইলেন না বোধ হয়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশা তাঁহার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ক্ষ্যান্ত কোলের মেয়ে, তবু জানিয়া শুনিয়া তাহাকে একরকম জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্মলার স্বামী তবু সামান্য চাকরি কবিত। ক্ষ্যান্তর ভাগ্যে যে-স্বামী জুটিল তাহার নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই। নেহাৎই মেয়ের বিবাহের বয়স পার হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে মান রাখিবার জন্য ধরিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। মার্কামারা বকাটে ছেলে, নেশা-ভাঙও সম্ভবতঃ করিয়া থাকে। আপাততঃ সে একরকম ঘরজামাই হইয়াই আছে।

ক্ষ্যান্তর বিবাহের সময়ও হিরণ্ময়ী সব মেয়েদের আনাইতে পারেন নাই। পয়সার অভাব, তাছাড়া বুঝি মনে মনে একটু লজ্জাও ছিল।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। ব্রজগোপালবাবু পূর্বের অবস্থা আর ফিরিয়া পান নাই সত্য, কিন্তু কারবার ভাঙনের কিনারায় আসিয়া আবার একটু ভালোর দিকে ফিরিয়াছে। হিরণ্ময়ী সচ্ছল অবস্থার দিনে কি ব্রত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে সে-ব্রত এতদিন উদ্‌যাপন হয় নাই। এতদিনে হইবে। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপনটা গৌণ ব্যাপার! সেই উপলক্ষে সমস্ত মেয়েদের একত্র দেখিতে

পাওয়াই মুখ্য। মেয়েরা নিজের নিজের সংসার লইয়া ব্যস্ত। এ-সুযোগ গেলে আর কখনও দেখা হইবে কিনা সন্দেহ। হিরণ্ময়ী স্বামীকে সেইরূপই বুঝাইয়াছেন। ব্রজগোপালবাবু আপত্তি করেন নাই।

সবার আগে আসিল কমলা। সঙ্গে তাহার স্বামী প্রভাসও আসিয়াছে। প্রভাস একেবারে পুরাদস্তুর সাহেব। শ্বশুরবাড়িতেও হ্যাটকোট প্যাণ্ট পরিয়া আসিয়াছে! কমলারও অনেকটা বিবির মতো বেশভূষা। ক্ষ্যান্ত ত' দিদির শাড়ি পড়িবার ধরন দেখিয়াই অবাক। দিদির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিবার সাহসই তাহার হয় না। হিরণ্ময়ী এবং ব্রজগোপালবাবুরও কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেকে। কমলা— মায়ের সেই অত্যন্ত ন্যাওটো মেয়েটি— কেমন যেন পর হইয়া গিয়াছে। মুখে যাহার কথা ফুটিত না, সে আজকাল ফড়ফড় করিয়া কথা বলে— দু'একটা ইংরাজিও সেই সঙ্গে জুড়িয়া দেয়। একটু রোগা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আরও যেন ছেলেমানুষ দেখায়। ছেলেপুলে হয় নাই— বোধ হয় আর হইবেও না। মা সেজন্য একবার বুঝি দুঃখ প্রকাশ করেন। কমলা হাসে, বলে, "ছেলেপুলে হ'লে যেন ভারী সুখ— উনি ত বলেন— ওসব nuisance আমাদের দরকার নেই।" মার কাছে কথাগুলো যেন একটু নির্লজ্জের মতো শোনায়। কমলা যেন একটু বেহায়াই হইয়াছে। বাপ-মার সামনে স্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা ত' দেয়ই না, স্বচ্ছন্দে কথা বলে। ব্রজগোপালবাবু কাছে থাকিলে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়েন। হিরণ্ময়ী অস্বস্তি বোধ করিয়া মাথা নিচু করিয়া থাকেন। মনকে বোঝাইতে চেষ্টা করেন— আজকালকার ওই রকমই ফ্যাসান, তা ছাড়া থাকে সেই কোন্ মগের মুলুকে, ওর আর দোষ কি?

অমলা প্রকাণ্ড একটা মোটরে করিয়া একরাশ ছেলেপুলে লইয়া আসিল। তাহার স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছে, গোলগাল ছোট্টখাট্ট ভালো মানুষটি। অত বড়ঘরের ছেলে বলিয়া বুঝিবার জো নাই। অমলাকে তাহার চেয়ে অনেক ভারিক্কি দেখায়। অমলা ছেলেবেলা হইতেই একটু গম্ভীর, এখন তাহাকে অত্যন্ত রাশভারি মনে হয়। তাহাদের সরকার সঙ্গে আসিয়াছে। দেখা যায় যে বাবুর চেয়ে অমলাকে সে মান্য করে বেশি। আদেশপত্র অমলাই সব দেয়। ছেলেপুলেরা বাপকে ত মানেই না, ভয় করে যা মাকে।

অমলা আসিয়াই কাজকর্মের ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়া যায়। খানিক বাদে বরং মনে হয় যে অমলা না

আসা পর্যন্ত কাজকর্ম যেন মোটেই সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছিল না। সে না থাকিলে সব যেন গোলমাল হইয়া যাইত— এমন সন্দেহও হয়।

হাঁকডাক করিয়া ফায়-ফরমাস দিয়া অমলা সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

"— এ ছেঁড়া মান্ধাতার আমলের সামিয়ানা কে এনেছ? বিনোদ বুঝি! যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

বিনোদ ক্ষ্যান্তর স্বামী। কাপড় অভাবে চওড়া-পাড় একটা শাড়ি পরিয়া সে কাছ দিয়া যাইতেছিল। যাইতেছিল বোধ হয় রান্নার জায়গায়। রসুই-বামুনদের সঙ্গে ইতিমধ্যে সে বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছে। গোপনে গোপনে দুই এক ছিলিম চলিয়াছে বলিয়াও বোধ হয়।

বিনোদ দাঁড়াইয়া পড়িয়া একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল— "ও ছেঁড়া নয় বড়দি, ওসব হ'ল সামিয়ানার জানালা, আজকালকার ফ্যাসান জানো না?"

অমলা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি এখনি ফেরত দিয়ে এস। ভালো সামিয়ানা যদি না পাও সেখানে, তাহ'লে অন্য জায়গায় দেখতে হবে।"

অমলার কণ্ঠস্বরে কিছু-একটা আছে। বিনোদের রসিকতার উৎসাহ একেবারে নিভিয়া গেল। ঘাড়-কামানো মাথাটা বার কয়েক চুলকাইয়া রান্না-ঘরের লোভ ত্যাগ করিয়া সে সামিয়ানা বদলাইতেই শেষ পর্যন্ত বাহির হইল।

অমলার হাতে তাহার মা-বাপেরও নিস্তার নাই।

"কই মা, তোমার পুরুতঠাকুর কই? আর তুমি ওই কাপড় প'রে আছ যে বড়! সে গরদের খানা কি হ'ল?"

মা একটু হাসিয়া বলেন— "এও ত বেশ শুদ্ধ কাপড় বাপু। আর সে-গরদ পরে না।"

"কেন পরে না শুনি? কে বলেছে তোমায় ও-কাপড় শুদ্ধ? ও-সব বিদেশি সস্তা কাপড়— কি থেকে তৈরি কে জানে! না না, তুমি গরদ বা'র ক'রে আনো। নাহ'লে আমার ট্রাঙ্কে একটা আছে, দেব এনে?"

মাকে কাপড় বদলাইতে যাইতে হয়।

অমলার কর্তৃত্ব সকলেই সহজে সানন্দে মানিয়া লয়। তাহার আদেশে জবরদস্তি আছে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।

কিন্তু একজনের একটু খারাপ লাগে। এ-বাড়ির ভিতর সামান্য একটু অশান্তির বীজও বুঝি অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হয়।

অমলা মাঝের ঘরে ঢুকিয়া বলে—"হ্যাঁরে কম্‌লি, তোদের সঙ্গে ওই যে বেয়ারা এসেছে, ও কি জাত ?"

কমলা হাসিয়া বলে— "কি জাত কে জানে ? ও মাদ্রাজি।"

"মাদ্রাজিদের কি জাত নেই ?"

"থাকবে না কেন— সে-খোঁজ করি নি।"

"ওমা জাত জানিস না, অথচ ঘর-দোর জিনিস-পত্র সব ছুঁয়ে-টুয়ে বেড়াচ্ছে, কিছু বলিস নি !"

"তাতে কি হয় ?"

"হয়, হয় রে পাগ্‌লি। হিন্দুর বাড়িতে দোষ হয় ; আমরা ত' তোর মতো খ্রীস্টান হইনি। তবে আজকের মতো বাইরের ঘরে থাকতে ব'লে দিস, পুজো-আচ্চার দিন। বুঝেছিস ?"

কমলা হাসিয়া বলে— "আচ্ছা মুস্কিল, বাপু। ও ত' সেখানে আমাদের রেঁধে পর্যন্ত দিয়েছে, কি হয়েছে তাতে !"

অমলাও হাসিয়া বলে—"হয়েছে এই যে, তোর হাতে আর আমরা খাব না।"

"তা খেয়ো না।" —কথাটা হাসিয়া বলিলেও কমলা মনে মনে বুঝি একটু অসন্তুষ্ট হয়।

অমলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলে— "হ্যাঁরে, প্রভাসকে দেখছি না কেন ?"

"উনি একটু বেরিয়েছেন।"

"বেরুতে দিলি কেন ? থাকলে একটু দেখাশুনা করতে ত' পারত !"

কমলা অপ্রসন্নভাবে বলে— "সে তোমরাই করছ, আমরা ও-সব বুঝি-টুঝি না।"

'আমরা' কথাটার উপর একটু জোরই দেওয়া হইয়াছে। অমলা বুঝিতে পারিয়া একটু গম্ভীর হইয়া যায়।

মায়ের সর্বাপেক্ষা রূপসী মেয়ে, দত্ত-পরিবারের আদরের বধূ বিমলা আসিয়াছে অনেক দেরিতে, অত্যন্ত সাধারণ বেশে একটি ছ্যাকরাগাড়ি করিয়া। ছয় মাসের ছেলেকে সে নিজেই কোলে করিয়া আনিয়াছে, দূর-সম্পর্কের এক দেওর পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে মাত্র, সঙ্গে একজন ঝিও আসে নাই।

বিমলা কাছেই থাকে বলিয়া মা ইতিপূর্বে দু'একবার তাহাকে আনাইবার চেষ্টা করিযাছেন কিন্তু সফল হন নাই। আজ গাড়ি হইতে তাহাকে নামাইতে গিয়া তিনি অবাক হইয়া যান।

বিমলার হাত হইতে ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া তিনি প্রথম আদর করেন। রাজপুত্রের মতো ছেলে হইয়াছে।

কিন্তু বিমলার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন— "একি ছিরি হয়েছে মা তোর? অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি! কই খবর দিস্‌নি ত'!"

বিমলা ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলে— "অসুখ করবে কেন! এমনি ত' শরীর।"

"এমনি শরীর কিরে! —গলায় কণ্ঠা বেরিয়েছে, মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে— ময়লা হয়ে গেছিস; কি হয়েছিল মা?"

বিমলা মায়ের সঙ্গে যাইতে যাইতে মাথা নিচু করিয়া বলে, "সত্যি, কিছু হয়নি ত মা।"

মায়ের মন সেকথা বিশ্বাস করিতে চায় না। বিমলার গলার স্বর পর্যন্ত যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন সঙ্কুচিত ভাব। মা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন। কিন্তু সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় এখন নাই। মনের অশান্ত উদ্বেগ চাপিয়াই তাঁহাকে রাখিতে হয়।

বাড়িতে ঢুকিতেই অমলা জিজ্ঞাসা করে— "বিমলা যে একা এল! অপূর্ব আসেনি মা?"

মা বিমলার কথা ভাবিতেই এত তন্ময় ছিলেন যে, এ ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেন নাই। বলেন— "তাই ত'!"

তাহার পর বিমলাকে জিজ্ঞাসা করেন— "অপূর্ব এল না কেন রে?"

বিমলা মৃদুস্বরে বলে, "তিনি বোধ হয় আসতে পারবেন না, অনেক কাজ!"

অমলা একটু হাসিয়া বলে— "হুঁ, কাজ ত' ব্যাঙ্কের চেক সই করা। তুই যেমন বোকা মেয়ে, জোর ক'রে ধ'রে আনতে পারলি নে?"

বিমলা মৃদু একটু হাসে মাত্র, উত্তর দেয় না।

বাড়িময় গোলমাল, ব্যস্ততা। কোথা দিয়া কি হইতেছে কে জানে! সকল কাজের খেই একা অমলা ছাড়া বুঝি আর কেহই রাখিতে পারে না। কাহারও সে-উৎসাহ নাই। ক্ষ্যান্ত বিমর্ষ মনে ঘুরিয়া বেড়ায় বড়দিদির দৃষ্টি এড়াইয়া।

বড়দিদি দেখিতে পাইলেই একটা কাজে লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। ন-দিদি এখনও আসে নাই— বোধ হয় আসিবেই না। ন-দিদি কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইল কে জানে। তাহার ন-দিদিকে দেখিবার জন্য সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া আছে। ন-দিদির কি একবারও মনে পড়ে না। কত কথাই না সে মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। ন-দিদি না আসিলে তাহার কিছুই ত হইবে না। আর এবার যদি ন-দিদি না আসে তাহা হইলে আর কখনও দুইজনের দেখা হইবে কিনা সন্দেহ। না, ক্ষ্যান্তর জীবনে কোন সুখ নাই। অকর্মণ্য স্বামীর জন্য একেই ত' তাহার দুঃখ ও গ্লানির অন্ত নাই — মনের কথা বলিবার মতো একজন সঙ্গিরও তাহার অভাব। নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে পারিলে বুঝি সে অনেকটা হাল্‌কা বোধ করিত। দিদিরা সব যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। বড়দিদিকে অবশ্য সে চিরকাল মায়ের চেয়ে বেশি ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু মেজদিদি ও সেজদিদির কাছে লজ্জা সঙ্কোচ করিবার ত' তাহার কিছু ছিল না। কিন্তু তাহারাও কেমন দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেজদিদি বাড়িতে আসিয়া অবধি কোন্ কোণে যে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করাই শক্ত। যে-সেজদিদির হাসিতে বাড়ি সারাক্ষণ মুখর হইয়া থাকিত, গলার আওয়াজের জন্য যে মার কাছে অহরহ বকুনি খাইয়াছে, আজকাল তাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির করাই কঠিন। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়াই আছে। পাঁচটা কথার উত্তরে একটা হুঁ দেয় মাত্র। আর মেজদিদির যা দ্যামাক, কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। আজ সে ত' মেজদি'র উপর রীতিমতো চটিয়াই গিয়াছে। মেজদি কি সব নূতন ফ্যাসানের কাপড় জামা আনিয়াছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছিল। কাপড় দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ মেজদি বলিয়া বসিল—"হ্যাঁরে, বিনোদ আজকাল কাজকর্ম কিছু করছে?" স্বামীর কাজকর্মের কথায় লজ্জা পাইয়া ক্ষ্যান্ত চুপ করিয়াছিল।

কমলা তাহার পর বলিয়াছিল— "ব'সে ব'সে খাচ্ছে ত ? কি বেহায়া বাপু! বাবার যেমন কাণ্ড, দেশে আর পাত্র ছিল না।"

কথাগুলা হয়তো ক্ষ্যান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্যই বলা হইয়াছিল কিন্তু ক্ষ্যান্ত প্রসন্ন হইতে পারে নাই।

মেজদি আবার বলিয়াছিল— "একটু মান অপমান জ্ঞান নেই। কি ব'লে একটা শাড়ি প'রে চাকর বাকরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বলো ত'! আমি তখন

ডেকে খুব ধম্‌কে দিয়েছি। আমাদের বেয়ারা রামেশ্বরের কাছ থেকে দেখি না একটা বিড়ি চাইছে। তা ধম্‌কালে কি লজ্জা আছে! দাঁত বা'র ক'রে হাসতে হাসতে চলে গেল।"

ক্ষ্যান্তর কিন্তু অত্যন্ত একটা দরকারি কাজের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কাপড় দেখা তখন আর হয় নাই। কমলা ডাকিয়া বলিয়াছিল—"এই সিল্কের খানা দেখে গেলি না।"

ক্ষ্যান্ত যাইতে যাইতে বলিয়াছিল, "এখন থাক!"

—না, মেজদির অহঙ্কার বড় বেশি। বাপের বাড়ি আসিয়া অত সাজগোজই বা কেন? তাহারা কখনও কাপড় জামা দেখে নাই কি? না, ন-দি'র উপর তাহার অত্যন্ত অভিমান হইতেছে। সে আসিলে তাহার ত কাহাকেও দরকার হইত না। তাহারা দুইজন এতক্ষণ চিল-কোঠার ঘরে গিয়া গল্প করিতে পারিত। চিল-কোঠার অবশ্য আগেকার সে আকর্ষণ আর নাই। পাশে একটা মস্ত বাড়ি উঠিয়া তাহাদের চিল-কোঠার সামনেটা আড়াল করিয়াছে। দূরের সেই পুকুরঘাট আর সুপারিগাছের বন আর দেখা যায় না। দুজনে মিলিয়া তখন কি উৎসাহের সঙ্গেই না ছাদ হইতে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সেই পুকুরে ঢিল ছুঁড়িয়াছে। আজকাল ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা ঢিল ছুঁড়িতে পারে না। তাহাদের সে-বয়স আর নাই। কেন যে নাই তাহা ক্ষ্যান্ত ভালো করিয়া বোঝে না। ঢিল ছুঁড়িবার লোভ ত' এখনও তাহার প্রচুর। তবে লোকে কি বলিবে এই যা। আর ন-দি'ও সে-রকম নিশ্চয়ই নাই। এই পরিবর্তনের কথা ভাবিয়া ক্ষ্যান্তর দুঃখ হয়। সত্যই বিবাহের পূর্বে তাহারা বেশ ছিল। কতদিন তাহারা দুইবোনে পরামর্শ করিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই বিবাহ করিবে না। দুইজনে দুই জায়গায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতে তাহাদের অত্যন্ত আপত্তি ছিল। সত্যই সে-সব কল্পনা আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়াইল।

ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষ্যান্ত বাবার সামনে গিয়া পড়ে। ব্রজগোপালবাবু ভাঁড়ার ঘরের এক পাশে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। ক্ষ্যান্তকে দেখিয়া বলেন, "হ্যাঁরে, বিনোদকে দেখছি না যে।"

ক্ষ্যান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, হাসিও পায় একটু। বাবার অদ্ভুত সব কথা। স্বামীকে তাহার যেন চোখে চোখে রাখিবার কথা! না দেখিতে পাওয়ার কারণ যেন সে জানে।

ক্ষ্যান্ত চুপ করিয়া থাকে। ব্রজগোপালবাবু বলেন, "যা সব গোলমাল, খেয়াল ক'রে তাকে কেউ খাওয়াল কি না কে জানে!"

তাহার স্বামী যে কচি খোকা নয়, খাইবার ইচ্ছা হইলে সে যে নিজে চেষ্টা করিয়া খাইতে পারে একথা আর সে কেমন করিয়া বাবাকে বুঝাইবে। এই উচ্ছৃঙ্খল অকর্মণ্য জামাইটির প্রতি বাবার যে অতিরিক্ত একটু স্নেহ আছে তাহা ক্ষ্যান্ত জানে। মুখে ইহাকে বাড়াবাড়ি বলিলেও কেন যে সে ইহাতে খুশি হয় বলিতে পারে না।

ক্ষ্যান্ত স্বামীর কথা এড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করে—"বাবা, ন-দি' যে এল না?" কথাটা এমনি সে জিজ্ঞাসা করে; বাবা যে কোন-কিছুর খবর রাখে না, ইহা সে জানে।

কিন্তু ব্রজগোপালবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলেন, "তাই ত, তাই ত, তোর মাকে বলতে ভুলে গেছি। নির্মলা যে চিঠি দিয়েছে।"

এক এক করিয়া তিনটি পকেট হাতড়াইয়া অবশেষে ব্রজগোপালবাবু এক পকেট হইতে খামটা বাহির করেন।

ক্ষ্যান্ত রাগ করিয়া বলে—"তুমি ত বেশ বাবা, আমরা সবাই ভেবে মরছি আর তুমি চিঠি পকেটে রেখে ভুলে গেছ।"

ব্রজগোপালবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, "সকালে পিওন দিয়ে গেছে—তোর মাকে দেব দেব ক'রে ভুলে গেছি।"

ক্ষ্যান্ত সে-কথা অবশ্য তখন শুনিতেছে না। সে চিঠি পড়ায় ব্যস্ত। চিঠি পড়িতে পড়িতে তাহার সত্যই কান্না পায়। ন-দি' কত কথাই লিখিয়াছে। কেন আসিতে পারিবে না, তাহাদের সেখানে এখন কি রকম গরম ইত্যাদি। শুধু তাহার বেলাই, 'ক্ষ্যান্তকে আমার আশীর্বাদ দিও' ছাড়া আর কিছু নয়। এতটুকু ত' না লিখিলেই চলিত। ক্ষ্যান্তকে আর মনে রাখিবারই বা কি দরকার ছিল? চিঠিটা ফিরাইয়া দিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

ব্রজগোপালবাবু পিছন হইতে বলেন—"চিঠিটা নিয়ে যা ক্ষেন্তি, তোর মাকে দিবি।"

কিন্তু ক্ষ্যান্ত আর ফিরিয়াও চাহে না।

অনেক রাত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়া, বাড়ির কাজ সব

ঢুকিয়াছে। হিরণ্ময়ী সমস্ত মেয়েদের লইয়া খানিকক্ষণের জন্য একটি ঘরে বসিয়াছেন।

অমলা মেজবোনকে বকিতেছিল, "বিকেল বেলা শান্তির জল নেবার জন্য তোকে ডেকে ডেকে হয়রান। শেষকালে কে বললে, তোরা সেজেগুজে ছবি দেখতে গেছিস্। আজকের দিনে তোর বায়স্কোপে না গেলে চলতো না?"

কমলা গম্ভীরমুখে বলিল— "আমরা থেকেই বা কি করতাম?"

অমলা এবার একটু রাগিয়াই বলিল, "তবু থাকতে হয়। বায়স্কোপ ত' আর পালিয়ে যাচ্ছিল না?"

"আহা আজ হ'ল এ-ছবির শেষ দিন, আমরা বলে সেই রেঙ্গুন থেকে অ্যাড্‌ভারটিজমেণ্ট্ দেখে দিন গুন্‌ছি!"

"তা ও-ছবি না-হয় অন্য ছবি দেখতিস্— সেই বায়স্কোপ ত'। এই কলকেতা শহরেই আছি; পাঁচ বছর ত' একটা থিয়েটারে পর্যন্ত যাইনি।"

কমলা উষ্ণস্বরে জবাব দেয়— "যার যেমন রুচি।"

মা ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াইতেছে দেখিয়া অন্য কথা পাড়েন, তাহার পর বলেন— "বিমলা আবার উঠে গেল কোথায়?"

ক্ষ্যান্ত বলিল— "ছেলে কাঁদছে বোধ হয়।"

"না ছেলে ত ঘুমোচ্ছে দেখে এলাম," —বলিয়া অমলা আবার জিজ্ঞাসা করে— "ওর কি হয়েছে বলো ত মা?"

হিরণ্ময়ীর মুখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ে। কিছুই তিনি জানেন না, তবু মায়ের প্রাণ কি যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া ওঠে। হিরণ্ময়ী কিছু না বলিয়া সেজ মেয়ের খোঁজে উঠিয়া যান।

বিমলা সত্যই তাহার ঘরে গিয়া ছেলেকে দোল দিতেছে। হিরণ্ময়ী তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলেন— "উঠে এলি যে মা?"

বিমলা মৃদু হাসিয়া বলে— "এমনি।"

তাহার পিঠে হাত রাখিয়া হিরণ্ময়ী সস্নেহে বলেন— "অনেকদিন বাদে এসেছিস, এবার কিন্তু তোকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিনে। তা তারা যা বলে বলুক।"

বিমলা খানিক চুপ করিয়া থাকে। তাহার পর আস্তে আস্তে বলে— "অনেক দিন কেন মা, চিরকালের জন্য রাখতে পারো না?"

হিরণ্ময়ী হাসিয়া বলেন, "দূর পাগ্‌লি, আমি রাখলেই কি তুই থাকতে চাইবি! দু'দিন বাদেই যাবার জন্যে পাগল হবি। বিয়ের পর কি আর মেয়েদের বাপের বাড়ির ওপর টান থাকে।"

বিমলা অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলে, "তা বটে।"

হিরণ্ময়ী খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বলিবার কোন কথা নাই। তাহার পর বিমলাকে শুইতে বলিয়া উঠিয়া যান।

কিন্তু তাঁহার নিজের চোখে ঘুম নাই। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার গভীর সুখ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। অনেক সাধ করিয়া তিনি মেয়েদের আনাইয়াছেন, একটি বাদে তাঁহাদের সমস্ত মেয়েই আজ একত্র হইয়াছে, তাঁহার ত' অত্যন্ত সুখী হইবার কথা, কিন্তু সত্যই কি তিনি সুখী হইয়াছেন? মেয়েদের ঠিক যেমনটি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনটি কি তাহারা আর আছে? ইহারা তাঁহারই কন্যা, অথচ ঠিক যেন তেমনটি আব নাই।

নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায়, এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম যেন তিনি সৃষ্টি, সংসার ও জীবনেব দুর্জ্ঞেয় অতল রহস্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইযাছেন।

পরমুহূর্তেই তাঁহার চমক ভাঙে। ভাঁড়ার ঘরে বোধ হয় তালা দেওয়া হয় নাই। কাল সকাল হইতে আবার অনেক কাজ।
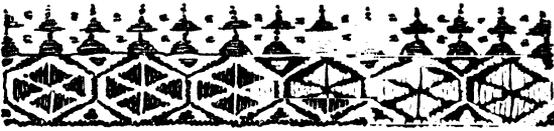
কোনরকমে পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যায়; কিন্তু ঘাড়টা পর্যন্ত সোজা করিবার উপায় নাই, মাথা তুলিলেই নৌকার ছইয়ে ঠেকিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী মোটা মানুষ, পায়ে একটু বাতও আছে। পা না ছড়াইয়া বেশি-ক্ষণ একভাবে তিনি বসিয়া থাকিতেই পারেন না, কিন্তু সে-অসুবিধার কথা তাঁহার এখন মনেই নাই। সংকীর্ণ নৌকার ছই-ঢাকা স্থানটিতে বসিয়া, তিনি 'সেথো' লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া যে-সব গাল পাড়েন তাহার কারণ অন্য।

'সেথো'র কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে, অপরিচিত তীর্থস্থানে যাহার ভরসা করিয়া রওনা হইতে হইয়াছে, মনে মনে যত রাগই থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কেহ সাহস করে না। গোরু-ভেড়ার মতো তাল পাকাইয়া নৌকার সংকীর্ণ ছই-এর নিচে অশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইলেও তাহারা নীরব হইয়াই থাকে।

কিন্তু দাক্ষায়ণী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। পাড়ার ডাকসাইটে তেজী মেয়েমানুষ; বালিকাবয়সে বিধবা হইবার পর লোকে তাঁহার অননু-করণীয় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের জন্য শ্রদ্ধা যতখানি করে, তাঁহার প্রচণ্ড মুখের ধারকে ভয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি।

বিদেশে বিভুঁয়ে অপরিচিত তীর্থপথের একমাত্র সহায় হইয়াও লক্ষ্মণ সে-মুখের কাছে রেহাই পায় না। দাক্ষায়ণী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবার মেয়ে নন; বিশেষতঃ এক্ষেত্রে তাঁহার রাগের যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

"হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বাঁদর। দেশে তোকে ফিরতে হবে না? তখন পাইখানার খ্যাংরায় তোর মুখ ভেঙে না দিই ত' আমি মুখুজ্যেদের বউ নই!"

লক্ষ্মণ উত্তর দেয় না, উত্তর দিবে কি, তাহাকে এই ক'দিন দেখিতেই পাওয়া যায় নাই। হালের মাচানের উপর সভয়ে দাক্ষায়ণীর নাগালের বাহিরে সে দিন কাটায়। দাক্ষায়ণীর সামনে আসিবার সাহস তাহার নাই।

ছই-এর ভিতর হইতে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠ শোনা যায়— "জোচ্চোর, পাজী, হারামজাদা, আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই ত' তোকে সাগর পর্যন্ত পৌছতে হবে না— তার আগে তুই ওলাওটায় মরবি।"

লক্ষ্মণ এ-অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই। নৌকাব অপর ধারে খোলা পাটার উপর বসিয়া যাহারা কলরব করিতেছে তাহাদের সম্পর্কেই দাক্ষায়ণীর এই রাগ। লক্ষ্মণেরও এখন মনে হয় পয়সার লোভে এমন কাজটা না করিলেই হইত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

ছই-এর ভিতর হইতে আবার কলরব শোনা যায়। বছর আষ্টেকের একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে ছই-এর অপর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে লইয়াই গোল।

দেখিতে সুশ্রী হইলে কি হইবে, ওইটুকু একরত্তি মেয়ের চাল-চলন কথায়-বার্তায় অসহ্য পাকামি দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়। ছই-এর ভিতরকার মেয়েরা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে— "মানুষের বসবার জায়গা নেই, এখান দিয়ে যাবি কি লা?"

ছোট মেয়েটি তাহার ফুলের মতো কচি মুখটি অপরূপ ভঙ্গিতে বিকৃত করিয়া হাত নাড়িয়া বলে— "যাবনা কেন লা! তোমাদের ত' কেনা জায়গা নয়।"

অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া মেয়েরা বলে, "ওমা, কোথায় যাব মা! এক ফোঁটা মেয়ের কথার ঢঙ্ দেখেছ!"

একজন বলে, "হবে না, কি রক্তে জন্ম!"

মেয়েটা ছোট মুখখানি বাঁকাইয়া বলে, "মুখ নাড়তে আর হবে না, ভালোয়-ভালোয় পথ দাও বলছি, নইলে গায়ের ওপর দিয়ে যাব।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ কথা বলেন নাই। এবার অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙাইয়া বলেন, "তবে রে ইল্লুতে মেয়ে— যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যা না দেখি গায়ের ওপর দিয়ে; গলা টিপে পুঁতে ফেলব না!"

কিন্তু দাক্ষায়ণীর চোখ রাঙানিতেও ভয় পাইবার মেয়ে সে নয়; চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে, "ইস্, পুঁতে অমনি সবাই ফেলে!"

ওদিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ডাকিয়া বলে, "ওদের সাথে আবার লাগতে গেলি কেন লা বাতাসি!"

বাতাসি চক্ষের নিমিষে একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া বলে, "দেখনা মা, লক্ষ্মণদাদার কাছে যেতে চাইলুম তা মাগী গলা টিপে দিলে।"

ছই-এর তলার স্ত্রীলোকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়— "ওমা কি ঘেন্না! তোর গলা টিপলে কে লা ছুঁড়ি? আবার বলে কি না মাগী!"

বাতাসি ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে অসংকোচে বলে— "না বলবে না! গলা টিপে দিলে চুপ ক'রে থাকবে!"

"হ্যাঁ গা, ওই কচি মেয়ের গলা টেপা কিসের জন্যে।" —বলিয়া যে-স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসে— শীর্ণ অসুস্থ কুৎসিত মুখে, কোটরপ্রবিষ্ট দুই চোখে, দেহের সমস্ত ভঙ্গিতে তাহার জীবনের কদর্য ইতিহাস অতি স্পষ্টভাবেই লেখা— দেখিলে চিনিতে বিলম্ব হয় না। কাছে আসিয়া বাতাসিকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া সে বলে— "কে, গলা টিপলে কে শুনি!"

বাতাসি অম্লানবদনে দাক্ষায়ণীর দিকে দেখাইয়া দিযা বলে— "ওই ধুম্‌সি মাগীটা!"

দাক্ষায়ণীর মুখে পর্যন্ত এই নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগে খানিকক্ষণ কথা সরে না। তাহার পর নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া তিনি কটুকণ্ঠে বলেন— "আমি গলা টিপলে আজ যে ম'রে স্বর্গে যেতিস্ ছুঁড়ি; সে-ভাগ্যি তোর হবে!"

ঝগড়াটা ইহার পর আরও কত প্রচণ্ড হইয়া উঠিত বলা যায় না, কিন্তু মাঝিরা ইতিমধ্যে আসিয়া মাঝে পড়িয়া বাতাসি ও তাহার মাকে একরকম জোর করিয়াই সরাইয়া লইয়া যায়। দূর হইতে পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ ইহার পর চলিতে থাকে, কিন্তু বিশেষ কিছু কেলেঙ্কারি আর হইতে পারে না।

ডায়মণ্ডহারবার হইতে নৌকা ছাড়িবার পর এমনিতর গোলযোগ কয়দিন ধরিয়াই চলিতেছে। নৌকা ছাড়িবার পর তাঁহাদের সঙ্গে বেশ্যার দলকে সহযাত্রী করা হইয়াছে জানিতে পারা অবধি দাক্ষায়ণী নৌকায় আর জলগ্রহণ করেন নাই। এখন আর উপায় নাই, নহিলে তিনি বোধ হয় নৌকাও ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

এই কয়দিনের ভিতর মাত্র দুইবার চরে নৌকা লাগানো হইলে তিনি ভালো

করিয়া স্নান করিয়া সামান্য একটু আহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নৌকায় নিরম্বু উপবাসে কাটিয়াছে। অন্যান্য ভদ্র যাত্রীরা সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাহাদের অধিকাংশই তাঁহার মতো বিধবা। তাহারা তাঁহার মতো অতখানি আত্মসংযম কিন্তু করিতে পারে নাই। গঙ্গাজল ও বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই ইত্যাদি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়াছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দাক্ষায়ণীর সঙ্কল্প অটল।

উপবাস তাঁহার একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ কিছু কাবু তিনি তাহাতে হইয়াছেন এমন মনে হয় না। কষ্ট যেটুকু হইয়াছে 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল পাড়িয়া তিনি সেটুকু একরকম লাঘব করিয়া লইয়াছেন। আজ কিন্তু এত দিন বাদে তাঁহাকে যেন ক্লান্ত দেখায়— ছোট ওই এক ফোঁটা মেয়ের হাতে অপমানটা তাঁহার বেশি বাজিয়াছে মনে হয়। আর সকলে উত্তেজিত হইয়া ওই কচি মেযের শযতানী বুদ্ধি, তাহার কলঙ্কিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অনেক কথা লইযাই আলোচনা করে!

"আঁতুডেব গন্ধ গা থেকে যায়নি, মেয়েটার কথা শুনলে গা!"

"কচি দাঁতে এত বিষ, বড হ'লে ও কত সংসারে আগুন দেবে মা কে জানে!"

"ওই একরত্তি, আমাদের নাতনীর বয়সী মেয়ে— দিনকে একেবারে রাত ক'রে দিলে গা!"

"কে জানে মা, মা-গঙ্গার কি মহিমে! নইলে এত পাপও তিনি স'ন।"

কিন্তু দাক্ষাযণী এ-সমস্ত আলোচনায যোগ দেন না; এমন কি 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল দিতেও আজ তিনি ভুলিযা যান।

দুই দিন পরের কথা। শতমুখী পিছনে ফেলিযা নৌকা ধবলাটের কাছাকাছি আসিয়া নোঙর করিযাছে। কুযাসাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত রাত্রে তীরতট কিছু দেখা যায না, শুধু নৌকার গায়ে গাঙের স্রোতের মৃদু আঘাতেব শব্দ শোনা যায। আকাশ ও জল অন্ধকারে একাকার হইযা গিয়াছে, তাহারই মাঝে শুধু দূরে দূরে সাগরমুখী চলমান কয়েকটি নৌকার ক্ষীণ আলো দেখিয়া গাঙের সীমা নির্ণয় করা চলে। সংকীর্ণ জায়গায় আর সকলের মতো আড়ষ্ট হইয়া ঘুমাইতে দাক্ষায়ণী পারেন না। একাকী জাগিযা তিনি ছই-এর ছিদ্রপথে গাঙের কালো

জলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জলের শব্দ যেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যায় নোঙর ফেলিবার সময় মাঝিদের কথাবার্তা তাঁহার কিছু কানে গিয়াছিল— তাহাদের কথাতেই শুনিয়াছিলেন— এখানকার জোয়ার বড় প্রবল, তখন নৌকা না সামলাইলে বিপদের সম্ভাবনা।

সহসা তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন— এই জোয়ার নয় ত'? কিন্তু মাঝিরা সবাই ত' ঘুমাইতেছে। যদি কোন বিপদ ঘটে!

জলের শব্দ ক্রমশঃ আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মাঝিদের ডাকা উচিত কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় ভীষণ শব্দ করিয়া ছোট নৌকাটি উন্মত্তভাবে দুলিয়া উঠিল।

জোয়ারের টানে বেহাল হইয়া প্রকাণ্ড এক মহাজনী ভড় ছোট নৌকাটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

পলকের মধ্যে ভীত সদ্যসুপ্তোত্থিত মাঝি ও যাত্রীদের চিৎকারে, নৌকার তক্তাগুলির প্রচণ্ড বিদারণ-শব্দে অন্ধকার নদীবক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। কোথা দিয়া সেই নিদারুণ মুহূর্তে কি যে হইয়া গেল— দাক্ষায়ণী কিছুক্ষণের জন্য এক-প্রকার জ্ঞান হারাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। খানিক বাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন নদীর হিম-শীতল জলে তিনি কেমন করিয়া ভাসিতেছেন। সামনে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল দৈত্যের মতো বৃহদাকার ভড়ের কালো ছায়ামূর্তির সঙ্গে তাঁহাদের নিষ্পেষিত নৌকাটি যেন জড়াইয়া গিয়াছে।

হাল ভাঙিয়া পানিতরাস চৌচির হইয়া সে-নৌকা ডুবিতেছিল।

ছেলেবেলা সাঁতারের অভ্যাস ছিল। দাক্ষায়ণী দেখিলেন এখনও ভাসিয়া থাকিতে তাঁহার কষ্ট হয় না। ভড়ের মাঝিমাল্লারা এই বিপদে ছুটাছুটি করিয়া হল্লা করিতেছিল, চিৎকার করিয়া একবার তাহাদের ডাকিলেন, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল বলিয়া মনে হয় না।

প্রৌঢ়বয়সে এই হিম-শীতল জলে বেশিক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন এমন আশা দাক্ষায়ণীর ছিল না। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের গাঙের কুমিরের কথাও তিনি জানিতেন— ভাসিয়া থাকিলেও কতক্ষণ আর রেহাই পাইবেন!

এমন সময় দৈব খানিকটা কৃপা করিল। ভাঙা নৌকার হালটা সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারে প্রথমটা তাহার কালো মূর্তি দেখিয়া

দাক্ষায়ণী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন সেটা কাঠ। সবলে সেটিকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

কিন্তু এটা কি? পুঁটুলির মতো কী একটা জিনিস হাতে ঠেকিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

পুঁটুলি হইতে অস্ফুট একটা ভীত শব্দও যেন বাহির হইল।

মুখটা একটু কাছে লইয়া গিয়া ভালো করিয়া নজর করিয়া চাহিতেই সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ভীত কাতর দুটি চক্ষু মেলিয়া বেশ্যাদের সেই মেয়েটা প্রাণপণে হালের একদিক আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই নিদারুণ মুহূর্তেও তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঘৃণায় দাক্ষায়ণীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভড়ের উপরকার মাঝিরা তখন কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া বোধ হয় নিমজ্জমান যাত্রীদেরই অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার অস্পষ্ট আলোয় সেই অসহায় মেয়েটার মুখ দেখিযাও বিন্দুমাত্র অনুকম্পা তাঁহার হইল না। বিযাক্ত সরীসৃপ-শিশুর মতো এ একদিন বড় হইয়া সংসারকে পাপের বিষে জর্জর করিয়া তুলিবে এমনি একটা অস্পষ্ট চিন্তায় তাঁহাব মন বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় কান্না, দুর্বল দুটি হাতে প্রাণপণে হালটিকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, এ-সমস্ত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া সবলে তিনি তাহাকে জলে ঠেলিযা দিলেন।

মেয়েটা 'মাগো' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, খানিকটা ডুবিয়া জল খাইয়া নাকাল হইয়া ক্ষীণ দুটি বাহু তুলিয়া তাঁহার হাতটা ধরিবার একবার নিস্ফল চেষ্টা করিল, তাহার পর আবার ডুবিল— মশালেব আলোয় ঈষৎ রক্তাভ নদীর কালো জল তাহার শেষ চিৎকারের মাঝখানে যেন সহসা নিস্তব্ধতার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মেয়েটার সেই শেষ অর্ধস্ফুট চিৎকারে দাক্ষায়ণীর মনে কি যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল। ডুবিবার আগে তাহার সে ভীত সকাতর মুখের মিনতি ভুলিবার নয়। কলঙ্কিত একটা বেশ্যার মেয়ে— শিরায় শিরায় তাহার পাপের পঙ্কিল রক্ত; বাঁচিযা সে শুধু সংসারের পাপের ভারই বাড়াইত না, নিজেরও তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, এসব ভাবিযা আর তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না। তখনও যেন অস্পষ্টভাবে তাহার কাপড়ের একাংশ জলের উপর ভাসিতে দেখা যাইতেছিল। এখনও হয়তো তোলা যায়। কিন্তু অবশ দেহমনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়াও যে

সহজ নহে। দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দাক্ষায়ণী উন্মত্তের মতো হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে মেয়েটার মাথাটা ভাসিয়া উঠিল।

দাক্ষায়ণী ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু জলের ভিতর হাতড়াইয়া কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কয়দিনের উপবাসে দুর্বল বাতগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতক্ষণ শীতল জলে থাকার দরুন ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিতেছিলেন। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিলেন— হাতের মুঠায় কি যেন একটা ধরিয়াছেনও মনে হইল, কিন্তু তখন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাগালের অত্যন্ত কাছে কালো হালের কাঠটা তখনও ভাসিতেছিল, দাক্ষায়ণী হাত বাড়াইয়া সেটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন— হাত তাঁহার উঠিল না। মুঠায় যাহা ধরিয়াছিলেন, সেইটাই তাঁহার আড়ষ্ট হাতে জড়াইয়া রহিল।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু দাক্ষায়ণীর কপালে নাই।

জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনিতে পান নিকটে কাহারা বলিতেছে— "তাইতেই না বলে মায়ের প্রাণ!"

দুর্বল দেহে অবসন্ন মনে কথাটার কোন তাৎপর্য তিনি বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার উৎসাহও তাঁহার থাকে না। সারা দেহে অসীম ক্লান্তি অনুভব করিয়া দাক্ষায়ণী আবার ঝিমাইয়া পড়েন।

কিন্তু সকালবেলা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠেন। সামান্য যেটুকু দুর্বলতা থাকে তাহা এমন-কিছু মারাত্মক নয়।

তিনি যেখানে শুইয়া আছেন, সেটা যে কোন নৌকারই একটা ঘর তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। ডান পাশেব খুদরি জানালা দিয়া দিগন্ত-প্রসারিত জলরাশির উপর প্রভাতসূর্যের আরক্ত জাগরণ প্রথমেই চোখে পড়ে। নৌকার এ-ঘর তাঁহার অপরিচিত। জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে কোনরকমে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন, এইটুকুই শুধু বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত নৌকায় স্থান পাইয়াছেন, কে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিছুই তাঁহার স্মরণ হয় না।

অপরিচিত এক বৃদ্ধ মাঝি আসিয়া একগাল হাসিয়া বলে— "মা-গঙ্গার খুব

কিরূপা বলতে হবে মাঠাকরুন, নিতে নিতে ফিরিয়ে দেছেন। আর একটু দেরি হ'লে দু'জনের কাউকে তুলতে পারা যেতনি।"

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকজন মাঝিমাল্লা দরজার কাছে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়।

একজন বলে, "মেয়েটা যা জল খেয়েছেল, বাঁচবে ব'লে আর আশা ছেলনি। মাঠাকরুনের খুব পুণ্যি ছেল তাই!"

বৃদ্ধ মাঝি বলে— "যা জম্পেস ক'রে তেনার কাপড়টা ধরেছেলেন মাঠাকরুন, আমি ত' পেরথমে ছাড়াতেই নারলুম।"

আর একজন বলে— "তা জম্পেস ক'রে ধরবেনি? মায়ের প্রাণ ত' বটে!"

কে একজন ইতিমধ্যে মেয়েটাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলে, "নেন মাঠাকরুন, মেয়েকে আপনার একদম চাঙ্গা ক'রে দিছি।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ নির্বাক হইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, এইবার কিন্তু বিস্ময়ের তাঁহার সীমা থাকে না। বেশ্যাদের সেই মেয়েটাকেই তাঁহার কন্যা ভাবিয়া ইহারা তাঁহার কোলের কাছে বসাইয়া দিয়াছে!

মেয়েটা সভয়ে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া থাকে। দাক্ষায়ণী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া মাঝিদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য বলেন— "ও ত' আমার মেয়ে নয়।"

মাঝিরা সবাই হাসিয়া ওঠে। বুড়া মাঝি হাসিয়া বলে— "ঠিক বলেছেন মাঠাকরুন, ওটা কুড়োনি মেয়ে, গঙ্গার জলে ওটাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি— কি বলিস্ খুকী!"

খুকী মাথা নোয়াইয়া একেবারে বিছানার সঙ্গে যেন মিশাইয়া যাইতে চায়। দাক্ষায়ণী মাঝিদের কথার ধরনে সহসা ভীত হইয়া ওঠেন, তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন— "ও যে সত্যি আমার মেয়ে নয়।"

কিন্তু কে সেকথা শুনিতেছে! তাঁহার মুখের ভাবই বা কে লক্ষ্য করে। বাতাসি তখন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। বুড়া মাঝি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলে— "আরে এটা কি পাগ্‌লি মেয়ে, তামাসা বোঝে না! তুইও বল্‌না কেন, তুমি আমার মা নও!"

দাক্ষায়ণী বিহ্বলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকান। ইহাদের এ অদ্ভুত ধারণা কোথা হইতে জন্মিল, কেমন করিয়াই বা এ-ধারণা তিনি দূর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না।

বাতাসি কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ মাঝির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায়। দাক্ষায়ণী ক্লান্ত মনে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়েন।

ধবলাট বেশি দূরে নয়। দুপুর নাগাদ মহাজনী ভড় হইতে মাঝিরা সেখানে তাঁহাদের নামাইয়া দেয়। ইহার পর তাহাদের অন্যদিকে যাইতে হইবে। সুতরাং আর বেশি তাহারা তাঁহাদের লইয়া যাইতে পারিবে না।

বৃদ্ধ মাঝি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া বলে, "হুকুম নেই মাঠাকরুন, নইলে আপনাদের গঙ্গাসাগর অবধি পৌছে দিতুম। তবে ধবলাট হয়ে হামেশা গঙ্গাসাগরে নৌকা যাবে মা— তার একটায় চেপে বসবেন।"

দাক্ষায়ণী অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে ভড়ের উপর হইতে নদীর পাড়ে ফেলা তক্তার উপর দিয়া নামিয়া যান।

বৃদ্ধ মাঝি ডাকিয়া বলে— "মেয়েটার হাতটা ধ'রে নেন মাঠাকরুন, বড় পেছল।"

যন্ত্রচালিতের মতো দাক্ষায়ণী বাতাসির হাতটা ধরিয়া তীরে ওঠেন।

এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে ঝড় গিয়াছে তাহাতে বিমূঢ় হওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়। মাঝিদের কাছেই খবর পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নৌকার দু'একজন মাল্লা ছাড়া আর কেহই বোধ হয় রক্ষা পায় নাই। তাঁহার একই গ্রাম হইতে তাঁহার যে-সব সঙ্গী সাথী আসিয়াছিল তাহারা সবাই নৌকার মাঝে বন্দী হইয়া অতিশোচনীয় ভাবে ডুবিয়া মরিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহাদের দু'জনের যে মা ও মেয়ের সম্বন্ধ, এই ভুল তাহাদের আরও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ভাঙা সম্ভব হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে ভাঙা হালের উপর হইতে মেয়েকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছে; এবং সন্তানের জন্য ছাড়া মানুষ এমন কাজ করিতে পারে,

একথা তাহারা বিশ্বাস করে কেমন করিয়া! বৃদ্ধ মাঝি হাসিয়া বলিয়াছে—“নাড়ীর টান বড় টান মাঠাকরুন, ও কি আর লুকোবার জো আছে।”

মহাজনী ভড়-এর মাঝিরা পাটা তুলিয়া ধীরে ধীরে আবার নৌকা ছাড়িয়া দেয়। সে-নৌকা দূরে অদৃশ্য হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাক্ষায়ণী বিমনা হইয়া বাতাসির হাত ধরিয়া তীরে দাঁড়াইয়া থাকেন। তারপর সহসা সচেতন হইয়া সজোরে মেয়েটার হাত তিনি দূরে ছুঁড়িয়া দেন। তাঁহার গঙ্গাসাগর যাত্রার পথের সমস্ত দুর্ঘটনার দরুন ক্ষোভ ও রাগ এই মেয়েটার উপর গিয়া পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্যন্ত তিনি পারেন না।

বাতাসিকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া নিজের দুশ্চিন্তায় তন্ময় হইয়াই তিনি আগাইয়া চলিতে থাকেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার বড় কম নয়। কোমরের থলেতে বাঁধা পাথেয়র টাকা তাঁহার জলে ডুবিয়াও খোয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু হাজার শক্ত হইলেও অপরিচিত স্থানে একা মেয়েমানুষ হইয়া, গঙ্গাসাগর দূরের কথা, দেশে ফিরিবার ব্যবস্থাই কেমন করিয়া করিবেন তাহা ভাবিয়া দাক্ষায়ণী আর কূল পান না।

সামনে কতকগুলি বড় বড় আটচালার চারিপাশে অনেকগুলি লোক জড়ো হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরই অনুনয় বিনয় করিয়া একটা-কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া দাক্ষায়ণী চলিতে থাকেন। হঠাৎ ধপ্ করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়। মেয়েটা এতক্ষণ বুঝি তাঁহার পিছু পিছুই আসিতেছিল, মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত কটুকণ্ঠে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে গিয়া দাক্ষায়ণী সহসা চুপ করিয়া যান। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো একটা খোলামকুচিতে লাগিয়া মেয়েটার পা কাটিয়া একেবারে ঝুঁজিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ইহার পর তাহাকে ধরিয়া তুলিতেই হয়। মেয়েটা অশ্রুসিক্ত ভীত মুখটা নিচু করিয়া আতকষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়। মাত্র দু'দিন আগে সে জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছে। ছোট মেয়ে, শরীর তাহার এখনও অত্যন্ত দুর্বল। হাত ধরিয়া তুলিয়া দাক্ষায়ণী দেখিতে পান পা দু'টি তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন— “হাঁটতে পারবে না?”

যত দোষই থাক, মেয়েটি নির্বোধ নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার

একান্ত নিঃসহায় অবস্থাটা তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতখানি সম্ভব সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের সহিত তাহার পরিচিত মেয়েদের তফাৎ যে কত তাহাও সে কিছু কিছু জানে। দুই দিন আগে যাঁহাকে সে অপমান করিয়াছে, আজ তাঁহারই অনুকম্পা তাহার একমাত্র সম্বল, এইটুকু যত অস্পষ্টভাবেই হউক বুঝিয়া সে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ভয় পায়।

ধরা-গলায় মাথা নিচু করিয়া সে জানায় যে হাঁটিতে পারিবে, কিন্তু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া দুই পা যাইতে না যাইতেই দুর্বলতায়-মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়ে। দাক্ষায়ণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিযা ফেলেন।

এইবার তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই, কিন্তু দাক্ষায়ণীর চিরজীবনের সংস্কারে এই অশুচি মেয়েটাকে অমন করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত বাধে। মেয়েটার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া যেটুকু মায়া তাঁহার হইয়াছিল, তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতে হওয়ার সম্ভাবনায় সেটুকু একেবারে উবিয়া গিয়া শুধু বিতৃষ্ণাতেই তাঁহার মন তিক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয়, মেয়েটা ছেনালী করিয়া অজ্ঞান হইবার ভান যে করে নাই, তাই বা কে বলিতে পারে। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া তিনি সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাতাসির সত্যই তখন জ্ঞান নাই। সে তাঁহার গায়ে লতাইয়া পড়ে। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে লইতেই হয়; এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে জীবনের কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে এই শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাই বোধ হয় বিধাতার কাছে তিনি প্রশ্ন করেন। দূর হইতে তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া দুই একটা লোক আপনা হইতেই আগাইয়া আসে। দাক্ষায়ণী সংক্ষেপে তাহাদের কাছে নৌকাডুবির কথা জানাইয়া সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাতাসি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন না; করা যে নিষ্ফল এটুকু তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। হাতে হাতে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে তাঁহার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া একজন বলে—"তবু ভগবানের দয়া বলতে হবে বাপু, মা মেয়ের একজনকে রেখে আরেকজনকে নেন নি। কি সর্বনাশই তাহ'লে হ'ত!"

সে-রাত্রের মতো গঞ্জের এক ব্যাপারীর ঘরে তাঁহাদের আশ্রয় মিলিল। ঠিক হইল, পরদিন সাগরগামী কোনো নৌকায় তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হইবে।

পৌষ মাসের শীত। গরম কাপড় যাহা ছিল, নৌকার সঙ্গেই সমস্ত

ডুবিয়াছে। ব্যাপারীরা দয়া করিয়া একটা পাতিবার কাঁথা ও একটা কম্বল জোগাড় করিয়া দিয়াছে— মায়ে-ঝিয়ে কোনরকমে তাহাতে রাত কাটাইতে পারিবে ইহাই তাহাদের ধারণা।

হোগলায় ছাওয়া নাতিবৃহৎ মাটির ঘর এক কোণের মৃদু একটি কেরাসিনের বাতির শিখায় ভালো করিয়া আলোকিত হয় নাই। তাহারই একধারে জড়সড় হইয়া বসিয়া বাতাসি শীতে কাঁপিতেছিল। দুর্বল শরীরে ঘুম তাহার অনেকক্ষণ হইতেই পাইয়াছে; কিন্তু হোঁচট খাইয়া অজ্ঞান হইবার পর প্রথম চোখ খুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখের যে-চেহারা সে দেখিয়াছে, তাহার পর তাঁহার সামনে এতটুকু নড়িয়া বসিবার সাহসও তাহার নাই। লোলুপ দৃষ্টিতে উষ্ণ কম্বলটার দিকে তাকাইয়া সে তাই সভয়ে চুপ করিয়া বসিয়াই ছিল।

শীত দাক্ষায়ণীরও করিতেছিল; কিন্তু কম্বল গায়ে দিতে গেলে মেয়েটাকেও ডাকিতে হয়; এবং সমস্ত রাত ওই অপবিত্র মেয়েটার সঙ্গে শুইবার কল্পনায় তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিতে পারিতেছিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত শুষ্ককণ্ঠে তিনি বাতাসিকে ডাকিয়া বলিলেন— "ব'সে ব'সে কাঁপবার কি দরকার! এসে শোও না!"

এ-আদেশের ভিতর মমতার লেশমাত্র নাই, এটুকু বাতাসির পক্ষে বোঝা বিশেষ কঠিন নয়; তবু সসঙ্কোচে সরিয়া আসিয়া বিছানার একপ্রান্তে কম্বলের এক অংশ মাত্র গায়ে দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

দাক্ষায়ণী তাহার গায়ের উপর কম্বলেব অন্য দিকটা ছুঁড়িয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিলেন— "আবার অত ঢঙ কেন? ও-কম্বল আমি ছোঁব না। ভালো ক'রে গায়ে দাও।"

বাতাসি কম্বলটা আর একটু টানিয়া লইল, কিন্তু ভালো করিয়া গায়ে দিতে পারিল না।

বাহিরের শীত ও নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাক্ষায়ণী আরও অনেকক্ষণ জাগিয়া কাটাইলেন— বাতাসি ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িযাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিছানার এক পাশে বাতাসির কাছ হইতে সযত্নে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহাকে শুইতে হইল। কম্বলের একপ্রান্ত গায়ে দিয়া মনে মনে গঙ্গা-সাগরে গিয়া স্নান করিয়া এই অশুচিতা দূর করিবেন ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

তারপর কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন— মনে নাই। ভোর রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

বাতাসি কখন ঘুমের ঘোরে সরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের কাছটিতে ঘেঁসিয়া আসিয়া শুইয়াছে— তাহার একটি হাত তাঁহার কণ্ঠে শিথিলভাবে লগ্ন।

কেরাসিনের ডিবিয়াটা তখনও তেমনি জ্বলিতেছে। তাহার রক্তিম আলোয় মেয়েটার দিকে চাহিয়া, ওই কোমল মুখ হইতে সেদিন কি করিয়া অমন কুৎসিত কথা বাহির হইয়াছিল, কিছুতেই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। সে-মুখে সংসারের ভাবী সর্বনাশিনীর কোন আভাসই নাই।

তবু বহুদিনের সংস্কারে শরীরটা তাঁহার কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে-ছিল; কিন্তু কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও সরাইতে তিনি কেন জানি না পারিলেন না।

সকালে ঘুম ভাঙার পর দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে বাতাসি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘুমন্ত চোখ খুলিয়া প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল কম্বলটি তাহার গায়ে বেশ ভালো করিয়া জড়ানো। দাক্ষায়ণী ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কি যেন করিতেছেন।

হয়তো সারা রাত্রিই সে কম্বল ও বিছানা দখল করিয়াছিল— দাক্ষায়ণীকে হয়তো সারা রাত্রিই এই শীতে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে ভাবিয়া সে ভয়ে ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল। দাক্ষায়ণী হাত নাড়িয়া তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন— "থাক্ থাক্! সকালের এই হিমে উঠে কাজ নেই। হাড় একেবারে কালিয়ে দিচ্ছে।"

তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি শুয়ে থাক, আমি এক্ষুনি আসছি, কিছু ভয় নেই।"

বাতাসি সবিস্ময়ে আবার শুইয়া পড়িল। দাক্ষায়ণীর স্বরে অপ্রত্যাশিত যে স্নেহের আভাসটুকু ছিল, তাহাতেই অকারণে বাতাসির কান্না যেন নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিল। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দাক্ষায়ণী খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল কোথা হইতে ইহারই মধ্যে কোঁচড়ে ভরিয়া মুড়ি ও গোটাকয়েক মোয়া তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

হাসিয়া বলিলেন, "খুব খিদে পেয়েছে— না? নে— তাড়াতাড়ি এবার উঠে মুখটা ধুয়ে আয় দিকি!"

তারপর দরজার কাছে গিয়া সামনের উঁচু পাড়-দেওয়া পুকুরটা দেখাইয়া বলিলেন— "ওই যে সামনে পুকুর! একলা যেতে পারবি ত'! না— আমি যাব সঙ্গে?"

মৃদুস্বরে "পারব" বলিয়া বাতাসি চলিয়া গেল।

দাক্ষায়ণী পিছন হইতে আর একবার সাবধান করিয়া বলিলেন— "খুব সাবধানে নামিস্— ভারী পেছল কিন্তু!"

দুপুরবেলা সাগর যাইবার নৌকা পাওয়া গেল। দাক্ষায়ণী ইতিমধ্যে গাঙের জলে ভালো করিয়া স্নান করিয়া মেটে হাঁড়িতে সামান্য ভাত ডাল ফুটাইয়া বাতাসিকে খাওয়াইয়া নিজেও কিছু খাইয়া লইয়াছেন। রান্নার ব্যাপারে বাতাসির সাহায্য তিনি কিছু গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু আগাগোড়া দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত সহজে অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ব্যবহারে সাহস পাইয়া বাতাসি মুখ খুলিতে দ্বিধা করে নাই। রান্নার জায়গা হইতে একটু দূরে বসিয়া আগাগোড়া সে নিজে হইতে অনেক কথাই কহিয়াছে— ঝাল সে মোটে খাইতে পারে না, যে-লঙ্কাগুলি ছোট হয় সেগুলির ঝাল বেশি ইত্যাদি—

দাক্ষায়ণী একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, "যেমন তুই!"

ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বাতাসি মুখ নিচু করিয়াছে।

তারপর একটু দূরে দূরে কলাপাতা করিয়া খাইতে বসিয়াও তাহাদের কম কথা হয় নাই।

দাক্ষায়ণী স্নান করার পর ভিজা কাপড়েই রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

বাতাসি জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "ভিজে কাপড়ে শীত করছে না?"

দাক্ষায়ণী একটু হাসিয়া বলিয়াছেন, "শীত করলে আর কি করছি বল্! তুই ত' একটা কাপড় দিবি না।"

বাতাসি বলিল, "আমার কাপড় যে সব ডুবে গেছে।"

"তা না হ'লে দিতিস্— কেমন?"

বাতাসি লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারে নাই। খানিক বাদে কিন্তু,

তাহার ভালো ডুরে কাপড়টা পরিয়া থাকিলে যে তাহা হারাইত না, ঘরে তাহার যে সত্যকার সিল্কের একটা কাপড় আছে, ইত্যাদি অনেক কথাই সে গল্প করিয়াছে।

এই গল্পের সম্পর্কে বাতাসির জীবনের আবেষ্টনের কথা বারে বারে স্মরণ হওয়ায় দাক্ষায়ণী একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাতাসির উপর আগেকার বিরাগ তাঁহার কখন দূর হইয়া গিয়াছে তিনি জানিতেও পারেন নাই।

কিন্তু এত মসৃণভাবে এই দু'টি কক্ষভ্রষ্ট প্রাণীর সম্বন্ধ বেশিক্ষণ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে ভরসা পাইয়া বাতাসির ভয় ও আড়ষ্টতা ক্রমশঃ দূর হইয়া আসিতেছিল।

সাগরে যাইবার নৌকায় উঠিবার সময় হঠাৎ সে মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় দোলাইয়া তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল— "আর নৌকোয় উঠতে পারিনে বাবা! জল যেন আমার দু'চক্ষের বিষ! বলে, আর জলে যাব না সই···"

কিন্তু ওই পর্যন্ত বলিয়াই দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মুখের কথা আটকাইয়া গেল— ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

দেখা গেল দাক্ষায়ণীর মুখ এক মুহূর্তে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বারেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হন্ হন্ করিয়া তিনি সোজা নৌকার উপর উঠিয়া গেলেন— বাতাসি উঠিতেছে কি না একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

নিজেকেই তিনি বোধ হয় মনে মনে ধিক্কার দিতেছিলেন। কেউটের ছানার আসল রূপ সমস্ত আবরণের তলা হইতে সহসা প্রকাশ যদি হইয়া থাকে, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ-মেয়েটির শুধু মুখখানি দেখিয়া খানিকক্ষণ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন কেমন করিয়া!

দাক্ষায়ণীর সমস্ত শরীর মেয়েটার কদর্য ভঙ্গি স্মরণ করিয়া রি-রি করিতেছিল। দেহে ও মনে তাহার কত দিনের কত মানুষের পাপের ক্লেদ যে সঞ্চিত হইয়া আছে, কে জানে! আর তিনি খানিকটা আগে ইহারই সঙ্গে

কিনা হাসিয়া কথা কহিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, একটু মায়াই তাঁহার মেয়েটার উপর পড়িতে সুরু হইয়াছিল।

তাঁহার পবিত্র পিতৃ ও শ্বশুরকুল স্মরণ করিয়া দাক্ষায়ণী মনে মনে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গাসাগরে নামিয়াই এই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনের একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে ভুলিলেন না।

অত্যন্ত হতাশ মনমরা ভাবে বাতাসি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল— চোখ দুইটা তাহার জলে তখন ছলছল করিতেছে। কিন্তু দাক্ষায়ণী দেখিয়াও তাহাকে দেখিলেন না।

বাতাসি তাহার সামান্য বুদ্ধিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বড় মহাজনী নৌকা— মাঝিমাল্লা ও তাঁহারা দুইজন ছাড়া যাত্রী একটিও নাই— গঙ্গাসাগরে দোকান খুলিবার জন্য তাহারা নৌকা-বোঝাই মাটির খেলনা পুতুল ইত্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

শুধু দাক্ষায়ণীকে কথা কহাইবার জন্যই অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সে একবার সেই পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া বলিল— "আমার ওই রকম একটা টিয়াপাখি আছে— ওর চেয়েও বড়!"

কিন্তু দাক্ষায়ণী যেমন চোখ বুঁজিয়া শুইয়া ছিলেন, তেমনিই রহিলেন— ঘুমাইতেছেন কি জাগিয়া আছেন বোঝা গেল না।

বাতাসি আর একবার সভয়ে বলিল, "এ নৌকোটা খুব বড়! বড় নৌকো ডোবে না— না?"

দাক্ষায়ণী তেমনি নিরুত্তর।

বাতাসি আর একবার হতাশভাবে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল— "আমি খুব ভালো পা টিপতে পারি!"

কিন্তু পায়ে হাত দিতেই পা-টা সরাইয়া লইয়া দাক্ষায়ণী গম্ভীরভাবে বলিলেন— "থাক্!"

অপরাধীর মতো সসঙ্কোচে হাতটা সরাইয়া লইয়া বাতাসি বিষণ্নমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল— দাক্ষায়ণীর প্রসন্নতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আর কি করা যায় কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না।

চাপা-কান্নায় গলার কাছটায় কি একটা জমাট বাঁধিয়া তাহার নিশ্বাস যেন

রোধ হইয়া আসিতেছিল। ভালো করিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি তাহার খানিকটা তৃপ্তি হইত, কিন্তু সে-সাহস তাহার হইল না। শুধু দু'টি গাল বাহিয়া নীরবে অজস্রধারে যে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সে কোনমতেই নিবারণ করিতে পারিল না।

ধবলাট হইতে গঙ্গাসাগর বেশি দূরে নয়। পালে ভালো হাওয়া পাইয়া তাহাদের নৌকা খুব তাড়াতাড়িই চলিয়া আসিয়াছে। এখন বারদরিয়ার সামান্য একটু অংশ পার হইলেই হয়। কিন্তু এত দূর এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আসিবার পর এইখানেই এমন বিপদ ছিল তাহা দাক্ষায়ণী জানিতেন না।

নৌকায় উঠিবার পর অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। তাহার পর বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উঠিয়া মাঝিদের কাছে গঙ্গাসাগরে থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইয়াছে। সঙ্গের সাথী কেহ নাই— একাই তাঁহাকে সব-কিছু করিতে হইবে। নিজে একলা হইলেও যা হোক ভাবনা ছিল না; সঙ্গে আবার এই মেয়েটা জুটিয়াছে— দাক্ষায়ণীর একটু দুর্ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

মেয়েটা এতক্ষণ ধরিয়া বরাবর তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহার দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

কিছুক্ষণ হইতে নৌকা একটু দুলিতেছিল। আপাতত নৌকার কামরার বাহিরে আসিয়া তাহারই কারণ তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ের তলা হইতে নৌকাটা যেন মনে হইল সবেগে সরিয়া যাইতেছে। বাতাসি "মাগো" বলিয়া চিৎকার করিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সামনে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ভীত পাংশু মুখে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল— নৌকা আবার ডুবিতেছে।

মাঝিরা আসিয়া ধরিয়া না ফেলিলে আতঙ্কে তিনি কি যে করিয়া ফেলিতেন বলা যায় না। তাহারা একরকম জোর করিয়াই তাঁহাদের নৌকার কামরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া জানাইল যে, ভয় করিবার ইহাতে কিছুই নাই— সাগরের ঢেউ লাগিয়া নৌকা খানিকটা এইরূপ করিবেই।

কিন্তু দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে অত্যন্ত অবোধের মতো বলিলেন— "আমাদের না-হয় কোথাও নামিয়ে দাও বাবা! আমরা না-হয় হেঁটেই যাব।"

এখানে যে চারিধারে জল ছাড়া নামিবার কোথাও স্থান নাই, এবং থাকিলেও সেই জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে নামার অর্থ যে নিশ্চিত মৃত্যু, একথা মাঝিরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না। প্রত্যেক ঢেউ-এর দোলার সঙ্গে নিতান্ত নির্বোধের মতোই তিনি জেদ করিতে লাগিলেন— "আমার কাছে যা আছে সব নাও বাবা, আমাদের নামিয়ে দাও। জঙ্গল হোক যা হোক, শক্ত মাটি ত' বটে— আমরা যা হোক ক'রে হেঁটে পেরিয়ে যাব!"

অবশেষে কোনমতে বুঝাইতে না পারিয়া মাঝিরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের কাজে চলিয়া গেল।

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া দাক্ষায়ণী পাংশুমুখে সেই ঘরে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু বাতাসিকে বুক হইতে নামাইবার কথা বুঝি তাঁহার মনেই ছিল না।

গঙ্গাসাগরে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা নিরাপদেই পৌঁছিয়াছেন। যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী বালির উপরে হোগলার একটা ঘরও ভাড়া মিলিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিসের ব্যবস্থা ভালো; দাক্ষায়ণীকে কোন ব্যাপার লইয়া একলা হইলেও বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাতাসিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পান না।

মেয়েটা কয়েকদিনে যেন একেবারে নবজন্ম লাভ করিয়াছে। কে জানে আগেকার জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার গভীর হয়তো ছিল না! যে রকম সহজে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে, তাহাতে সেই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কে বলিবে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক তাহার নয়!

কখন হইতে যে বাতাসি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণীর স্মরণ হয় না; কিন্তু কেন বলা যায় না— এ-ডাক তাঁহার কোথাও আর বেঁধে না।

তাঁহার আগেই ভোর রাত্রে বাতাসি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ডাকে,— "বাঃ— এখনো ঘুমোচ্ছ! আজ সেই যে সূর্যি ওঠবার আগে কি করতে হয়

বলেছিলে না ?" তাহার পর দাক্ষায়ণীর সাড়া না পাইয়া আর একবার নাড়া দিয়া বলে— "ও মা, শুনছ ?"

দাক্ষায়ণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলেন— "তুই কি পাগল !—এখনো সূর্যি ওঠবার অনেক দেরি— নে শো !"

তাহার পর এক সময়ে তাহার গায়ে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিয়া বলেন— "ওমা, শিশিরে যে একেবারে ভিজে গেছে কম্বলটা। দেখি— গা ভেজেনি তো।"

"না গো না, গা ভিজবে কেন, নিচে আবার একটা চট্ দিয়ে দিলে না শোবার আগে।"

দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইয়া বলেন— "নে তাহ'লে শুয়ে পড়্।"

বাতাসির কিন্তু আর শুইবার ইচ্ছা নাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে— "বাবা, ওই বিশমুনি কম্বল আর চট্ গায়ে দিয়ে শুতে পারি না ! ওই তো সবাই উঠে পড়েছে, ওঠ না তুমি।"

শীতের ভিতর সহজে কম্বল ত্যাগ করিতে দাক্ষায়ণীর ইচ্ছা হয় না— চোখ বুঁজিয়াই বলেন— "বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না। ধরুক বৃষ্টি একটু।"

বাতাসি বলে— "আহা, ও বুঝি বৃষ্টি, চাল থেকে শিশিরের জল পড়ছে ত' !"

ব্যাপারটা সত্যই তাই ; হোগলার বেড়া-দেওয়া যাত্রীঘরগুলির চালও হোগলা দিয়া যেমন-তেমন করিয়া ছাওয়া। শীতের সারা রাত্রির শিশিরে তাহা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সেই চাল ভেদ করিয়াই শিশিরের জল চারিধারে বালির উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে ! অগত্যা দাক্ষাযণীকে উঠিতেই হয়। বলেন— "গঙ্গাসাগরের সব পুণ্যি তুই একাই ক'রে নিয়ে যাবি দেখছি !"

বাতাসি সলজ্জ হাসিয়া বলে— "আহা।"

গঙ্গাসাগরের থাকিবার দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে— দুই এক দিন দেরি করিলেও দেশে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। বাতাসিকে লইয়া তখন কি করিবেন, দাক্ষায়ণী কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

যত আপনারই সে হইয়া উঠুক— তাহার প্রতি মায়া যে বেশ খানিকটা পড়িয়াছে ইহা অসংকোচে নিজের মনে স্বীকার করিতে বাধা না থাকুক—

তাহাকে যে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাওয়া যায় না, এ-কথা দাক্ষায়ণী ভালো করিয়াই জানেন।

মিথ্যা তিনি বলিতে পারিবেন না। পরিচয় গোপন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্বশুরকুলের অপমান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। লোকে যদি কিছু সন্দেহ নাও করে, তবু জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের পবিত্র পরিবারে এই কলঙ্কিত-জন্মা মেয়েটিকে তিনি কেমন করিয়া স্থান দিবেন!

বাতাসিকে ছাড়িতেই হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া? এ-রকম অনাথ ছেলে-মেয়ের ভার কাহারা লয় কিছুই তাঁহার জানা নাই। জানা থাকিলেও, সেখানে বাতাসির অনিষ্ট হইবে না, এ-কথা তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস হইত না।

দুর্ভাবনায় দাক্ষায়ণীর সময় সময় মাথার ঠিক থাকে না।

বাতাসি কথা কহিয়া জবাব পায় না।

দাক্ষায়ণী হঠাৎ হয়তো রুক্ষ স্বরে বলেন—"জ্বালাতন করিসনি, ভালো-লাগে না বাপু! দু'দণ্ড সোয়াস্তি পাবার উপায় নেই, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তোকে নিয়ে।"

বাতাসি নীরব হইয়া যায়, শুধু চোখ দুইটা তাহার অল্পেই সজল হইয়া আসে।

খানিক বাদে কি ভাবিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া দাক্ষায়ণী আবার বাহির হইয়া পড়েন। এটা সেটা দেখাইয়া নানান গল্প করিয়া আবার বাতাসির মুখে হাসি ফুটাইতে তাঁহার দেরি লাগে না।

এক এক সময় তাঁহার মনে হয়, বাতাসির জন্য এত ভাবিবার দায়ই বা তাঁহার কিসের? কোথাকার কলুষিত সমাজের একটা মেয়ে, দৈবাৎ কয়েক দিনের জন্য তাহার জীবন তাঁহার সহিত জড়াইয়া গেছে মাত্র। এ-বন্ধনকে স্বীকার করিবার কোন দায়িত্বই ত' তাঁহার নাই। তাঁহার সঙ্গ না পাইলেও বিধাতার সংসারে তাহার একটা কোন কিনারা হইতই—আজ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গেলেও তাহার যেমন হোক একটা আশ্রয়ের অভাব হইবে না! আর পাপের পঙ্কের মধ্যে যে আশৈশব লালিত, তাহার পক্ষে আর আশ্রয়ের ভালো-মন্দ কি?

স্নানের যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মনে হঠাৎ অদ্ভুত এক খেয়ালের উদয় হয়।

এই গঙ্গাসাগরেই তাহাকে ফেলিয়া কোনরকমে লুকাইয়া তিনি ত' বেশ

চলিয়া যাইতে পারেন। যাহার সহিত অতীতে কোন সম্বন্ধ ছিল না, ভবিষ্যতে যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না, তাহাকে এ-ভাবে পরিত্যাগ করার ভিতর অন্যায়ও ত' কিছু নাই। সব সমস্যার অতিসহজেই তাহা হইলে মীমাংসা হইয়া যায়, দুর্ভাবনার গুরুভার নামাইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারেন।

ভিড় ঠেলিয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দাক্ষায়ণীর নজরে পড়ে বাতাসি তাঁহার পিছনে নাই! এই খানিক আগেও তাহাকে যে পিছু পিছু আসিতে তিনি দেখিয়াছেন। না, এ নির্বোধ মেয়েটাকে লইয়া আর পারা গেল না— পথ চলিতে চলিতে চারিদিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকা তাহার বদ্‌স্বভাব। একটু অসাবধান হইলেই সে পিছাইয়া পড়ে।

দাক্ষায়ণী খানিক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন। কিন্তু তবু বাতাসির দেখা নাই। এবার তাঁহার রাগ হয়। পই পই করিয়া এ কয়দিন তিনি তাহাকে রাস্তায় সঙ্গ-ছাড়া হইতে বারণ করিয়াছেন! অজানা অচেনা জায়গায় বয়স্ক লোকেরাই পথ চিনিতে হয়রান হয়। চারিদিকে একই ধরনের হোগলার কুঁড়ের সার— একটার সঙ্গে আর একটার কোন তফাৎ নাই। ইহার ভিতর একবার হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করা কি কম কষ্টকর

দাক্ষায়ণী একটু আগাইয়া যান। তবু বাতাসির পাত্তা নাই।

এবার তাঁহার ভয় হয়। হাবা মেয়েটা এই ভিড়ের ভিতর কোন্ দিকে যাইতে কোন্ দিকে গিয়াছে কে জানে! একলা ত' সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবেই না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও যে করিবে সে উপায়ও নাই। মাঝির নামেই এখানকার বসতির পরিচয়— সে-নাম ত' সে জানে না।

দাক্ষায়ণী চিৎকার করিয়া ডাকেন— "বাতাসি।"

সাড়া না পাইয়া তিনি আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। স্নান হইতে যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সুবিধা হয় না। দাক্ষায়ণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন।

·

শেষ পর্যন্ত বাতাসিকে সেদিন পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ঘোরার পর হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে একটা দোকানের ধারে কয়েকটা লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করিতেছে। ভিড়

সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই রোরুদ্যমানা বাতাসি একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

এতক্ষণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবার দাক্ষায়ণীর রাগে পরিণত হয়। ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া তিনি বলেন— "বলেছিলুম না, আমার হাত ছাড়িয়ে যাস্‌নি! আর যাবি একলা!"

আশপাশের লোকেরা তাড়াতাড়ি নিষেধ করিয়া বলে— "আহা মেরো না, মেরো না, মেয়েটা এতক্ষণ কেঁদে একেবারে সারা হয়েছে!"

একজন বলে— "কিন্তু কি হাবা মেয়ে তোমার মা! অতবড় মেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে কারু পরিচয় বলতে পারে না! শুধু বলে মার সঙ্গে এসেছি।"

বাতাসি কিন্তু এ-চড় বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে মুখ লুকাইয়া একসঙ্গে অশ্রু ও হাসিমাখা মুখে বলে—"তুমি এগিয়ে গেলে কেন?"

একটু নির্জনে আসিয়া দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করেন— "আচ্ছা, আজ যদি তোকে ফেলে পালিয়ে যেতুম?"

বাতাসি হাসিয়া বড় বড় চোখ দুইটা তাঁহার মুখের পানে পরম নির্ভরতায় তুলিয়া ধরিয়া বলে— "ঈস্।"

সেদিন রাত্রে বাতাসি আর কিছু খাইতে চাহিল না। একটু সর্দির সঙ্গে চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়াছে। দাক্ষায়ণী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন— একটু উত্তাপ আছে। খাওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি তিনি করিলেন না।

রাত্রে হোগলার ছাউনিতে হিম আটকায় না। ভালো করিয়া তাহাকে গরম রাখিবার জন্য দাক্ষায়ণী একটা বাড়তি কম্বল কিনিয়াই আনিলেন। কিন্তু দেখা গেল জ্বর তাহার বাড়িয়াছে।

সকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দাক্ষায়ণী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। দেহে অসহ্য উত্তাপ, মুখ চোখ ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হইয়া বাতাসি তখন ভুল বকিতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের স্থাপিত সেবাশ্রম্ হইতে একজন প্রতিবেশী দয়া করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া দিল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে দাক্ষায়ণীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল।

কঠিন নিউমোনিয়া! বাতাসিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

হাসপাতালের প্রতি দাক্ষায়ণীর আজন্ম অবিশ্বাস। তিনি কিছুতেই রাজি হইতে চাহেন না।

ডাক্তার বুঝাইল যে এ-রোগের জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেরূপ সতর্ক শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন তাহা দাক্ষায়ণীর অস্থায়ী আবাসে হওয়া অসম্ভব। মেয়েকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে হাসপাতালে দেওয়াই উচিত।

শেষ পর্যন্ত দাক্ষায়ণীকে বাতাসির কথা ভাবিয়াই রাজি হইতে হইল। স্বেচ্ছাসেবকরা আশ্বাস দিয়া গেল যে ভয়ের কোন কারণ নাই। থাকিতে না পারিলেও যখন খুশি তিনি সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন। তাঁহার মেয়ের শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না।

হাসপাতাল পর্যন্ত বাতাসিকে পৌছাইয়া আসিয়া দাক্ষায়ণী যখন পথে বাহির হন, তখন তাঁহার মনে হয়, তাঁহারও দেহ মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

আজ স্নানের দিন। অসংখ্য যাত্রী ঠেলাঠেলি করিয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। ভিড়ের ভিতর যন্ত্রচালিতের মতো তিনিও সেই দিকে চলেন; কিন্তু মনে হয়, এসব কিছুরই যেন তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। সামান্য একটা অপরিচিত মেয়ে কয়দিনের পরিচয়ে তাঁহার সমস্ত জীবনের ধারা যেন বদলাইয়া দিয়াছে। নিষ্ঠা, ধর্ম, পুণ্য কিছুরই যেন আর সে অর্থ নাই।

পদে পদে আজ ফিরিয়া বাতাসি আসিতেছে কি না দেখিবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডে দণ্ডে কাহারও অনর্গল প্রশ্নের জবাব দিতে আজ বিব্রত হইতে হয় না। স্নান করিতে গিয়া বেশি ডুব দিয়া ফেলিল কি না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বেশি দূরে গিয়া পড়িল কি না, সাঁতার কাটিবার নিষ্ফল চেষ্টায় পাশের কাহারও গায়ে জল ছিটাইয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটাইল কি না, এ-সব সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিবার দায় হইতে তিনি মুক্ত, নির্বিঘ্নে পুণ্য কাজ সারিবার কোন বাধাই আজ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয়, বুঝি পুণ্যের সব আকর্ষণও তাঁহার চলিয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া উঠিবার পর তাঁহার মন কিন্তু কতকটা শান্ত হয়। মনে হয়, মায়া তাঁহার যত বেশিই হোক, বাতাসির জীবন-দীপ যদি এমনি করিয়াই

নিভিয়া যায়, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু তাঁহার নাই। কিছু দিন বাদেই ত' তাঁহাকে যেমন করিয়া হোক ওই হতভাগিনী মেয়েটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইত, তাহার পর এই নিষ্ঠুর উদাসীন সংসারে, ওই অনাথ অসহায় মেয়েটির জীবন পাপ ও গ্লানির কোন্ অন্ধকার অতলে তলাইয়া যাইত কে বলিতে পারে! কলুষের মধ্যে যাহার জন্ম, পাপের বীজ যাহার মধ্যে হয়তো সুপ্ত হইয়া আছে, সংসারের বিষতরুরূপে পল্লবিত হইয়া উঠিবার পূর্বে এই নিষ্কলুষ শৈশবে বিধাতা যদি তাহাকে ডাকিয়া লন— তাহা হইলে দুঃখ করিবার সত্যই যে কিছুই নাই।

বাঁচিলে যখন অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসির মরাই ভালো।

কিন্তু স্নানের পর মেলার বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখা যায় দাক্ষায়ণীর দুই হাত খেলনায় ও পুতুলে বোঝাই।

বেলা যত বেশি বাড়িতে থাকে, দাক্ষায়ণী তত বেশি অস্থির হইয়া ওঠেন। এবং সমস্তক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনের ভিতর যে আলোড়ন চলে, তাহার খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারে না।

বাতাসির মরাই ভালো। কিন্তু সে মরিতেছে ভাবিয়া তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। তাঁহার বিশ্বসংসার ওই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া কখন হইতে ঘুরিতে সুরু করিয়াছে, তিনি জানিতেও পারেন নাই।

বিকাল হইতে না হইতেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত সংস্কারের চেয়ে যাহা পুরাতন— সমস্ত ধর্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বিধাতার কাছে বার বার আকুলভাবে বাতাসির জীবন-ভিক্ষা চাহিয়া তিনি মনে মনে বলিয়াছেন— বাতাসি তাঁহার বাঁচুক, তাহাকে লইয়া সমস্ত সংসারের নিন্দা, অপবাদের বোঝা তিনি নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া লইবেন। শ্বশুরবাড়িতে স্থান না হয় তিনি তাহাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ি বা যেখানে খুশি চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু আগে সে বাঁচুক।

কিছুক্ষণ আগে বাতাসির মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়াছিলেন বলিয়া নিজের প্রতি

তাঁহার ঘৃণার আর সীমা থাকে না। পথে যাইতে যাইতে অনেক কথাই তাঁহার মনে হয়। বাতাসির যে কলুষের মধ্যে জন্ম তারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য ভদ্র-পরিবারের ছোট মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে, একথা তিনি শুনিয়াছেন। বাতাসি যে তেমনি কোন সদ্বংশের মেয়ে নয়— তাই বা কে বলিতে পারে? সদ্বংশে জন্ম না হইলে এত শীঘ্র তাহার এমন পরিবর্তন হইত না, এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হয়। যে অপরাধ তাহার নয়, ভাগ্যের দোষে তাহারই শাস্তি তাহাকে সারাজীবন বহন করিতে হইবে, এ-কথায় এখন দাক্ষায়ণীর মন আর কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, হোক, বাতাসিকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া একাকী তিনি দেশে ফিরিবেন না, তাহাকে সঙ্গেই লইয়া যাইবেন এই তিনি সঙ্কল্প করেন।

প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া সাগরের যাত্রীদের হাসপাতাল বসানো হইয়াছে। দাক্ষায়ণী তাহার আশে পাশে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়াও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পান না।

কি যে শুনিতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিতে থাকে। অবশেষে অনেক কষ্টে একজন স্বেচ্ছাসেবককে তিনি ভয়ে ভয়ে বাতাসির খবর জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলেটি সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

"আপনি দেখতে চান ত' তাকে? একটু দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসি" — বলিয়া ছেলেটি চলিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়া যায়, ছেলেটির আর দেখা মেলে না। দাক্ষায়ণী ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওঠেন। কেন তিনি ইহাদের কথা শুনিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে রাজি হইয়াছিলেন ভাবিয়া তাঁহার আফসোসের আর সীমা থাকে না। ডাক্তার বলিয়াছিল— দেখা করিবার কোন অসুবিধাই হইবে না। এখন এই দেরি দেখিয়া ইহাদের সমস্ত ব্যাপারের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। কে জানে হয়তো ইহারা কোনো শুশ্রূষাই বাতাসির করে নাই। হয়তো রুগ্ন মেয়েটাকে অবহেলায় ইহারা ফেলিয়া রাখিয়াছে, তৃষ্ণায় একফোঁটা জল দিবারও সেখানে লোক নাই। দাক্ষায়ণীর মন রাগে দুঃখে দুর্ভাবনায় কেমন যেন করিতে

থাকে। ইচ্ছা হয়, এই কাপড়ের পর্দা ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া তিনি জোর করিয়া বাতাসিকে ছিনাইয়া লইয়া আসেন। বাতাসি ইহাদের ঔষধ না খাইয়াও বাঁচিবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পান, ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সেই ছেলেটি তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া পৌঁছিবার আগেই তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি থাকে না, কাঠ হইয়া তিনি কোনমতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পাথরের মতো নিস্পন্দ, সে-মুখ দেখিয়া তাঁহার বেদনার কোন পরিমাণই করা যায় না।

ডাক্তার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যাহা বলে তাহার সব কথা তাঁহার কানে যায় না, প্রয়োজনও নাই।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন। বাতাসিকে শেষ দেখা দেখিতে পর্যন্ত তিনি চাহেন না। ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে একটু আগাইয়া আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলে— "আর একটু দরকার আছে আপনাকে। আপনার মেয়ের দাহ আমরাই করব। একটু পরিচয় তাই দিয়ে যেতে হবে।"

দাক্ষায়ণী ফিরিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন— "পরিচয়?"

"হ্যাঁ, এই বয়েস, বাপের নাম— এই সব।"

দাক্ষায়ণী খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তারপর সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়বৌ, জীবনের সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা ভুলিয়া যাহা করিয়া বসেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুরকুলের চতুর্দশ পুরুষ সুদূর স্বর্গের সুখাবাসে শিহরিয়া ওঠেন কি না জানি না, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে জীবন-দেবতার মুখ বুঝি প্রসন্নই হইয়া ওঠে।

বলেন— "সব ত' মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।"

আকাশে বোমারু বিমানের গর্জন, পৃথিবীতে গোলা ও বোমার বিস্ফোরণ, বাঙলা দেশের হাওয়াতেও বারুদের গন্ধ। মহাযুদ্ধের এই বিভীষিকাময় আবহাওয়ায় বাঙলা দেশের সাহিত্যে হঠাৎ বই বা'র করবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। আগাছার মতো প্রকাশক গজিয়ে উঠেছিল ফাঁপানো টাকার বাজারে, চৈত্রের ঝরা পাতার মতো রাশি রাশি বই-এ সাহিত্যের আসর গেছ্‌ল ছেয়ে।

বই-এর সেই হট্টগোলে সাত নকলে আসল যে খাস্তা হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বেসুরো গলার সোরগোলে সুরের রেশ বেশির ভাগ চাপাই পড়ে গেছে।

তবু তেরশ' উনপঞ্চাশের বাঙলা দেশের সাহিত্যের আড্ডায় বৈঠকে, কখনো কখনো একটি নাম দু'চারজনের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। পতঞ্জলি রায় নামটি একটু অদ্ভুত ব'লেই শুধু নয়, ময়ূরাক্ষী নামে বইখানিও একেবারে অবহেলা ভরে উপেক্ষা করবার মতো নয় ব'লে। পতঞ্জলি রায় নামটা সাহিত্যের আসরে আগে কখনও শোনা যায়নি, মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠাতেও নয়। ময়ূরাক্ষীই লেখকের প্রথম প্রকাশিত বই। তবু রসিক-সমাজে যেটুকু কৌতূহল এই লেখক ও তার প্রথম রচনা সম্বন্ধে দেখা গেছ্‌ল, যে কোন নবীন লেখকের পক্ষে তা গর্বের কথা। সজনীকান্ত বসু থেকে বুদ্ধদেব দাস, মাণিক সেনগুপ্ত থেকে অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এমন বিভিন্ন বিশিষ্ট সাহিত্যরথীদের দৃষ্টি একটি মাত্র বই-এর সাহায্যে আকর্ষণ করা সত্যিই কম কথা নয়।

পতঞ্জলি রায়ের ময়ূরাক্ষী সাহিত্য-জগতের অভিনন্দনই শুধু পেয়েছিল এমন কথা বলছি না, ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যও বড় কম হয়নি।

'ময়ূরাক্ষী নামটা বড় রোম্যান্টিক কিন্তু' কেউ কেউ বলেছে, 'আসলে লেখককে এস্‌কেপিস্ট ছাড়া আমি কিছু বলতে রাজি নই।'

ময়ূরাক্ষীর কাহিনী সম্বন্ধে অম্ল-মধুর, কটু-তিক্ত, সবরকম সমালোচনাই অল্প-বিস্তর শোনা গেছে।

'রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার নামটা ও-ভাবে নেওয়া কিন্তু sacrilege' কারুর মুখে শোনা গেছে। কেউ-বা বলেছে, 'নামটা ধার নিলেও ক্ষতি ছিল না, যদি সুরটা পর্যন্ত না তার ওপর চুরি করা হ'ত।'

এ-সব বিরুদ্ধ মন্তব্য সত্ত্বেও, এমন কি এক হিসেবে এইগুলির দ্বারাই এই কথাটা অন্ততঃ বোঝা গেছে যে, ময়ূরাক্ষীর প্রতি প্রসন্ন না হতে পারলেও উদাসীন কেউ বড় থাকতে পারেনি।

দু'চারজন উদার ও রসিক সাহিত্যরথী অবশ্য ময়ূরাক্ষীকে উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন জানাতেও কুণ্ঠিত হ'ননি। কবি তারাশঙ্কর দত্ত স্বনামেই তাঁর কাগজে লিখেছেন, 'ময়ূরাক্ষী'কে উপন্যাস না ব'লে একটি সুদীর্ঘ লিরিক কবিতা বলাই উচিত। নিছক গদ্যে প্রায় দু'শ পাতার একটি লিরিক কবিতার সুর যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এ-বইখানি পড়বার আগে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বালির বিছানায় শোয়ানো একটি স্বচ্ছ ক্ষীণধারা নদী, তারই পাড়ে একটি থোপা থোপা ফুলে-ঢাকা প্রাচীন শিরিষ গাছ, আর একটি টালিতে ছাওয়া ভাঙা কুটীর নিয়ে এমন মধুর দিবা-স্বপ্ন যিনি রচনা করেছেন, মুগ্ধচিত্তে তাঁর কলমের তারিফ করবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু এইটুকু মন্তব্য না ক'রে পারি না যে— এই কি আমাদের স্বপ্ন দেখবার সময়। লেখকের পরিচয় আমাদের জানা নেই— কিন্তু আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে যে, এ-যুগের মানুষ তিনি ন'ন। কোন আশ্চর্য ভবিষ্যতের এক শক্তিমান্ সাহিত্যিকের রচনার পাণ্ডুলিপি, কেমন ক'রে দেশ-কালের অলৌকিক সংস্থান-বিপর্যয়ে সময়ের স্রোত ডিঙিয়ে বুঝি আমাদের হাতে এসে পড়েছে। সে এমন এক ভবিষ্যৎ যেখানে আকাশে বোমারু বিমানের গর্জন নেই, বাতাসে নেই বারুদের কটু গন্ধ, মানুষের লোভ পৃথিবীকে হিংসার কাঁটা-বেড়ায় ভাগ ক'রে রাখেনি।

'নইলে, সে-কালের রোমের মতো বর্তমান দেশ যখন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তখন কাউকে যত মধুরই হোক, সঙ্গীত আলাপ করতে শুনলে, মন পুরোপুরি প্রসন্ন হ'তে বুঝি কিছুতেই পারে না। ময়ূরাক্ষী হয়তো অপরূপ স্বপ্নের দেশের নদী। পতঞ্জলি রায় হয়তো ছদ্ম নাম। এ ছদ্ম নামের পেছনে যদি কেউ আত্মগোপন ক'রে থাকেন তাতে আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই।

কিন্তু এ রকম শক্তিশালী লেখকের বর্তমান বাস্তবতা থেকে ময়ূরাক্ষীর তীরে আত্ম-অপসারণ আমাদের একটু ব্যথিত না ক'রে পারে না।'

ময়ূরাক্ষী ও পতঞ্জলি রায় সম্বন্ধে সাহিত্যিক-মহলের এই কৌতূহল যাদের মধ্যে কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল, আমিও ছিলাম তাদের একজন।

ঘটনাচক্রে পতঞ্জলি রায়ের সত্যকার পরিচয় পাবার সুযোগ আমারই প্রথম ঘটে। ইতিপূর্বে দু'চারজন উদ্যোগী পাঠক ও সাময়িকপত্র-সম্পাদক পতঞ্জলি রায়ের খোঁজ নেবার চেষ্টা করেননি এমন নয়। ময়ূরাক্ষীর প্রকাশককে শুধু চিঠি লিখেই অনেকে ক্ষান্ত হননি, কেউ কেউ তাঁদের দোকান পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে পতঞ্জলি রায়ের আসল পরিচয় ও ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশক সকলকেই সেই একই উত্তর দিয়েছেন— পতঞ্জলি রায়কে তাঁরা নিজেরাও জানেন না। বুকপোস্টে কয়েক মাস আগে তাঁদের কাছে বইখানির পাণ্ডুলিপি আসে, তারই সঙ্গে একটি চিঠি। সে-চিঠিতে শুধু এই কথাই লেখা ছিল যে, বইখানি পছন্দ ক'রে যদি প্রকাশক ছাপতে রাজি হ'ন তাহ'লে লেখকের পারিশ্রমিকের দরুন প্রাপ্য অর্থ তাঁরা যেন কোন বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের তহবিলে দান করেন। প্রকাশক যথারীতি সে-নির্দেশ যে পালন করেছেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়ে তাঁরা সকলের কাছেই তা প্রমাণ করেন।

বলা বাহুল্য, প্রকাশকের মারফৎ পতঞ্জলি রায়ের কোন সন্ধান আমি পাইনি। পেয়েছিলাম দৈবাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে।

মফস্বলের এক শহরে একটা কাজ নিয়ে কিছুদিনের জন্য যেতে হয়েছিল।

নামহীন নগণ্য একটা ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশন। টাইমটেব্‌লে নামটা খুঁজে বা'র করতেও কষ্ট হয়। যুদ্ধের হিড়িকে হঠাৎ তার বরাত ফিরে গেছে। স্টেশনের একধারে শালের জঙ্গল। আর একধারে চোরকাঁটায়-ঢাকা একটা শুকনো বাঁজা মাঠ! বর্ষার কয়েকটা দিন ছাড়া গোরু-ছাগলেরও সেখানে চরে' বেড়াবার মজুরি পোষাত না। সেই মাঠ এখন আর চেনবার জো নেই। চোরকাঁটা, আগাছা সব সাফ ক'রে, মেজে' ঘষে' পিটিয়ে, তার ভোল একেবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মস্ত বড় হ্যাঙ্গার তৈরি হয়েছে মাঠের এক ধারে। দশ-বিশটা এরোপ্লেন সেখানে ঘাপ্‌টি মেরে থাকে। মাঠের মাঝখানের লম্বা খুঁটির ডগা থেকে হাওয়ার গতি জানাবার কাপড়ের খোলের নিশান উড়ছে।

মাঠের ধারে ধারে অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট কামানের লুকোনো ঘাঁটি। বড় বড় দু'টো চওড়া নতুন রাস্তা দু'দিকে বেরিয়ে গেছে যেন দিগন্তের সন্ধানে। সেই রাস্তার একটিতে টেলিগ্রাফের তার বসানো হচ্ছে, বহু দূরের আর একটি এয়ারফিল্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

এই তার বসাবার ভার যিনি নিয়েছেন, সেই কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম আর একজন ব্যবসায়ীর তরফ থেকে। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবসা-সংক্রান্ত একটা বোঝাপড়া করিয়ে দিতে পারলে মাঝখান থেকে আমার কিছু হবার আশা ছিল।

কিন্তু ঠায় দু'দিন নির্বান্ধব স্টেশনে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ কণ্ট্রাক্টরের একবার দেখা পেলাম না। ইতিমধ্যে তাঁর সম্বন্ধে যে-সমস্ত কিংবদন্তী শুনলাম, তাতে দেখা হ'লেও বিশেষ কোন সুবিধে হবে ব'লে মনে হ'ল না। তাঁর প্রকৃত নাম যে কি, এখানে কেউই তা জানে না। 'ল্যাংড়া সাব' ব'লেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। সামনে অবশ্য ও-নামটা কেউ ব্যবহার করে না, বলে 'রায়সাহেব'। রায়সাহেব একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন ব'লেই তাঁর এ-রকম নামকরণ। ত্রুটি কিন্তু তাঁর শুধু শরীরেই নয়, চরিত্রেও নাকি যথেষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেটুকু নিদ্রায় বাধ্য হয়ে কাটাতে হয় সেই সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ নাকি সুরার মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখেন। কাজকর্মে অবহেলা নেই, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়মেরও অভাব। খেয়াল হ'লে দিনরাত্রি নাগাড়ে কুলি-কামিনের অধম হয়ে কাজ ক'রে যান, আবার হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই দিন কয়েকের জন্যে কোথায় যে ডুব মারেন কেউ খোঁজ পায় না। তাঁর হিন্দুস্থানী চাকর চমনলালের ওপরই তখন সব-কিছুর ভার থাকে।

আপাততঃ তাঁর এই রকম একটা আত্মনির্বাসনপর্বই চলছিল। চমনলালের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ করেছি। ত্রেতায় যদি শ্রীহনুমান প্রভুভক্তির আদর্শ হন তাহ'লে এ-যুগে চমনলাল তাঁর তুলনায় ক'নম্বর কম বা বেশি বলা কঠিন। মনিবের গতিবিধি সম্বন্ধে আলাপ করতে সে একান্ত নারাজ। জরুরি কাজে তিনি বাইরে গেছেন— এর বেশি কোন সংবাদ তার কাছে আদায় করা গেল না। দু'এক দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে হয়তো তিনি ফিরতেও পারেন, শুধু এইটুকু ভরসা সে দিলে।

দু'দিন এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে বৃথা অপেক্ষা ক'রে তৃতীয় দিন বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম যে, পরের দিন সকালের ট্রেনেই এখান থেকে বিদায় নেব। যাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি, রায়সাহেব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যত উঁচুই হোক আমার বিবরণ শুনলে তাঁরা নিজেদের খুব ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হয় মনে করবেন না।

থাকবার জায়গার অভাবে স্টেশনের একজন কর্মচারীর কোয়ার্টারেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভদ্রলোক এখানকার হেড্‌ সিগন্যালার। কিছুদিন আগে পরিবারের সকলকে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার অবস্থা দেখে নিজেই উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে ক'টা দিন থাকতে অনুরোধ করেন। বয়সে ভদ্র-লোককে আর নবীন বলা যায় না। কিন্তু আমুদে রসিক লোক। তাঁর সঙ্গ ও আশ্রয় না পেলে দু'দিন এই মরুভূমিতে কাটানো কঠিন হ'ত।

পরের দিন ভোরের গাড়িতে রওনা হবার জন্যে আগে থাকতেই জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম। অনুপমবাবু বিকেলের ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে এসে বললেন, "সে কি, আপনি যে পাত্তাড়ি গুটোচ্ছেন দেখছি! ল্যাংড়া সাহেবের দর্শন তাহ'লে আজ পেয়ে গেছেন?"

হোল্ডঅল্‌টা গুটোতে গুটোতে জবাব দিলাম, "না মশাই, অতখানি পুণ্য বরাতে নেই। ভোরের গাড়িতেই রওনা হ'ব ঠিক করেছি।"

অনুপমবাবু আলনায় আপিসের কোর্টটা টাঙিয়ে রাখতে রাখতে হেসে বললেন, "অত অধৈর্য হ'লে চলবে কেন মশাই! জানেন ত' ল্যাংড়া সাহেবের পা মাত্র দেড়খানা বলা চলে। যেখানে গেছেন সেখান থেকে ফিরতে তাই একটু দেরি হচ্ছে।"

বললাম, "কোথায় গেছেন জানতে পারলেও ত' একবার হানা দেবার চেষ্টা করতাম!"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে অনুপমবাবু বললেন, "সত্যি চেষ্টা করতেন? আপনার গরজ কি এতই বেশি!"

প্রথমটা অনুপমবাবুর কথা বুঝতে না পেরে একটু ক্ষুণ্ণস্বরেই বললাম, "বলেন কি! গরজ বেশি না হ'লে কি সখ ক'রে আপনাদের এই স্যানাটোরিয়মে বেড়াতে এসেছি!"

এবার একটু হেসে অনুপমবাবু বললেন, "সখ ক'রে আসেন নি জানি, কিন্তু

ল্যাংড়া সাহেব যেখানে আছেন সেখান পর্যন্ত হানা দিতে হ'লে নিছক ব্যবসার অনুরাগের চেয়ে গরজ একটু বেশি দরকার…"

অনুপমবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় তিনি আছেন আপনি জানেন না কি ?"

"জানি ব'লেই ত' মনে হয় !"

অনুপমবাবু রায়সাহেবের ঠিকানা সত্যিই জানেন শুনে অবাক হয়ে বললাম, "আগে যে একথা বলেন নি !"

অনুপমবাবু যেন একটু অকারণে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলিনি নয়, বলতে চাইনি। তবে আপনার যদি এখনো উৎসাহ ও সাহস থাকে তাহ'লে জায়গাটা আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি। দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার।"

হেসে বললাম, "সাহস ! দায়িত্ব ! আপনি যে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর ক'রে তুলছেন। বলি, জায়গাটা কি কাছেপিঠে কোথাও, না, দূর দুর্গম কিছু !"

"দূর নয়, তবে দুর্গম কি না সেটা আপনি নিজে বিচার করবেন। আপাততঃ যদি ইচ্ছে করেন, চলুন দেখিয়ে আসছি।"

রাতটা অন্ধকার। স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে নাতিপ্রশস্ত একটি কাঁচা রাস্তায় আধা-বাজার ও আধা-গ্রামের মতো যে জায়গাটিতে গিয়ে পৌছলাম সেটা কিন্তু এমন-কিছু ভয়াবহ নয়। শুধু একটু নোংরা ও ঘিঞ্জি। বাড়িগুলির অধিকাংশই খোলায় ছাওয়া, টিনের চাল মাঝে মাঝে এক-আধটা আছে।

রাস্তায় আলোর কোন বালাই নেই। যে-সব দোকানঘর এখনও পর্যন্ত বন্ধ হয়নি তাদেরই কালি-পড়া লণ্ঠন বা কেরোসিনের কুপি থেকে যে সামান্য উদ্‌বৃত্ত রাস্তায় এসে পড়েছে তারই সাহায্যে পথ চিনে নিতে হয়।

বাজারটি সেই সাবেকি আমলের সাক্ষী ; যুদ্ধের দৌলতে তলায় তলায় ফেঁপে উঠে থাকলেও বাইরে এখনও কিছু প্রকাশ পায়নি।

বাজারের ভেতর কিছু দূর গিয়েই একটি সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ অন্ধকার গলির মতো পথে ঢুকে অনুপমবাবু বললেন, "আমার কর্তব্য এইখানেই শেষ। এই গলি দিয়ে মিনিটখানেক এগুলেই বাঁ পাশে একটি আস্তানা দেখতে পাবেন। আস্তানাটি ভুল করবার কোন উপায় নেই। সুতরাং বিস্তারিত পরিচয়

দিলাম না। সেখানে গিয়ে ল্যাংড়া সাহেবের খোঁজ করলে আশা করি তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে পাবেন। তবে যে-উদ্দেশ্যে এসেছেন তা সিদ্ধ হবে কি না বলতে পারি না।”

অনুপমবাবু কথাগুলো শেষ ক'রে আর দাঁড়ালেন না। আমার সমস্ত দায়িত্ব যেন ত্যাগ করার ভঙ্গিতে গলি দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জেদ ক'রে এত দূর এলেও এখন আর সামনে অগ্রসর হবার বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিলাম না। যে-গলিটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেটা মানুষের হাঁটবার পথ, না কাঁচা নর্দমার একটা পাড় বলা শক্ত। নর্দমার দুর্গন্ধটা আগেই পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে না জেনে পা বাড়াতে গিয়ে তার গভীরতাটাও আর একটু হ'লে মাপবার সৌভাগ্য হয়ে যাচ্ছিল।

দু'এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়েই সামনে অগ্রসর হ'লাম। আস্তানাটা ভুল করবার সত্যিই উপায় নেই। কাছে পৌছতে না পৌছতেই নর্দমার সুবাস ছাপিয়ে সুপরিচিত তীব্র গন্ধে তার প্রথম অভ্যর্থনা পেলাম। সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের জড়িত অর্থহীন কোলাহল।

ঠিক ভাঁটিখানা নয়। এই অঞ্চলের একেবারে সর্বনিম্নশ্রেণীর কুলি-মজুর প্রভৃতির একটি সুরাপান-কেন্দ্র। রাস্তার পাশেই একটা ভাঙা কাঠের গেট। সেটি পার হ'লেই দেখা যায় উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি বেশ বিস্তৃত মুক্ত স্থানে মাটির ওপর বহু ছোট ছোট দল সুরাপাত্র কেন্দ্র ক'রে বসে আছে। পিছন দিকে একটি কেরোসিনের বাতি একটি টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরের বারান্দার মাঝে টাঙানো। সেই ক্ষীণ আলোর সুবিধে এই যে, পরস্পরকে চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এত দূর যখন আসতে পেরেছি তখন আর না অগ্রসর হওয়ার কোন মানে হয় না। মাটির ওপর যারা বসেছিল সন্তর্পণে তাদের পাশ কাটিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সামনে বেঞ্চের ওপর যে দু'টি লোক বসেছিল আমার দিকে বেশ একটু বিরক্তি ভরেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা তাকালো। আমার মতো খরিদ্দার তাদের ঠিক মনঃপূত নয়।

তাদের বিরক্তি গ্রাহ্য না ক'রেই জিজ্ঞাসা করলাম, “রায়সাহেব এখানে আছেন?”

ভ্রূকুটিভরে আমার দিকে তাকিয়ে একজন বললে, "সাহেব-টাহেব হেথাকে কুথা থেকে আসবে। দেখছ নাই— কুলি-কামিনদের জায়গা বটে।"

তর্ক না ক'রে দু'টো টাকা টেবিলের ওপর ফেলে দিলাম, "ল্যাংড়া সাহেবকে আমার বিশেষ দরকার।"

দু'জনে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে নেবার পর দ্বিতীয় লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাই বলো বটে, ল্যাংড়া সাহেবকে তালাস করতে আসেছ। রায়সাহেব বললে কি না, তাই চিনতে লারলাম। ঘুরে ওই ধারের বারান্দায় যাও না কেনে, সাহেব বেহুঁশ হই পড়ি আছে।"

পেছন দিকের বারান্দাতেই ঘুরে গেলাম। এদিকে একেবারে আলোর কোন বালাই নেই। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যাবার পর দেখলাম, বেশ সুবিশাল একটি ছায়ামূর্তি বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে সে বললে, "কে ওখানে?"

বললাম, "আমি রায়সাহেবকে খুঁজতে এসেছি।"

লোকটি এবার ফিরে দাঁড়াল, "রায়সাহেব! রায়সাহেবকে খুঁজতে এখানে আসার ত' নিয়ম নেই। কে আপনি?"

নামটা ব'লে বললাম, "শুধু নাম বললে চিনতে বোধ হয় পারবেন না!"

ভদ্রলোক একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য কখনও হয়েছে ব'লে ত' মনে হচ্ছে না। কি চান আপনি?"

"আপনিই তাহ'লে রায়সাহেব?"

ভদ্রলোক একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, "না, রায়সাহেব আমি নই, ল্যাংড়া সাহেবও নয়। এখন আমি পতঞ্জলি রায়! আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

সত্যিই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে জবাব দিতে পারলাম না কিছুক্ষণ।

প্রথম বিস্ময়টা কাটবার পর নিজেকে একটু নির্বোধই মনে হ'ল। পতঞ্জলি রায় নামটা অসাধারণ সন্দেহ নেই, আমার মনের মধ্যে সে-নামটা সম্বন্ধে একটা সদাজাগ্রত কৌতূহল আছে এ-কথাও সত্য, কিন্তু তাই ব'লে প্রথম সে-নামটা উচ্চারিত হতে শুনেই যে-কোন সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের এক কণ্ট্রাক্টরকে

বাঙলা সাহিত্যে সাড়া তোলবার উপযুক্ত রহস্যময় পুরুষ ভেবে নেওয়া একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি।

পতঞ্জলি রায় আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে একটু অধৈর্যের সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কই, কি চান আপনি বললেন না?"

গলার স্বরে সামান্য একটু জড়তা আছে সত্য। কিন্তু কয়েক দিন ব্যাপী পানোৎসবের লক্ষণ তাকে বলা চলে না।

বললাম, "আমার রায়সাহেবের সঙ্গেই দরকার ছিল!"

"সে-দরকার নিয়ে ত' এখানে আসবার কথা নয়। রায়সাহেবের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত আলাপ করবার আলাদা আস্তানা আছে।" পতঞ্জলি রায়ের কণ্ঠ এবার বেশ রুক্ষ।

"সে-আস্তানায় তিন দিন অপেক্ষা ক'রে তাঁর দেখা না পেলে বাধ্য হয়েই এখানে হানা দিতে হয়।"

কথাটা খোঁচা দেবার জন্যেই বলেছিলাম। কিন্তু পতঞ্জলি রায় এবার আর উষ্ণ হয়ে উঠলেন না। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আপনার দরকার কি খুব জরুরি?"

"তা না হ'লে তিন দিন ধন্না দিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করি।"

পতঞ্জলি রায় এবার একটু হেসে উঠলেন। তারপর আমার হাতটা হঠাৎ ধ'রে ফেলে বারান্দার অপর কোণের একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজেও আরেকটিতে বসলেন।

চোখ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার দরুন অন্ধকারটা এখন অনেক ফিকে মনে হচ্ছিল। দেখলাম, ছোট একটি নিচু টেবিলে তাঁর পানীয় সাজানো। গ্লাসটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে এক চুমুকেই সেটি নিঃশেষ ক'রে তিনি বললেন, "জায়গাটা আপনার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হচ্ছে, না? প্রায় নরককুণ্ডের সামিল?"

উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ব'লে চুপ ক'রে রইলাম।

পতঞ্জলি আবার বললেন, "টিনের ছাউনি না হয়ে জায়গাটা যদি বিলাতি 'বার' হত, কেরোসিনের ভাঙা লণ্ঠনের বদলে এখানে বিজলি বাতির ঝাড় ঝুলত, আর নোংরা হতভাগা কুলি-মজুরের বদলে যদি সুবেশ ভদ্র বড়লোকের অপদার্থ ছেলেরা এখানে ভিড় ক'রে থাকত, তাহ'লে বোধ হয় আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা এত নিচু হ'ত না। কেমন তাই না?"

একটু হেসে বললাম, "দেখুন, আমার ধারণা এ-বিষয়ে যাই হোক তাতে আপনার কি আসে যায়।"

"রায়সাহেবের হয়তো আসে যায় না, কিন্তু পতঞ্জলি রায়ের অনেক কিছু আসে যায়।" পতঞ্জলি হাতের গ্লাসটা সজোরে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, "রায়সাহেবের সীমানা ছাড়িয়ে পতঞ্জলি রায়ের এলাকায় যখন অনধিকার প্রবেশ করেছেন তখন কিছু দণ্ড দিয়েই যেতে হবে। শুধু বাজার-দর সেরেই নয়, মানুষের দরদস্তুরও না ক'রে ছাড়া পাবেন না।"

পতঞ্জলি রায় শূন্যপাত্রে আবও খানিকটা পানীয় ঢেলে বললেন, "দেখুন, এদের কিছু নেই, তাই এরা নেশা করে, জীবনের শূন্যতাকে রঙিন করবার আশায়, আর ওরা নেশা করে অতিপ্রাচুর্যের বিতৃষ্ণা কাটাবার দুরাশায়। সর্বনাশের পথের সঙ্গী যদি দরকার হয় তাহ'লে এরাই সব চেয়ে যোগ্য। এদেব মধ্যে অন্ততঃ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মিথ্যা ভণ্ডামি নেই।"

এতক্ষণে মনে হচ্ছিল পতঞ্জলি রায়ের আসল পরিচয় সম্বন্ধে খুব ভুল বোধ হয় করিনি। শুধু তাঁর কথার ধারা প্রবাহিত রাখবাব জন্যেই বললাম, "আমায় সুযোগ দিয়েছেন ব'লেই বলছি, সর্বনাশের পথ কি সাধ ক'রে বেছে নেবার জিনিস!"

পতঞ্জলি একটু হাসলেন। তারা-ভরা আকাশের পশ্চাৎপটে তাঁর মুখের ছায়াময় আকৃতিটি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। বিশাল বলিষ্ঠ চেহারার আভাস আগেই পেয়েছিলাম, মুখের গঠনেও সেই স্থাপত্যসুলভ জোরালো রেখার পরিচয়।

পতঞ্জলি রায় হাসি থামিয়ে বললেন, "সর্বনাশের পথ সাধ ক'রে বেছে নেবার জিনিস নয়ই বা কেন! সব চেয়ে দামী যা-কিছু তা পাবার, আর জীবনের সব-কিছু হারাবার ত' একই রাস্তা। নিরাপদে জীবনের লোহার সিন্দুক আগ্‌লে যারা থাকে তারা হারায়ও না কিছু যেমন, তেমনি পায়ও না কিছু!"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পতঞ্জলি রায একেবারে অন্য স্বরে বললেন, "ব্যবসার আলাপ করবার আশায় এসে আমাব এ-সব প্রলাপ শুনে আপনি হয়তো মনে মনে হাসছেন। ভাবছেন, আচ্ছা বেহদ্দ মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে। তা যাই ভাবুন, আমার কিছু আসে-যায় না। আপনাকে আমি চিনি না। মুখটাও ভালো ক'রে দেখিনি। আপনি আমার কাছে একটা সত্তাহীন ছায়া মাত্র।

তবু এ-সব বলছি কেন জানেন? নিজের কাছেও নিজে যা বলা যায় না, তা বলবার জন্যে মাঝে মাঝে এ-রকম ছায়াও দরকার হয়। ছায়া না পেলে ছেঁড়া কাগজে লিখে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পতঞ্জলি রায় তেমনভাবে ছেঁড়া কাগজের লেখা কখনও হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন কি?"

অন্ধকারেই পতঞ্জলি রায় একটু চমকে উঠলেন, "না, নিরাকার ছায়ার পক্ষে আপনার স্পর্ধা যেন একটু বেশি। আপনাকে বাস্তবতায় নামানো প্রয়োজন!"

আমাকে একটু বিস্মিত ক'রেই পতঞ্জলি বারান্দাটা ঘুরে হঠাৎ চলে গেলেন। তাঁর একটু খুঁড়িয়ে হাঁটবার ভঙ্গিটা অন্ধকারেও আমার দৃষ্টি এড়াল না।

কয়েক সেকেণ্ড বাদেই ওদিকের লণ্ঠনটা নিয়ে এসে তিনি টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। কালি-পড়া লণ্ঠনের সেই অনুজ্জ্বল আলোতেই দু'জনের মুখের দিকে তখন আমরা সবিস্ময়ে চেয়ে আছি।

দু'জনেই বোধ হয় একসঙ্গে বললাম— "আপনি!"

হ্যাঁ, পতঞ্জলি রায়কে আমি চিনি। আমি নিজেও তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হয় নই।

পরিচয় ইতিপূর্বে যখন হয়েছিল তখন অবশ্য পটভূমিকা ছিল আলাদা, সেই সঙ্গে দু'জনের ভূমিকাও।

আমায় সেদিন দর্শনপ্রার্থী হয়ে যেতে হয়নি, পতঞ্জলি রায়ই এসেছিলেন আমার কাছে নিজের গরজে। নামটা সেদিন হয়তো তাঁর পতঞ্জলি রায় ছিল না, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, সেদিনও তাঁর মাঝে 'ময়ূরাক্ষী'র রচয়িতার কোন আভাস না পেলেও কৌতূহলী হয়ে ওঠবার যথেষ্ট খোরাক পেয়েছিলাম।

জীবিকার্জনের তাগিদে ছোটনাগপুরের এক অভ্রের কারখানায় তখন ম্যানেজারি করি। ম্যানেজারি মানে কুলিকামিনের সর্দারী। যুদ্ধের কয়েক বছর আগেকার কথা। বাজার মন্দা। বড় বড় সদাগরেরা ব্যবসা গুটিয়ে এনেছে, চুনো-পুঁটির দল অনেক আগেই সাবাড়। সাগর-পারে সরেস মালের খোঁজ নেয় না কেউ। আমাদের কোম্পানী ডাকসাইটে অভ্রের কারবারী। শুধু মানের দায়ে তাই তাঁরা একটা কারখানার বাতি কোনরকমে টিম-টিম

ক'রে জালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এ-অঞ্চলের বিশটা কারখানায় তাঁদের দু'তিন হাজার কুলি-কামিন কাজ করত, সেখানে একটা ছোট টিনের ছাউনির তলায় জন পঞ্চাশ সস্তাদরের খেলো ফাক্‌নি ফাড়ে।

এই ম্যানেজারি করবার সময়ই এক দিন কোম্পানীর হেড অফিস থেকে এক চিঠি পেলাম এই মর্মে যে, ডোমনী নদীর ওপারে কোম্পানীর যে বিরাট কারখানা বাড়ি এখন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেটা যেন ঝাড়-পোঁছ ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। কলকাতা থেকে কে একজন সে-বাড়ি ভাড়া নিতে আসছেন নতুন কারখানা বসাবেন ব'লে।

এই মন্দার বাজারে হঠাৎ অত বড় কারখানা নতুন ক'রে স্থরু করবার নির্বুদ্ধিতা যার মাথায় আসে তার বিষয়ে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ ক'রে নদীর এপারের এত জায়গা থাকতে ওপারের ওই বেয়াড়া বাড়ি ভাড়া করাটায় আর যাই হোক ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

শুধু ব্যবসা-বদ্ধির তাগিদে ভদ্রলোক যে কারখানা খুলতে আসেন নি তার প্রমাণ পেতে খুব দেরি হ'ল না। হেড অফিসের নির্দেশ মতো ভদ্র-লোকের জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা আমি তখন করেছি, এমন কি একটু অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে তাঁর জন্যে নদীর এপারে একটা বাসাও ঠিক ক'রে রেখেছি।

ভদ্রলোক কারখানা-বাড়ির চেহারা দেখে খুশিই হ'লেন মনে হ'ল, কিন্তু বাসা বাড়ির কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "ও-রকম কোন কথা কি হয়েছিল?"

বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, "কথা হয়নি বটে, তবে আপনার থাকবার একটা জায়গা ত' দরকার। অবশ্য আপনি যদি আলাদা কোন ব্যবস্থা আগেই ক'রে থাকেন···"

আমায় বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "আলাদা ব্যবস্থা করবার দরকার ত' নেই কিছু। এই কারখানা-বাড়িতেই থাকব।"

"নদীর এপারে এই কারখানা-বাড়িতে!" কারখানার মালিকের পক্ষে এ-রকম জায়গায় বাস করা যে শুধু অস্থবিধাজনক নয়, মান-সম্মানের দিক থেকেও হানিকর আমার কথার স্থরে সেটুকু বোধ হয় উহ্য রইল না।

ভদ্রলোক তাই একটু হেসে বললেন, "আপনাদের ওপারের ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে এপারটা খুব অস্বাস্থ্যকর ব'লে ত' মনে হয় না। তা ছাড়া দিনে যেখানে

কারখানা চালাতে পারি রাতে সেখানে একটু বিশ্রাম করলে এমন কি মাথা কাটা যাবে!”

প্রতিবাদ করলাম না, কিন্তু ভদ্রলোকের ওপর অপ্রসন্ন মন নিয়েই ফিরে এলাম। এ-রকম মাত্রাজ্ঞানহীন আনাড়ির হাতে কারখানা যে দু'দিন বাদেই শিঙে ফুঁকবে সে-বিষয়ে আমার তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমাদের সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ ক'রে ভদ্রলোকের কারখানা যেন দিন দিন শশিকলার মতোই বেড়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৯এর যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন টান তখন থেকেই সুরু হয়েছে। হঠাৎ জোয়ারের সাড়া এসেছে অভ্রের বাজারে।

দেখতে দেখতে আমার মনিব কোম্পানীর পর্যন্ত চোখ টাটিয়ে উঠল। যে অজ্ঞ আনাড়িকে একটা লোকসানের কারখানা ফাঁকি দিয়ে গছিয়ে একদিন তাঁরা খুব একটা দাঁও মেরেছেন ব'লে মনে করেছিলেন, আজ সেই অজ্ঞ আনাড়িই তাদের সব চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে তাঁরা ভাবতে পারেননি।

বাজার চড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় উপ্‌রি কুলি-কামিনের চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু নদী পার হয়ে তারা আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছয় না। ডোমনীর কারখানাতেই আট্‌কা পড়ে যায়।

ওপরওয়ালাদের হুকুমে আর কতকটা নিজের গায়ের জালায় ভয়, লোভ, ঘুষ, কোনটাই বাদ দিলাম না। কিন্তু তবু এঁটে ওঠা গেল না ডোমনীর কারখানার মালিকের সঙ্গে। তখন তার নাম ল্যাংড়া সাহেব নয়— ডোমনী-রাজ। ডোমনী রাজ কি যেন ভেল্কি জানে। কাহার-কুর্মী-সাঁওতালদের যাদু ক'রে রেখেছে কোন কৌশলে। উপরি মজুরীর লোভ দেখিয়ে যাদের অনেক কষ্টে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে ভাঙিয়ে আনি দু'দিন বাদে তারা আবার নিঃশব্দে নদীর পারে পালিয়ে যায়।

আমাদের আড়কাঠি মংলু সর্দার অনেক দিন গালিগালাজ খেয়ে একদিন বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, “উরা তুর ইখানে আসবেক কেনে বল দেখি! ইখানে কি মজা আছে উখানকার মতো।”

“মজা! কারখানায় আবার মজাটা কিসের?”

“খালি কারখানার কাম উয়ারা ত' করে নাই। দিনে ফাকনি আর রাতে

রোশনি ? বঝলি বটে !" —মংলু সর্দারের সব ক'টা দাঁত মাড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল খুশিতে।

ধমক দিয়ে তার উচ্ছ্বাস দমন ক'রে বললাম, "রাতে রোশনি মানে ?"

মংলু সর্দার মানেটা যা বুঝিয়ে দিল কানা-ঘুষায় কিছু তার আগেই আমার কানে এসেছিল। ডোমনী-রাজের কারখানায় শুধু ফাকনি ফাড়াই হয় না। রাতে সেখানে স্ফূর্তির আসরও বসে। গান-বাজনা আর অঢেল মহুয়া। রসদ নাকি ডোমনী-রাজই বেশির ভাগ জোগান। শুধু তাই নয়, সে-মজার মজলিসে তিনি নিজেও নাকি অনুপস্থিত থাকেন না। বিবরণ শেষ ক'রে মংলু সর্দার বললে, "মরদগুলাকে যদি বা বুঝ শুঝ করি টানি আনতে পারি, কামিনগুলা কিছুতে আসবেক নাই।"

"কেন কামিনদের কাছে উনি বৃন্দাবনের কানাই নাকি !"

"হঃ, তাই ত' বটে। উরা বলে কি জানিস ? মেহন্নত কবলি মজুরি ত' সবাই দিবে গা, কিন্তুক এমন মুনিব কুথাকে মিলবে বটে। কামিনগুলা আসতে নারাজ, তাই মরদগুলাও সাথে সাথে মাথা লাড়ে।"

অপদার্থ মরদগুলোর সঙ্গে তাদের মালিকের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারলে তখন আমার রাগ মেটে। ওপরওয়ালাদের কড়া চিঠি প্রত্যেক দিন চাবুকের মতো এসে পিঠে পড়ছে। কারখানার কাজ না বাড়াতে পারলে চাকরি রাখা দায়। ডোমনী-রাজের বিরুদ্ধে নিস্ফল আক্রোশে হাত কামড়ানো ছাড়া কাজ বাড়াবার আর কিছুই করতে পারছিলাম না। ওদিকে নদীর পারের কারখানা প্রতিদিন ফেঁপে ফুলে উঠছে। উঠছে নতুন ছাউনি। ডোমনীর পাড়ে নতুন বসতিই গড়ে' উঠছে কুলি-কামিনদের। আর কিছু না পারলেও একদিন সুবিধে পেয়ে গায়ের ঝাল মেটালাম ডোমনী-রাজের ওপর।

মাসিক ভাড়ার টাকা দিতে আমাদের আপিসে এসেছিলেন। রসিদটা সই করতে করতে কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই বললাম, "প্রথম এসেই কারখানা-বাড়িতে কেন আপনি থাকতে চেয়েছিলেন এখন বুঝতে পেরেছি।"

হঠাৎ একবার একটু চমকিত হ'লেও তাঁর মুখে তা প্রকাশ পেল না। ঈষৎ হেসে বললেন, "কি বুঝেছেন ?"

মনের তিক্ততা কোনরকম গোপন না ক'রে বললাম, "কুলি-কামিনদের নিয়ে রাতের পর রাত এমন মজা করবার সুবিধে নইলে হয় না।"

ভদ্রলোকের মুখের হাসি তবু মিলিয়ে গেল না। তেমনি স্মিতমুখেই বললেন, "ঠিকই বুঝেছেন তাহ'লে!"

কণ্ঠস্বরে যত দূর সম্ভব ঘৃণার বিষ ঢেলে দিয়ে বললাম, "মহুয়া আর মাত লামির লোভ দেখিয়ে কতদিন কারখানা চালাবেন? কারখানার মালিক হয়ে লজ্জা করে না ওই সব কুলি-মজুরদের সঙ্গে মদ খেয়ে মজা করতে!"

ভদ্রলোকের মুখে তবু কোন ভাবান্তর নেই। সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মালিক হয়ে ওদের মেহনতের মুনাফা নিতে যদি লজ্জা না থাকে, তাহ'লে ওদের সঙ্গে একটু মজা করতেই কি যত লজ্জা!"

হেসে নমস্কার ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি জ্বলতে লাগলাম।

কিন্তু যা কল্পনাতীত তাই একদিন হঠাৎ অলৌকিক ভাবে ঘটে' গেল। আমাদের সমস্ত চেষ্টাতেও যা পারিনি একদিন তিনি নিজেই তা ক'রে গেলেন।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, ডোমনী-রাজ সাংঘাতিক জখম হয়ে কলকাতায় চ'লে গেছেন। ভেলোয়ার জঙ্গলে ভালুক শিকার করতে গিয়েই নাকি এই দুর্ঘটনা। আহত ভালুক তাঁর পায়ে নাকি থাবা মেরেছে।

কিছু দিন বাদেই জানতে পারলাম, ডোমনী-রাজ আমাদের কোম্পানীকেই জলের দরে তাঁর কারখানা বেচে দিয়েছেন।

তার ব্যবসা তখন জমজমাট। ডোমনীর কারখানা এ অঞ্চলের সকলকে তখন কানা ক'রে দিয়েছে। এই লাভের মরশুমে নিতান্ত উন্মাদ ছাড়া কেউ যে সে-কারখানা বেচে দিতে পারে তা বিশ্বাস করা যায় না।

সেই উন্মাদ ডোমনী-রাজের সঙ্গে এত কাল বাদে এমন আশ্চযভাবে এই অপরূপ আস্তানায় দেখা হবে কে জানত!

ডোমনী-রাজের অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে পতঙ্গলি রায়ের রহস্যও যে জড়িয়ে থাকতে পারে, তাই বা কে কল্পনা করেছিল!

পরের দিন সকালে রায়সাহেবের ক্যাম্পে ব'সে সেই কথাই বলছিলাম। সুস্থ অবস্থায় রায়সাহেব মাঠের মাঝে এই বস্ত্রাবাসে থেকেই তাঁর কাজকর্ম চালান। ক্যাম্পের আসবাবপত্র যা আছে তা থেকে বোঝা যায় যে সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসিতার প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ তাঁর নেই। তাঁর সকালবেলার চেহারা দেখেও বোঝবার উপায় নেই যে গত কয়েক দিন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রাজ্যে তিনি ছিলেন না।

তাঁবুর ভেতর দু'টি ক্যাম্বিশের চেয়ারে আমরা ব'সে আছি। ভোর রাত্রি থেকেই আকাশ ঘনঘটায় ঢাকা। বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। বর্ষণের জের তবু এখনো একেবারে মেটেনি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়েই চলেছে।

তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে সে বৃষ্টির ফোঁটা আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। চমনলাল একবার পর্দাটা ফেলে দেবার জন্যে এল। রায়সাহেব হাত নেড়ে তাকে বারণ করলেন।

দরজার বাইরে মেঘলা আকাশের বিষণ্ণ আলোয় দিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো শূন্য প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। এরোড্রোমের রাস্তাটা সোজা সিঁথির মতো সে-প্রান্তর দ্বিখণ্ডিত ক'রে দূরের বালি-নদীতে নেমে গিয়েছে।

সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, "দূরের নদীটাকে দেখলে ডোমনীর কথা মনে পড়ে যায়—না?"

রায়সাহেব আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে খানিক চুপ ক'রে থাকবার পর ঈষৎ হেসে বললেন, "আপনি অন্ততঃ মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছি।"

সরলভাবেই স্বীকার করলাম, "তা চাইছি। ডোমনী-রাজ আর পতঞ্জলি রায়ের রহস্য কি ক'রে একজনের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে।"

রায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খানিক নীরবে সামনের প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলেন। তেরপল-ঢাকা একটা লরী, এই মেঘ-মেদুর আকাশ ও বর্ষণ স্নিগ্ধ পৃথিবীর কাব্যে ছন্দোপতনের মতো কর্কশ শব্দে আমাদের তাবুর পাশ দিয়ে দূরের নদীর দিকে চলে গেল। আমার কথার উত্তর দেবার ইচ্ছে হয়তো রায়ের নেই ভেবে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ তিনি বললেন, "ডোমনী-রাজ আর পতঞ্জলি কি একেবারে বিপরীত চরিত্র? আসলে তারা কি এক নয়? দু'জনের কোন মিল কি আপনি খুঁজে পাননি?"

"মিল শুধু এইটুকু বলা যায় যে দু'জনেই ভিন্নভাবে জীবনের কাছে হার মেনেছেন। দু'জনেই 'পলাতক'।"

"পলাতক!" —রায় তিক্তভাবে একটু হাসলেন। বললেন, "হুজুগে সাহিত্যের বাঁধা-বুলির ছোঁয়াচ আপনাদের মনেও লেগেছে দেখছি। জীবনের কদর্যতা কলঙ্ককেই এক মাত্র সত্য ব'লে মানতে যে নারাজ সে-ই আপনাদের কাছে 'পলাতক'। জীবনের উলঙ্গ কুৎসিত বাস্তবতার মাঝেও সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখবার সাহস যার আছে সে শুধু অক্ষম কল্পনাবিলাসী!"

একটু থেমে রায় আবার বললেন, "মানুষ একদিন আশ্চর্য সব রূপকথা তৈরি করেছে। সে কি শুধুই মিথ্যার মৌতাতে বুঁদ হয়ে, যা বাস্তব তাকে ভুলিয়ে দেবার ও ভুলে থাকবার জন্যে? সে-রূপকথার মধ্যে সেই দুঃসাহসী আশার বর্তিকা কি নেই, বিকৃত বর্তমানকে অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ ক'রে ভবিষ্যতের সঙ্কেত যা বহন করে! জীবনকে তার সমস্ত কদর্যতা, গ্লানি আর অসম্পূর্ণতা নিয়ে সত্য ক'রে জানবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়নি, বাস্তবতার ফাঁকা বুলির হুজুগে তারাই সব চেয়ে মেতে ওঠে। জীবনকে সত্য ক'রে যে জেনেছে, সে সত্যের চেয়ে আরও বেশি-কিছু দিয়ে তা প্রকাশ করে, —সেই বেশি কিছুই হ'ল মানুষের স্বপ্ন।"

বৃষ্টির বেগ আবার বেড়ে উঠেছে। জলের ধারার চিক্ ফেলে আকাশ যেন আমাদের আলাদা ক'রে দিয়েছে সমস্ত পৃথিবী থেকে। পতঞ্জলি তার সেই ছায়ার সঙ্গেই কথা বলছেন বুঝে কোন মন্তব্য না ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

পতঞ্জলি বলতে লাগলেন, "অবশ্য আমার নিজের সম্বন্ধে এসব কোন কথাই খাটে না। আপনাদের ভাষায় আমি সত্যি পলাতক। স্বপ্ন নিয়ে থাকবার নিষ্ঠা ও সাহস নেই ব'লেই আমি কারখানা চালাই, কণ্ট্রাক্টরি করি। উলঙ্গ নির্লজ্জ সত্য প্রকাশ করতে আমার মন সঙ্কুচিত হয় ব'লেই আমি অলীক স্বপ্নে সান্ত্বনা খুঁজি।"

একটু চুপ ক'রে থেকে পতঞ্জলি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি 'ময়ূরাক্ষী' পড়েছেন?"

মাথা নেড়ে জানালাম, "পড়েছি!"

"ময়ূরাক্ষীর আসল নাম কি জানেন? তার নাম চোমনী। চাঁদের আলোকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বপ্নের বালুচর সে পেতে রাখে না, শহরের

নালার জলে নোংরা হয়ে, সরকারী সড়কের পোলে ধাক্কা খেয়ে জলের কলের পাম্পে অর্ধশোষিত হয়ে অতি ক্ষীণ ধারায় সে কোনমতে দুই তীরের মাঝখানের ময়লা বালি একটু ভিজিয়ে রাখে।

"সেই ডোমনীর শুক্‌নো পাথুরে তীরের একটি কারখানা-বাড়ির সত্যকার কাহিনী লেখবার সততা নেই ব'লে আমি ময়ূরাক্ষীর স্বপ্নলোকে আশ্রয় নিয়েছি।

"ডোমনীর কারখানা সম্বন্ধে অনেক কথা আপনি শুনেছেন। সব তার মিথ্যেও নয়। দিনে আমি যাদের নিয়ে কারখানা চালিয়েছি, রাত্রে তাদের নিয়েই হল্লা করতে আমার বাধেনি, এ-খবরও আপনার অজানা নয়। একদিন এই প্রশ্নই আপনি আমায় করেছিলেন সে-কথা আমি ভুলিনি। তবে সেদিন যে উত্তর আমি দিয়েছিলাম তা মিথ্যে না হ'লেও অসম্পূর্ণ। দিনে যাদের কাজে খাটিয়েছি, রাত্রেও তাদের সঙ্গ আমি কেন ছাড়িনি, জানেন? কি নিয়ে তারা বেঁচে থাকে তাই শুধু আবিষ্কার করবার জন্যে, শুধু জানবার জন্যে ওই ডোমনী নদীর মতো তাদের বিকৃত বিড়ম্বিত অভিশপ্ত জীবনের নোংরা বালিতে, এক দিন যে তারা মানুষ ছিল সেই স্মৃতির এতটুকু সরসতা এখনও আছে কি না!

"কঠিন নীরস মাটির অনেক নিচের স্তরে অনেক সময় জলের ধারা গোপনে লুকিয়ে থাকে। মাটিতে আঘাত দিয়ে, নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ ক'রে কখনো কখনো তার সন্ধান নিতে হয়। সেই নিষ্ঠুর আঘাত দিতেও আমি দ্বিধা করিনি।

"কারখানারই একটি ঘর আমার রাত্রের বিশ্রামের জায়গা ছিল আপনি জানতেন। একদিন অনেক রাত্রে সকলকে বিদায় ক'রে দেবার পর ঘরে ঢুকে চম্‌কে উঠলাম একটা চাপা-হাসির শব্দ শুনে। অবাক হয়ে আলো জাললাম। অচেনা কেউ নয়। আমারই কুলি-কামিনদের একজন। যথাসম্ভব কঠিন স্বরে বললাম, 'ঘর যা কোইলি!'

"নেশায় অর্ধমুদিত চোখে কোইলি একটু হেসে, জড়িত স্বরে বললে, 'এহি তো ঘর বা।'

"কোইলি অপ্রিয়দর্শন নয়, যৌবনের জাদু তার সমস্ত অঙ্গে লেগেছে। নিজেকেও নিষ্কলঙ্কচরিত্র বলতে পারি না। তবু সেদিন কোইলিকে জোর ক'রেই বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। কারণ, এই মেয়েটি সম্বন্ধে দৈহিক কৌতূহলের চেয়ে বেশি-কিছু আমার ছিল। আল্লু কাহারের মেয়ে। ছেলেবেলা যার সঙ্গে

বিয়ে হয়েছিল সে কোন্ বিদেশের শহরের চাকরি নিয়ে দশ বছর নিরুদ্দেশ। ইতিমধ্যে কোইলি যৌবনে পা দিয়েছে। আমারই কারখানার গাড়োয়ান পরমা তাই দু'বছর ধ'রে আন্তু কাহারের কাছে ধন্না দিচ্ছে। আন্তুরও আপত্তি নেই। নগদ একশ'টি টাকা পেলেই সে আবার মেয়ের 'চুয়ান' সাদি দিতে প্রস্তুত। পরমা সেই টাকাই সংগ্রহ করছে প্রাণপণে। গাড়োয়ানি ক'রে যা পায় তার ওপর যে-কোন উপায়ে উপ্‌রি রোজগার করবার জন্যে সে ব্যাকুল। কারখানায় আনাগোনার পথে মাঝে মাঝে দু'চার বাণ্ডিল মাল যে কা'র হাত সাফাই-এর গুণে লোপাট হয়ে যায় তা আমার অজানা নয়। নালিশটা বেশির ভাগ সুখনের তরফ থেকেই আসে। সুখন পরমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু চেহারা সাহস শক্তি কোনো দিক দিয়েই কোনো ভরসা তার নেই।

"পরের দিন সকালে সুখনই প্রথম খবরটা নিয়ে এল। কোইলির কাছে কি সব শুনে পরমা নাকি ক্ষেপে গেছে। বলেছে, খুন সে দেখবেই। খুনটা যে কা'র তাও সে নাকি উহ্য রাখেনি।

"না কোইলি, না সুখন— কারুর আচরণেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সুখনকে তাই হতাশ ক'রে একটু হেসে বললাম, 'একবার তোকে বাজারে যেতে হবে সুখন!'

" 'বাজার!' সুখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাহেকে?' ক'টা টাকা বা'র ক'রে দিয়ে বললাম, 'সব্‌সে বঁঢ়িয়া শাড়ি মোল কর কোইলি কো পাশ লে যানা। বোল না কেয়া ডোমনী-রাজ নে ভেজা।'

"শাড়িটা যথাসময়ে ফেরত এল। শোনা গেল, আন্তুর বা কোইলির বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু পরমা একেবারে মার-মতি হয়ে উঠেছে। এ-শাড়ি কোইলির গায়ে উঠলে সেই শাড়ি নিয়েই তাকে চুল্‌হায় চড়তে হবে।

"সমস্ত সকাল মনটা খুশিতে ভ'রে রইল। কোইলি অবশ্য যথারীতি সময়-মাফিক কাজে এল। দুপুরের খেপ নিতে পরমাও এল শেষ পর্যন্ত।

"পরমাকে ডেকে বললাম, জামুণ্ডা যেতে হবে তাকে আজ দুপুরেই। জামুণ্ডার খাদ দু'দিনের যাওয়া-আসার রাস্তা।

"উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ। ধনুকের ছিলা একবার শুধু টান হয়ে উঠুক।

"পরমা মাথা নিচু ক'রেই বললে, 'দু'দিন বাদে গেলে হয় না?'

" 'না হয় না!' পাঁচটা টাকা সামনে ফেলে দিয়ে বললাম, 'সেখানে গিয়ে মহুয়া খাস।'

"টাকাটা নিয়ে মাথা নিচু ক'রেই পরমা চলে গেল।

"বিকালে কাজের শেষে কোইলিকে ঘরে ডেকে পাঠালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শাড়ি ফেরত দিয়েছিস্ কেন?'

"কোইলি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোহার পাশ কুছু ন লেই।'

"হেসে বললাম, 'বেশ নিতে তোকে কিছু হবে না। একবার আসিস অন্য সময়ে। যখন গোলমাল থাকবে না। অনেক কথা আছে।'

"তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কোইলি চলে গেল।

"গোলমাল থাকে না একমাত্র গভীর রাত্রে। রাত গভীর হবার আগেই স্টেশনে চলে গেলাম। রাতটা কাটালাম সেখানেই।

"সকালে ফিরে শুনলাম, পরমা মাঝপথ থেকেই নেশায় চুর হয়ে ফিরে এসেছে। কোইলি তাকে কি বলেছে কেউ জানে না কিন্তু কাহার-বস্তির কারুর নাকি আর জানতে বাকি নেই যে দুশমনের জান্ না নিয়ে সে ফিরবে না শপথ করেছে।

"সুখন সাবধান করার জন্যে ব্যাকুল। বড় গোঁয়ার খুনে ওই পরমা। খুন-জখম ক'রে একবার হাজত-বাস পর্যন্ত ক'রে এসেছে। আমি যেন আগে থাকতেই ব্যবস্থা করি।

"ব্যবস্থা করলাম। দুপুরে পরমাকে ডাকিয়ে বললাম, ভেলোয়ার জঙ্গলে শিকারে যাচ্ছি। তাকে সঙ্গে যেতে হবে। পরমার শিকারের সুনাম আছে। গাদা বন্দুক দিয়েই সে এর আগে দু'চারটে চিতা ভালুক মেরেছে।

"পরমা আপত্তি করলে না।

"ফাল্গুন মাস। মহুয়ার ফুলে বনের মাটি ছেয়ে থাকে। ভোরের অন্ধকারে ভালুকেরা আসে সেই মহুয়ার লোভে।

"পরমার হাতে গাদা বন্দুক, আমার হাতে দোনলা। অন্ধকারে বনের পথে সন্তর্পণে যেতে যেতে বললাম, 'সাবধানে থাকিস পরমা, ভালুক ভেবে তোকেই না মেরে বসি। শিকারে এ-রকম ভুল হামেশা হয়।' অন্ধকারেই পরমার তীব্র দৃষ্টি যেন অনুভব করলাম মুখের ওপর।

"বনের মধ্যে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। হঠাৎ অদূরে একটা আবছা মূর্তি দেখে বন্দুক লক্ষ্য ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলাম। পরমাও বন্দুক বাগিয়ে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু বন্দুক তার হাতে রইল না। হাত থেকে মাটিতে প'ড়ে গাদা বন্দুক ছুটে গিয়ে গুলিটা ছিট্‌কে এসে লাগল আমার পায়ে।

"ব'সে প'ড়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম, কিন্তু পরমা আর সেখানে নেই। সেই যে ভয়ে ছুটে পালালো, সেই থেকেই সে নিরুদ্দেশ।

"ডোমনীর কারখানায় আর ফিরে যাই নি। জখম পা নিয়ে কলকাতাতেই গেলাম চিকিৎসা করাতে। ঘা সেরেছে। কিন্তু 'ময়রাক্ষী'র স্বপ্নের মতো একটা ব্যথা এখনো যায়নি।"
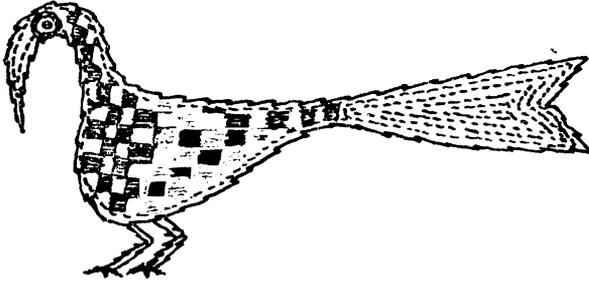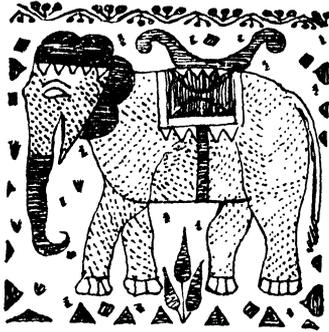
# মহানগর

আমার সঙ্গে চলো মহানগরে— যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দির-চূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে-পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবন-ধারার মতো, যে-পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে-পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত— ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, ঊর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার— ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সজ্ঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ; প্রিয়ার মতো যে-নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউয়ের সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে-হাওয়া বয় তা'র, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে-কথা বলে তারও। সে-সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি--- শব্দের বন্যার মতো; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে-পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ— সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে— সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে-সংগীতে।

এ-সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটু-খানি গল্প বলতে পারি— মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার

কাহিনী-সমুদ্রের দু'একটি ঢেউ। মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটাবার নয়, —জানি।

সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে-শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় যুটন্ত কদমগাছের নিশান-দেওয়া সেই পুরানো পোণাঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাবো পুরানো সব ভাঙাঘাট, পেরিয়ে যাবো ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাবো ইটখোলা আর চালের আড়ৎ, কেঠোপটি আর পাঁজাকরা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা। আমরা চলেছি পোণার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টই-টম্বর জল, আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোণার চারা বিক্রি হবে কুণ্‌কে হিসাবে পোণাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোর বেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য হয়তো উঠেছে পুবের বাঁকা নগর-শিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ানো স্তিমিত একটু আলো। সে-আলোয় এদিকের দরিদ্র শহরতলীকে আরও যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড় কেউ আসে নি, গোলাগুলি ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব শাল্‌তি বাঁধা। সব খাঁ খাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড় নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছই-এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে ব'সে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি ক'রে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না —সেই বঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝ-নদীতে।

বাদ্‌লা রাতে আকাশে ছিল না তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে; দু'ধারে জাহাজ আর স্টীমার, গাধাবোট আর বড় বড় কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোঁটা, অগুন্তি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাগুলিই ত' নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়তো ধম্‌কে আবার দেবে পাঠিয়ে ছই-এর ভেতর! কিন্তু

সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছই-এর ভেতর— নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে! তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দু'চোখ দিয়ে পান করেছে আলো-ছিটানো এই নগরের অন্ধকার আর নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধম্‌কে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই ত' বিশ্বাস নেই। বাবা ত' তাকে আনতেই চায়নি বাড়ি থেকে। ছেলেমানুষ আবার শহরে যায় নাকি! আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কি করবে সে সেখানে গিযে? কত কাকুতি মিনতি ক'রে, কেঁদে-কেটে না রতন শেষ পর্যন্ত বাবাকে নিমরাজি করিয়েছে। তবু নৌকায় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে— খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজি। সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়— রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা সেকথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিম্বা লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্য করে না। রতন ব'সে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন, কোথাও হালকা, সে-রঙের ছোপ তখনও নির্দিষ্ট রূপ দেয়নি। নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এই মাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তলগুলি উঠেছে ছোটখাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা সে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায় ছোট শোলার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছানো ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কুয়াশা। সে-কুয়াশা জমাট বেঁধে হ'য়ে গেল অনেকগুলো গাধা-বোটের জটলা— একটি জেটির চারিধারে

তারা ভিড় ক'রে আছে। দূর থেকে মনে হয়, ওরা যেন কোন বিশাল জলচরের শাবক—মায়ের কোল ঘেঁসে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা আরো গেল স'রে। কল-কারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু'পারে। জলের ওপর তাদের লৌহ-বাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধানো পাড় থেকে বড় বড় ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে, দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশে পাশে জেলে ডিঙি আর খেয়া নৌকা, স্টীমার আর লঞ্চ ভিড় ক'রে আছে। এই মহানগর! ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুরানো শহরতলীর ভেতর দিয়ে। বড় নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরানো জীর্ণ শহরতলী দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে-কথা এখন থাক্।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল। আগে থাকতে পোণার সব নৌকা এসে জুটেছে পোণাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষ্মণ উঠে তার কুণ্‌কে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন ব'সে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোট ঠোঁটের নিচে কি সঙ্কল্প আছে, জানে কি কেউ? বড় বড় দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু শহর দেখার কৌতূহল ত' এ নয়! কিন্তু সেকথা এখনও থাক।

পোণাঘাটে এসে নৌকা লাগে। পোণাঘাটে আর জায়গা কই দাড়াবার! এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দু'ধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে পোণার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভিড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কা'রা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁক ডাক ক'রে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দদাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ ত' আর যে সে লোক নয়। বর্ষার ক'টা মাসে তার গোটা ছয়েক পোণার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে সুরু করেছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুণ্‌কে পরখ করছে— মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দদাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে— "তুই নামলি যে বড়!"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে— "আচ্ছা কোথাও যাস নি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা!"

রতন তাই করে। কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁৎলে নোংরা হয়ে গেছে। পোণা-চারার হাটে কদমফলের কদর নেই।

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ি গিয়ে মাছচচ্চড়ি খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি! ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হ'ল। ব'সে ব'সে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদম-রেণু মিশে গেছে।

রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি ক'রে সে ত' শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে। মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল— "হ্যাঁ কাকা, পোণাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি, না?"

লক্ষ্মণকাকা হেসে বলেছে— "দূর পাগ্‌লা, উল্টোডিঙি কি সেথা! সে হ'ল কতদূর।" তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে— "কেন রে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙির নাম তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। তার পেটের কথা বা'র করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতন এক সময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়াল মতো ধ'রে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে; —কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে— তার দুঃসাহস ত' কম নয়।

অনেক দূর গিয়ে রতন সাহস ক'রে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, বলে— "এ ত' অন্য দিকে এসেছো ভাই, উল্টোডিঙি ওইদিকে, আর সে ত' অনেক দূর!"

—অনেক দূর! তা' হোক, অনেক দূরকে রতন ভয় করে না। রতন অন্যদিকে ফেরে। লোকটি কি ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করে— "তুমি একলা যাচ্ছ অত দূর! তোমার সঙ্গে কেউ নেই?"

রতন সঙ্কুচিতভাবে বলে— "না।"

লোকটির কি মনে হয়, একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে— "বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না ত'? উল্টোডিঙিতে কা'র কাছে যাচ্ছ?"

রতন ভয়ে ভয়ে ব'লে ফেলে— "সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধ'রে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে!

এবার তাহ'লে বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বা'র করবে। শহর মানে তার দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে-ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয় নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে!

কিন্তু দিদিকে খোজার কথা ত' কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা, তাকি সে জানে না। অনুচ্চারিত কোনো নিষেধ তার শিশু-মনের ব্যাকুলতাকে মূক ক'রে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বা'র করতেই হবে। দিদি না হ'লে তার যে কিছু

ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে ত' মাকে দেখে নি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হ'য়ে দিদি গেছ্‌ল শ্বশুরবাড়ি। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। কাছাকাছি দু'টি গাঁ, রতন নিজেই যখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হ'য়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন ক'রে বুঝবে!

তারপব কি হ'ল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় ক'রে, ভিড় ক'রে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ ব'লে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে— দিদিকে কা'রা নাকি ধ'রে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনলেই ত' হয়! কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হ'য়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে, শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধ'রে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কা'রা নিযে গেছে দিদিকে ধ'রে! তারা হযতো দিদিকে মারছে, হয়তো দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়তো রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। একথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন— "কান্না কেন বাবা?"

চুপি চুপি বতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে— "আসবে বৈ কি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে।"

রতন আর কিছু বলে নি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড় ভয় হ'য়েছে!

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা-সাহেব, পুলিস নিয়ে গিযে তাকে নাকি কোন দুর দেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে! রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তাহ'লে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন, দু'দিন, ব্যাকুলভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে, তবু দিদি কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপরই তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তাকি তার মনে নেই। দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন? রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়তো দিদি চুপি চুপি শ্বশুরবাড়ি গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে ত' দিদি নেই! সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভালো ক'রে কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না, দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি কাঁদো কাঁদো ক'রে রতন সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আব্দার করেছে— "দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেইদিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসে নি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে মনে জানে, তাকে কেউ ডাকতে যায় নি ব'লেই অভিমান ক'রে দিদি আসে নি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না-হ'লে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনতো।

কিন্তু কেমন ক'রে সে জানবে দিদি কোথায় আছে! কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপি চুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে; দিদি কেমন ক'রে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে মনে তাব সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে, যে, দিদি থাকে শহরে— রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে— উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি ক'রে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বা'র করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে অনেক-কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরও বড় কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি হারিয়ে যাবে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা ব'লে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতরমুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায়-ছাওয়া একটি মেটে বাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে ক'রে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কি না পারে!

খানিক আগে হয়রান হয়ে খোঁজ করতে করতে রতন দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়। উৎসাহভরে সে চিৎকার ক'রে ডাকে— "দিদি!"

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হয়ে যায়। তার দিদি ত' অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে— "শোনো।"

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুকনো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে— "কাকে খুঁজছ ভাই?"

রতন লজ্জিতভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে— "তোমার দিদির বাড়ি বুঝি চেন না, চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে— "ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষ স্বরে বলে— "কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দুইজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে-মেয়েটি রতনকে সঙ্গে ক'রে এনেছে সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে— "তোর নাম ক'রে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ি দেখাতে নিয়ে এলাম! তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা-গলায় বলে— "তুই একা এসেছিস্‌!"

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনও কখনও পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছুকে দাগী ক'রে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে-ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন ক'রে সাজানো হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন ক'রে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম— "এ-সব তোমার দিদি?"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে— "হ্যাঁ ভাই!"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না ত'। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে— "তোমায় কিন্তু বাড়ি যেতে হবে দিদি!"

চপলা বুঝি একটু চম্‌কে ওঠে, তারপর ম্লানভাবে বলে— "আচ্ছা যাবো ভাই, এখন ত' তুই একটু জিরিয়ে নে!"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকো কাল সকালেই ছাড়বে কিনা! এ-সব জিনিস কেমন ক'রে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না, একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে— "একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে ত' দিদি?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই

হয়তো রাজি হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে— "এসব জিনিস একটা গোরুর-গাড়ি ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি ?"

চপলা কাতরমুখে ব'লে ফেলে— "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই !"

যাবার উপায় নেই ! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই ! বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে— "আমিও তাহ'লে যাবো না দিদি !"

"কোথায় থাকবি ?"

"বাঃ, তোমার কাছে ত' !" —ব'লে রতন হাসে ; কিন্তু চপলার মুখ যে আরও ম্লান হয়ে আসছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়ে-দেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে— "তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয়তো খুব ভাবছে !"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্যভরে বলে— "ভাবুক গে !"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে— "এখান থেকে নড়ালের পোল অনেক-খানি পথ, না রতন ?"

রতন এ-পথ পার হয়ে-ই ত' এসেছে। গর্বভরে সে বলে— "ওরে বাবা, সে বলে কোথায় !"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে ক'রে, না-হয় বাসে, যেতে পারিস্ না ?"

"বাঃ, আমি কি যাচ্ছি নাকি ?"

দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায় ! দিদির চোখে জল।

মাথা নিচু ক'রে চপলা ধরা-গলায় বলে— "এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই !"

রতন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে

নেই! আচ্ছা সে চলেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মতো। ধীরে ধীরে সে বলে— "আচ্ছা আমি যাবো।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারি থেকে চারটে টাকা বার ক'রে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে— "তুই খাবার খাস্।"

চার টাকায় অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলেছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়তো দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা-গলায় বলে— "বাসে ক'রে যাস্ রতন, হেঁটে যাস নি!"

রতন সে-কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদ্‌লে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে— "বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি! কারুর কথা শুনব না!"

ব'লেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।
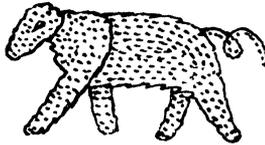
# স্টোভ

স্টোভটা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধ'রে যায়। কোনরকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে এমন দপ্ দপ্ ক'রে ওঠে যে ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে— "কি গো, এখনো চা হ'ল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?"

"তা হ'লই বা ট্রেন ফেল। জলে ত' আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।"

শশিভূষণ এবার আরো একটু ব্যস্তভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। "না, না, তুমি বুঝতে পারছ না ··"

শশিভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বাসন্তী একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে, "বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কি ক'রব বলো। দুটো বৈ দশটা হাত ত' আর নেই!"

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, "তুমি আবার এই স্টোভ বা'র করেছ!"

"বা'র ক'রব না ত' ক'রব কি? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব-কিছু হয়?" — শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে— "তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে ত' আর বিদেয় করতে পারি না।"

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে!

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিতভাবে বলে, "স্টোভটা কিন্তু না জ্বাললেই পারতে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই, আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও, তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি! আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা এসব হচ্ছে কি বলুন ত' বৌদি?" মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায় থাকার দরুন চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেকক্ষণ হয়েছে, তবু বৌদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধ হয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে—"কি আর হচ্ছে ভাই। কিছুই ত' পারলাম না।"

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে ব'সে পড়ে। "আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন," —ব'লে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে—"থাক্, শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমতো কুটুম্বিতে স্থরু ক'রে দিলেন! তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ ক'রে না আসতে হ'ত।"

বাসন্তী স্বামীব দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বলে— "সে-দোষ ত' ভাই আমার নয।"

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধ'বে উঠেছে। চায়ের কেটলিটা তার ওপব চাপিযে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে, বলে— "আমায একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা ব'সে ততক্ষণ গল্প করুন।"

বাসন্তী উঠে চলে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পাবে না। স্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেযে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকব।

মল্লিকা মাথা নিচু ক'রেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা-গলায় বলে— 'এ ভাবে এসে বোধ হয ভালো করিনি।"

কথাগুলো আরো মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। স্টোভের আওয়াজের দরুন গলাটাকে একটু বেশি চড়াতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুনই মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু স্থলভ হয়ে পড়ে।

"না, না, খারাপ আবার কিসের?" শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্ট ভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশিভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, "কেন যে এতদিন বাদে এ

খেয়াল হ'ল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদ্‌লাবার জন্যে স্টেসনে অপেক্ষাও করেছি চার পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।"

শশিভূষণ কোন জবাব দেয় না।

স্টোভটা হঠাৎ দপ্‌দপ্‌ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিভে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু স'রে ব'সে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভ'রে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, "আরে আরে করছ কি? অত পাম্প দিও না।"

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে— "কেন?"

"মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।"

শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, "তাহ'লে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়— না?"

শশিভূষণ কেমন একটু সঙ্কুচিতভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে, "তোমার স্ত্রী মানে বৌদি ত' এই স্টোভই জালেন?"

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে— "না, খারাপ হয়ে গেছে ব'লে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বা'র করেছে কে জানে।"

"ও" ব'লে মল্লিকা এবার মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ শশিভূষণ চম্‌কে উঠে বলে— "ও কি হচ্ছে কি? বলছি পাম্প দিও না, বিপদ হতে পারে।"

স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড় একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে— "বিপদ আবার কি হ'ল?"

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে— "দেখুন ত' বৌদি! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে! স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি?"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোট টেবিলটার উপর রেখে বলে— "খারাপ হতে যাবে কেন? ওঁর ওই রকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হ'লেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়!"

"আমিও তাই বলি।" মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেট্‌লির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন ক'রে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে ব'সে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে— "থাক্ ভাই থাক্, আর দরকার নেই। দু'দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাট্‌লে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।"

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে— "আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন যে স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।"

"না, ভয় পাবো কেন? ফাটবার হ'লে ও-স্টোভ অনেক আগেই ফাটতো!" বাসন্তী গলার স্বরটা তারপর পাল্টে বলে— "আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ও-ঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি-সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে।"

"না, আপনি লৌকিকতার চরম ক'রে ছাড়লেন।" —ব'লে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চ'লে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চম্‌কে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে বলে— "তোমার ভাই আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে যাবে ব'লে ভয় দেখালাম— তবু শুনল না।"

"তা' যাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।"

কথাটা কোনরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর শশিভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ-কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে— 'তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাবো ব'লে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক দিন নিভে গেলেও একটা ছুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।'

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজ ভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে— "তোমার এখানকার চাকরি ত' প্রায় চার বছর হ'ল— না?"

"হ্যাঁ, প্রায় তাই।"

"ভালো লাগে এই রকম মফস্বল শহরে প'ড়ে থাকতে?"

"না লাগলে উপায় কি? কলকাতার কোন কলেজে চাকরি পাওয়া ত' সোজা নয়।"

উপায় কি? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে ব'সে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি ক'রেই সে দুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়তো তাদের জীবনের ইতিহাস আর এক রকম হ'তে পারতো।

সেদিনটা এখনো তার ভালো ক'রেই মনে আছে। অনেক ভেবে চিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হ'লেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হ'লেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হয়ে আশ্চর্য পাথর হয়ে গেছে,

গ্রহলোক থেকে যত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব ক'টা নিদর্শন দু'তিন বার ঘুরে দেখেও আর সময় ফুরোতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকি থাকেনি। তবু সে এ-হতাশাকে আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোন কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারে নি। সমস্ত সঙ্কোচ জয় ক'রে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে— "কি বললেন?"

"মা?" শশিভূষণ যেন চমকে গেছে একটু। তারপব চুপ ক'রে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে— "মাকে কিছু বলিনি এখনো।"

মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে— "মাব শরীব খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন চেঞ্জের জন্য।"

অনেকক্ষণ, প্রায যেন একযুগ স্তব্ধ হযে থাকবার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, "তুমি,—তুমিও যাচ্ছ নাকি?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে শশিভূষণ বলেছে, "মা যেতে বলছেন। তা ছাড়া— তাছাড়া ভাবছি যা-কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।"

মল্লিকা আর কোন কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হয়ে গেছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে— "আমি না বললেও বাড়ির সবাই জানে — মাও জানেন।"

এ-কথারও কোন উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয় নি। একান্তভাবে ছোট একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ ক'রে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মতো— "শরীর খারাপের ওপর মা হয়তো বড় বেশি বিচলিত হয়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনো কিছু বলিনি। আমি জানি, মাকে আমি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারবো।"

একটা জ্বালাময় উত্তর মল্লিকাব বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানোটাই কি এত বড! আমার কি বাড়ি-ঘর আত্মীয়-সমাজ কিছু নেই? তোমার মাব অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপবই কি আমার জীবন নির্ভব করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেইখানেই বোধ হয জীবনের চবম ভুল কবেছে। শশিভূষণ সেই জাতেব মানুষ, নিজেব মনকে নিজেই যাবা সাহস ক'বে চিনতে চায় না। তাদেব পেতে হ'লে জোর ক'বে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয। কি ক্ষতি ছিল সেদিন আব একটু নির্লজ্জ হ'য়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমাব ক'বে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা কবলে শশিভূষণকে সে আব ফিবে না যেতে দিতে পাবত। শশিভূষণেব নিজেব মধ্যে কোন প্রেবণা নেই? কিন্তু ইচ্ছে কবলে সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তাব মধ্যে সঞ্চাবিত ক'রে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নাবীসুলভ সঙ্কোচে আর লজ্জায, আব বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন কবেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল কবেছে কি? চকিতে এ-প্রশ্ন তাব মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয উদ্ভাসিত ক'বে দেয। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধ'বে প্রতিটি মুহূর্ত সে নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় ক'রে নিলে সে কি সুখী হ'ত? ভিজে সল্‌তেয় সারা জীবন ধ'বে আগুন ধরিযে বাখাব ব্রত ক্রমশঃ একদিন দুর্বহ হযে উঠত না কি?

"স্টোভটাব আওয়াজটা বড বিশ্রী শোনাচ্ছে না?" —শশিভূষণের কথায় মল্লিকাব চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে সে বলে— "ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বৌদি ত' বললেন স্টোভ মোটেই খাবাপ নয।"

কেট্‌লিব জল ফুটে উঠে স্টোভেব উপব উথ্‌লে পডতেই বাসন্তীর যেন হুঁস হয়। কেট্‌লিটা নামিযে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিভিয়ে দেবাব জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরানো আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ-বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই এই স্টোভটাই সে শেষ-মুক্তির পথ ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোন অপবাদ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হ'ল।

সেদিন অত বড় নিদারুণ সঙ্কল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চয লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত ক'রে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কিভাবেই না কল্পনা করেছে! সে-কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাৎ হবে সে ভাবতেও পারে নি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে-রূপও তার নেই যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পাবে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে ব'লে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকোনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাৎ কম ত' হ'ল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনদিন শোনে নি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী ত' আছে, সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে, ঘবে পাঠাবাব আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে এক ঠান্দি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা ক'রে বলছিলেন— "ওরে সাজিয়ে ত' দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস ত'? নইলে ও উড়ো পাখীকে বাঁধবে কি দিয়ে?"

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানোই যাদের আনন্দ তা'রা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু একটু ক'রে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকি থাকে নি।

স্বামীর মুখে একবার-আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হ'ত না যতটা হয়েছে তাঁর আপাতনির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভেতরটা জ্বালা

ক'রে উঠেছে। হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই স্বামী এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান ত' আমায় বিয়ে করতে গেছ্‌লে কেন? —ইতরের মতো ঝগড়া ক'রে একথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমতো। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চম্‌কে জিজ্ঞাসা করেছে— "যাচ্ছো কোথায়?"

"বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।"

ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোন কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোন কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলতো, "গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি" তাহ'লেও স্বামী বোধ হয় শুধু একটু 'ও' ব'লে নিশ্চিন্ত মনে চুপ ক'রে থাকতেন। অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে ব'সেই তাই তার মনে হয়েছে, কি ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ ক'রে দিলে। শাশুড়ি তখনও বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান ক'রে গেছেন— 'ও স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বৌমা? ওটা খারাপ হয়ে গেছে ব'লে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু, ফেটে-টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।'

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি! হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোন দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে ধীরে কবে থেকে যে সব বদ্‌লে গেছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশঃই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক-পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোন ভালোবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য? যার মনের, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোন

আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে যেখানে অত বড ভালোবাসা নিঃশব্দে গোপন ক'বে বাখা যায়। কোনোদিন কোন রঙ যদি শশিভূষণেব মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থিব বিশ্বাসে জানে যে, সে রঙ অনেক আগেই ধুযে মুছে নিশ্চিহ্ন হযে গেছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকাব কথা তুলেছে স্বামীব কাছে।

"ওগো এখানে গোকুলপুবেব মেযেদেব স্কুলে নতুন কে হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ হযেছেন জানো? তোমাদেব সেই মল্লিকা বায।"

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে আলাপ এ প্রথম। তবু বাসন্তীব কথায বা কথার ধবনে শশিভূষণেব কোন ভাবান্তবই চোখে পডে না। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে বলে— "হ্যাঁ, শুনেছি।"

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা কবে নি। সে আবার একটু খোঁচা দেবাব জন্যেই বলে— "আমাদেব এই জংশন স্টেশনেই ত' গাডি বদল ক'বে যেতে হয়। একবাব আসতে বলো না কেন?"

"কি জন্যে?" শশিভূষণ যেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা কবেছে।

"কি জন্যে আবাব! একবাব একটু দেখতাম।" —ব'লে বাসন্তী সেখান থেকে চ'লে গেছে।

শশিভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোনো জ্বালা, কোনো সংশয় বাসন্তীব মনে আর নেই। সে বরং খুশি হযেছে মনে মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যেব দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেযেছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে এ যেন তারই ঋণশোধ।

ও-ঘবে ব'সে এখনও ওরা গল্প করছে। কি-গল্প করছে কে জানে? যাই করুক কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে তাব কোন ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পাবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পডে যাওয়ায় বাসন্তী চম্‌কে ওঠে। কি ভাববে তাহ'লে মল্লিকা? কি ভুল ধারণাই না সে করতে পাবে! অনায়াসেই ভাবতে পারে এই নিদারুণ নাটকীয় পবিণামেব সেই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ।

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেভাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কি ক'রে? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা! কিন্তু, না, সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তাহ'লে মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও স'রে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পাবে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই— কিছুতেই আজ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।
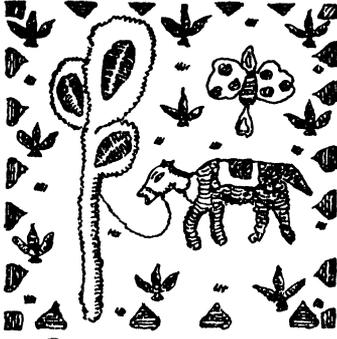
"রবিনসন ক্রুশো! আসলে তিনি কে ছিলেন জানেন? একজন মেয়ে।" সকলের দিকে চেয়ে একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "তবে আপনারা আর সে-কথা জানবেন কি ক'রে?"

আহত অভিমানে শিবপদবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর সকলের চোখের ইশারায় নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

ঘনশ্যামবাবুর এই উক্তি নিঃশব্দে হজম ক'রে উৎসুকভাবে সকলে তাঁর দিকে তাকালেন।

ঘনশ্যামবাবুর কথার প্রতিবাদ পারতপক্ষে কেউ আজকাল করেন না। কেন যে করেন না তা বুঝতে গেলে ঘনশ্যামবাবুর এই বিশেষ আসরটি ও তাঁর নিজের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে একটি কৃত্রিম জলাশয় আছে, করুণ রসিকতার সঙ্গে আমরা যাকে হ্রদ ব'লে অভিহিত ক'রে থাকি। জীবনে যাদের কোন উদ্দেশ্য নেই অথবা উদ্দেশ্যের একাগ্র অনুসরণে যারা পরিশ্রান্ত, উভয় জাতের সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় সেই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজের নিজের রুচি-মাফিক স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই নব চতুর্বর্গের সাধনায় একা একা বা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় বা ব'সে থাকে।

এই জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে জলের কাছাকাছি এক একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি বৃত্তাকার আসন পরিশ্রান্ত বা দুর্বল পথিক ও নিসর্গদৃশ্য-বিলাসীদের জন্য পাতা আছে।

ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে এমনি একটি বৃত্তাকার আসনে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় পাঁচটি প্রাণীকে একত্র দেখা যাবে। তাঁদের একজনের শিরোশোভা কাশের মতো শুভ্র, একজনের মস্তক মর্মরের মতো মসৃণ, একজনের উদর কুম্ভের মতো স্ফীত, একজন মেদভারে হস্তীর মতো বিপুল আর একজন উষ্ট্রের মতো

শীর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। প্রতি সন্ধ্যায় এই পাঁচজনের মধ্যে অন্ততঃ চারজন এই বিশ্রাম-আসনে এসে সমবেত হন এবং আকাশের আলো নির্বাপিত হয়ে জলাশয়েব চারিপার্শ্বের আলো জ্বলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি, স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার দর থেকে বেদান্ত-দর্শন পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব আলোচনা ক'রে থাকেন।

ঘনশ্যামবাবুকে এ-সভার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রাণান্তও অবশ্য তিনিই। এ-আসর কবে থেকে যে তিনি অলঙ্কৃত করেছেন ঠিক জানা নেই, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এ-আসরের প্রকৃতি ও সুর একেবারে বদ্‌লে গেছে। কুম্ভের মতো উদরদেশ যাঁর স্ফীত সেই রামশরণবাবু আগেকার মতো তাঁর ভোজন-বিলাসের কাহিনী নির্বিঘ্নে সবিস্তারে বলার সুযোগ পান না, ঘনশ্যামবাবু তার মধ্যে ফোড়ন কেটে সমস্ত রস পাল্টে দেন।

রামশরণবাবু হয়তো সবে গাজরের হালুয়ার কথা তুলেছেন, ঘনশ্যামবাবু তারই মধ্যে রানী এলিজাবেথের আমলে প্রথম কিভাবে হল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে গাজরেব প্রচলন হয় তার কাহিনী এনে ফেলে সমস্ত প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কোন দিন বিলিতি বেগুনের 'জেলি' সম্বন্ধে রামশরণবাবুর উপাদেয় আলোচনা সুরু না হতেই ঘনশ্যামবাবু তাঁর শীর্ণ হাড়বেরুনো মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি টেনে বলেন, "হ্যাঁ, বেগুন বলতে পারেন তবে বিলিতি নয়।"

তারপর কবে দু'শ খ্রীস্টাব্দে গ্যালেন নামে কোন গ্রীক বৈদ্য মিশর থেকে আমদানী এই তরকারিটির বিশদ বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, তারও প্রায বারোশ' বছর বাদে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে কিভাবে জিটোমেট্ নামে অ্যাজ্‌টেক জাতের এই তরকারিটি টোম্যাটো নামে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে প্রচলিত হয়, বিষাক্ত ভেবে কত দিন খাদ্য হিসাবে টোম্যাটো ব্যবহৃত হয়নি সেই কাহিনী সবিস্তারে ব'লে ঘনশ্যামবাবু ভোজন-বিলাসের প্রসঙ্গকে ইতিহাস ক'রে তোলেন।

মস্তক যাঁর মর্মরের মতো মসৃণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবুর ঐতিহাসিক কাহিনীকেও আবার তেমনি ভোজন-বিলাসের গল্পে তিনি অনায়াসে ঘুরিয়ে দেন।

আসল কথা এই যে, সব বিষয়ে শেষ কথা ঘনশ্যামবাবু ব'লে থাকেন। তাঁর কথা যখন শেষ হয় তখন আর কিছু বলবার সময় কারুর থাকে না।

তাঁর ওপর টেক্কা দিয়ে কারুর কিছু বলাও কঠিন। কথায় কথায় এমন সব অশ্রুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ধৃতি তিনি ক'রে বসেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাবার ভয়েই যার প্রতিবাদ করতে কারুর সাহসে কুলোয় না।

ঘনশ্যামবাবু এই সান্ধ্য-আসরের প্রাণস্বরূপ হ'লেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু কারুর জানা নেই। কলকাতার কোন এক মেসে তিনি থাকেন ও ছেলে-ছোকরাদের মহলে ঘনাদা'-রূপে তাঁর অল্পবিস্তর একটা খ্যাতি আছে এইটুকু মাত্র সবাই জানে। শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা কঠিন, আর তাঁর মুখের কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি যান নি, এমন কোনো বিদ্যা নেই যার চর্চা তিনি করেন না। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশিলা থেকে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড, চীনের প্রাচীন পিপিন থেকে ইউরোপের সালের্না, প্রাগ, হিডেলবার্গ, লাইপ্‌জিগ্ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে ব'লে মনে হয়।

তাঁর পাণ্ডিত্যে যত ভেজালই থাক, তার প্রকাশে যে মুন্সিয়ানা আছে একথা স্বীকার করতেই হয়।

তাঁর কথার প্রতিবাদ না ক'রে আমরা আজকাল তাই নীরবে তাতে সায় দিযে থাকি।

রবিনসন ক্রুশোর প্রসঙ্গটার বেলায়ও সেই জন্যেই জিভের উদ্যত বিদ্রোহ আমরা কোনরকমে সামলে নিলাম।

মাথার কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবুর ছোট্ট দৌহিত্রীটির দরুন সেদিন প্রসঙ্গটা উঠেছিল।

দৌহিত্রীটিকে সেদিন হরিসাধনবাবু বুঝি আদর ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসে-ছিলেন। যে-বয়সে ছেলেদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা মেয়েরা বুঝতে শেখে না বা বুঝেও মানতে চায় না, মেয়েটির বয়স ঠিক তাই। আমাদের গল্প-গুজবের মধ্যে কিছুকাল মনোনিবেশ করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে হ্রদের মাঝখানের দ্বীপের মতো জায়গাটিকে দেখিয়ে সে বুঝি বলেছিল, "দেখেছ দাদু, ঠিক যেন রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ!"

দাদু কিম্বা আর কারুর মনোযোগ তবু আকর্ষণ না করতে পেরে সে আবার বলেছিল, "বড় হ'লে আমি রবিনসন ক্রুশো হ'ব জানো।"

এত বড় একটা দুঃসাহসিক উক্তির প্রতি উদাসীন থাকা আর বুঝি আমাদের

সম্ভব হয়নি। মেদভারে যাঁর দেহ হস্তীর মতো বিপুল সেই চিন্তাহরণবাবু হেসে বলেছিলেন, "তা কি হয় রে পাগ্‌লী। মেয়ে-ছেলে কি রবিনসন ক্রুশো হ'তে পারে।"

মেয়েটির হ'য়ে হঠাৎ ঘনশ্যামবাবুই প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "কেন হয় না?"

একটু চুপ ক'রে কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সঙ্গে আমাদের দিকে চেয়ে তিনি আবার যা বললেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

আমাদের কোন প্রতিবাদ করতে না দেখে ঘনশ্যামবাবু এবার সুরু করলেন, "রবিনসন ক্রুশো ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা ব'লেই আপনারা জানেন। এ-গল্পের মূল কোথায় তিনি পেয়েছিলেন তা জানেন কি?"

মস্তক যাঁর মর্মরের মতো মসৃণ সেই শিবপদবাবু সসঙ্কোচে বললেন, "যত দূর জানি, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক ব'লে একজন নাবিকের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই এ-গল্প তিনি বানিয়েছিলেন।"

"যা জানেন তা ভুল!" ঘনশ্যামবাবুর মুখে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা ফুটে উঠল, "আত্মম্ভরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিখে গেছে তাই অম্লান বদনে বিশ্বাস করেছেন। মনমাউথের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে ড্যানিয়েলের একবার ফাঁসি হবার উপক্রম হয় জানেন ত'? লণ্ডনের বাসিন্দা ব'লে কোনরকমে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পান। তারপর নতুন রাজা-রানী উইলিয়ম আর মেরী দেশে আসার পর ড্যানিয়েল কুগ্রহ কাটিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই সময় ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় স্পেনে। সেই স্পেনেই মাদ্রিদ শহরের এক ইহুদী বুড়োর দোকানে খুঁটিনাটি জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুঁথি পেয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। সে-পুঁথির অনুলেখক রাস্তিসিয়ানো আর তার কথক স্বয়ং মার্কো পোলো।"

উদর যাঁর কুম্ভের মতো স্ফীত সেই রামশরণবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মার্কো পোলো মানে, যিনি ইউরোপ থেকে প্রথম চীনে গেছলেন পর্যটক হয়ে, রবিনসন ক্রুশোর মূল গল্পের লেখক তাহ'লে তিনি!"

একটু রহস্যময়ভাবে হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "না, তিনি হবেন কেন! তিনি শুধু সে-গল্প সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন মাত্র। সংগ্রহ করেছিলেন চীন থেকে।

"ষোল বছর বয়সে মার্কো পোলো তাঁর বাপ আর কাকার সঙ্গে পৃথিবীর

অদ্বিতীয় সম্রাট কুবলাই খাঁ-র রাজধানী ক্যাম্বালুকের উদ্দেশে সাগর-সম্রাজ্ঞী ভেনিসের তীর থেকে রওনা হন। ফিরে যখন আসেন তখন তাঁর বয়স একচল্লিশ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধ'রে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর কুবলাই খাঁ-র বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে প্রায় সমস্ত চীন তিনি পর্যটন ক'রে ফিরেছেন। ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে ইয়াং চাওয়ের এক লবণের খনির পরিদর্শক হিসাবে কাজ করবার সময় বিখ্যাত চীনা লেখক ও সম্পাদক সান কাও চি-র সঙ্গে তাঁর সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ হয়। সান কাও চি তখন অতীতের সমস্ত চীনা-কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ ক'রে তাতে নতুন রূপ দিচ্ছেন। সেই সান কাও চি-র কাছে শোনা একটি চীনা গল্পই রবিনসন ক্রুশোর প্রধান প্রেরণা।

"মার্কো পোলোরা চীন থেকে তাঁদের বিশ্রী নোংরা বেঢপ তাতার পোষাকের ভেতরে সেলাই ক'রে শুধু হীরা মতি নীলা চুনিই নয় আরো অনেক কিছুই এনেছিলেন। ভেনিসের ডোজেকে তাঁরা যা যা উপহার দেন, ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দে লেখা মারিনো ফালিএরোর প্রাসাদের মূল্যবান্ দ্রব্যের তালিকায় তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সে-সব উপহারের মধ্যে ছিল স্বয়ং কুবলাই খাঁ-র দেওয়া আংটি, তাতারদের পোষাক, তেফলা একটি তরবারি, টাঙ্গুটের চমরী গাই-এর রেশমী লোম, কস্তুরী-মৃগের শুকিয়ে-রাখা পা আর মাথা, সুমাত্রার নীল গাছের বীজ।

"কিন্তু বাইরে যা এনেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ এনেছিলেন পোলো তাঁর স্মৃতিতে বহন ক'রে। জেনোয়া-র কারাগারে ব'সে সেই স্মৃতি-সমুদ্র-মন্থিত কাহিনীই তিনি মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে ব'লে যেতেন।

"মুগ্ধ শ্রোতা কা'রা? না, শুধু তাঁর কারাসঙ্গীরা নয়, জেনোয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের আমীর-ওমরাহ পুরুষ-মহিলা সবাই। এই কারাকক্ষ তখন জেনোয়া-র তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে— রূপকথার চেয়ে বিচিত্র সুদূর ক্যাথের অপরূপ কাহিনীর মধুতীর্থ।

"কিন্তু সাগর-সম্রাজ্ঞী ভেনিসের পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র মার্কো পোলো জেনোয়া-র কারাগারে কেন? সে অনেক কথা। দেশে ফেরবার মাত্র তিন বছর বাদে ভেনিসের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী জেনোয়া-র নৌবাহিনী লাম্বা দোরিয়ার নেতৃত্বে একেবারে আড্রিয়াতিক সাগরে চড়াও হয়ে এল। আর সকলের সঙ্গে মার্কো পোলো গেলেন একটি রণতরীর অধিনায়ক হয়ে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে

পরাজিত হয়েই আরো সাত হাজার ভেনিসবাসীর সঙ্গে তিনি জেনোয়ায় বন্দী হ'লেন।

"জেনোয়া-র কারাগারে তাঁর মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে হেলে-পড়া মিনারের শহর পিসা-র এক নাগরিক ছিলেন। নাম তাঁর রাস্তিসিয়ানো। কাব্যের ভাষা প্রেমের কাহিনীর অপরূপ ভাষা হিসেবে ফরাসী তখনই ইউরোপে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পিসা-র লোক হ'লেও সেই ফরাসী ভাষায় রাস্তিসিয়ানোর অসাধারণ দখল ছিল। মার্কো পোলোর অপূর্ব সব কাহিনী সেই ভাষায় তিনি টুকে রাখতেন।

"তাঁর সেই টুকে-রাখা কাহিনীই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে তারপর। দেড়শ' বছর বাদে জেনোয়া-র আর এক নাবিক সেই কাহিনীর ল্যাটিন অনুবাদ পড়তে পড়তে, সিপাঙ্গুর সোনায় মোড়া প্রাসাদচূড়া যেখানে প্রভাত-সূর্যের আলোয় ঝলমল করে সেই সুদূর ক্যাথের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন। সে-নাবিকের নিজের হাতে সই করা ও পাতার ধারে ধারে মন্তব্য লেখা বইটি এখনো সেভিলের কলম্বিনায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়। সে-নাবিকের নাম কলম্বাস।

"আরো প্রায় দু'শ বছর বাদে ড্যানিয়েল ডিফো মাদ্রিদের এক টুকি-টাকি সখের জিনিসের দোকানে রাস্তিসিয়ানোর অনুলিখিত এমনি আর একটি পুঁথির সন্ধান পান। সেই পুঁথি থেকেই তেত্রিশ বছর বাদে রবিনসন ক্রুশোর গল্প তিনি গড়ে' তোলেন।"

মর্মরের মতো মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু এবার বুঝি না ব'লে পারলেন না, "কিন্তু রবিনসন ক্রুশো মেয়ে হ'লেন কি ক'রে?"

"সান কাও চি-র যে-গল্প মার্কো পোলোর মুখে শুনে রাস্তিসিয়ানো টুকে রেখেছিলেন, তাতে মেয়ে ব'লেই তাঁকে বর্ণনা করা আছে। ড্যানিয়েল অবশ্য সে-গল্পের নায়িকার নাম ও জাতি দুই-ই পাল্টেছেন।"

মাথার কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু বললেন, "কিন্তু সেই পুঁথির গল্পটা কিছু শুনতে পারি?"

"সেই গল্প শুনতে চান? কিন্তু আসল কাহিনী অনেক দীর্ঘ, সংক্ষেপে তার সারটুকু আপনাদের বলছি শুনুন······

"সুং রাজবংশের রাজধানী তখনও উত্তরের কাইফেং থেকে টাঙ্গুট দৌরাত্মে কিন্‌সাই নগরে সরিয়ে আনা হয়নি। পৃথিবীর আশ্চর্যতম শহর হিসাবে কিন্‌সাই-এর নাম কিন্তু তখনি মালয়, ভারতবর্ষ, পারস্য ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপে পর্যন্ত

পৌছেছে। দ্বাদশ তোরণ ও দ্বাদশ সহস্র সেতুর এই নগরে চুয়ান উ নামে এক সদাগর তখন বাস করেন। সদাগরের মণি-মাণিক্য ধন-রত্নের অবধি ছিল না, কিন্তু সব চেয়ে মূল্যবান্ যে-সম্পদ তাঁর ছিল, সে হ'ল তাঁর একমাত্র কন্যা নান স্থ।

"কিন্‌সাই-এর খ্যাতি যেমন সারা পৃথিবীতে, নান স্থ-র রূপের খ্যাতি তেমনি সারা চীনে তখন ছড়িয়ে গেছে। অসামান্য রূপ হয় নিজের, নয় সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনে। নান স্থ-র রূপের বেলায়ও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল না। উত্তরের কিতানরা তখন কাইফেং-এর ওপর সমুদ্রের তরঙ্গের মতো বার বার হানা দিচ্ছে। সেই কিতানদের দলপতি চুয়ো সান-এর কানে একদিন কি ক'রে নান স্থ-র অসামান্য রূপ-লাবণ্যের খবর পৌছলো। কাইফেং-এর নগরপ্রাকারের ধারে তার দুরন্ত সৈন্যবাহিনীকে থামিয়ে চুয়ো সান্ তার সন্ধির সত স্থং রাজ-সভায় জানিয়ে পাঠালো। দ্বাদশ তোরণ ও দ্বাদশ সহস্র সেতুর যে নগরের মরকত নীল হ্রদের জলে স্বপ্নের মতো সব হরিৎ দ্বীপ ভাসে সেই নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ চীনের নয়নের মণি নান স্থ-কে তার চাই। নান স্থ-কে পেলেই কাইফেং-এর প্রান্ত থেকে ভাঁটার সমুদ্রের মতো তার দুর্ধর্ষ বাহিনী স'রে যাবে।

"সমস্ত চীন চঞ্চল হ'য়ে উঠল এ-সংবাদে, রাজসভা হ'ল চিন্তিত, নান স্থ-র পিতা চুয়ান উ সদাগর প্রমাদ গণলেন।

"একটি মাত্র মেয়ের জীবন বলি দিয়ে সমগ্র চীনের শান্তি ক্রয় করতে স্থং-রাজসভা শেষ পর্যন্ত দ্বিধা করলেন না। চুয়ান উ-র কাছে আদেশ এল নান্ স্থ-কে কাইফেং-এ পাঠাবার।

"জাফ্‌রি-কাটা জানালার ভেতর দিয়ে আর গজদন্তের পাখার ওপর দিয়ে ব্রীড়াবনতা নবযৌবনা নান স্থ তখন বাইরের পৃথিবীর যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তার সমস্তই জুড়ে আছে একটি মাত্র মানুষের মুখ। সে-মুখ কিনসাই নগরের তরুণ নৌ-সেনাপতি সি হুয়ান-এর।

"নান স্থ কেঁদে পড়লো বাপের পায়ে, নতজানু হ'ল সি হুয়ান। কিন্তু চুয়ান উ নিরুপায়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি তাঁর নেই।

"যেতেই হবে নান স্থ-কে সেই বর্বর কিতান-দলপতিকে বরণ করবার জন্যে উত্তরের সেই হিমের দেশে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সি হুয়ানের ওপরই নান স্থ-কে নিয়ে যাবার ভার পড়লো।

"দ্বাদশ তোরণ আর দ্বাদশ সহস্র সেতুর নগর থেকে সি হুয়ানের রণপোত যেদিন মেঘের মতো শাদা পাল মেলে রওনা হ'ল সমস্ত কিনসাই নগর সেদিন চোখের জল ফেললে। কিন্তু সি হুয়ান আর নান সু-র মনে কোন দুঃখ সেদিন নেই। ভাগ্য তাদের যদি পরিহাস ক'রে থাকে ভাগ্যকেও তারা বঞ্চনা করবে— এই তাদের সঙ্কল্প।

"সাত দিন সাত রাত রণপোত ভেসে চললো সীমাহীন সাগরে। রণপোতের হাল ধ'রে আছে স্বয়ং সি হুয়ান। উত্তরে হিমের দেশের কোন বন্দর নয়, দক্ষিণের রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের মায়াময় কোন দ্বীপই তার লক্ষ্য। একবার সেখানে পৌছোলে নিঃশব্দে রাত্রের অন্ধকারে নান সু-কে নিয়ে সে নেমে যাবে। সুং সাম্রাজ্যের অবিচার আর বর্বর কিতান বাহিনীর অত্যাচার যেখানে পৌছোয় না তেমনি এক নির্জন দ্বীপে নান সু-কে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে। হাল্কা হাঁসের পালকের ভেলা সেজন্যে সে আগে থাকতেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

"মানুষের এ-স্পর্ধায় ভাগ্য বুঝি তখন মনে মনে হাসছে। সাত দিন সাত রাত্রি বাদে হঠাৎ দুর্যোগ নেমে এল আকাশে। দুর্যোগ ঘনালো মানুষের মনে।

"সি হুয়ান নিজের হাতে হাল ধরায় তার অনুচরেরা গোড়া থেকেই একটু বিস্মিত হয়েছিল। সাত দিন সাত রাত্রিতেও গন্তব্য স্থানে না পৌছে তারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। উত্তর নয়, দক্ষিণ দিকেই তাদের রণপোত চলেছে, আকাশের তারাদের অবস্থানে সেকথা বোঝবার পর তাদের সে-সন্দেহ বিদ্রোহ হয়ে জ্বলে উঠল।

"রাত্রের আকাশে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। সমুদ্র উঠেছে উত্তাল হয়ে। ভাগ্যের সঙ্গে যারা জুয়া খেলে, বিপদকেই সুযোগ রূপে ব্যবহার করবার সাহস তারা রাখে। এই ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রেই পালকের ভেলা সমেত নান সু-কে নিচে নামিয়ে সি হুয়ান তখন নিজে নেমে যাবার উপক্রম করছে। বিদ্রোহী অনুচরেরা হঠাৎ এসে তাকে ধ'রে বেঁধে ফেলল।

"উন্মত্ত এক তরঙ্গের আঘাতে রণপোত থেকে ভেলা-সমেত দূরে উৎক্ষিপ্ত হতে হতে নান সু শুধু ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে একটা চিৎকার শুনতে পেল। 'ভয় নেই নান সু, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি। আমি যাব-ই।'

"জ্ঞান যখন হ'ল নান সু-র ভেলা তখন ছোট্ট এক পার্বত্য দ্বীপের সৈকতের ওপর পড়ে আছে।

"সভয়ে নান স্থ উঠে বসলো, উৎকণ্ঠিতভাবে তাকালো চারিদিকে। কয়েকটা সাগর-পাখী ছাড়া কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। দূরে অশান্ত নীল সমুদ্রের ঢেউ পার্বত্য তটের ওপর ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে এসে পড়ছে।

"শশকের মতো ক্ষুদ্র নবনী-কোমল নান স্থ-র পা— সে-পা ত' কঠিন পার্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে হাঁটবার জন্যে নয়, তবু নান স্থ-কে ক্ষত-বিক্ষত পায়ে সমস্ত দ্বীপ পরিভ্রমণ করতে হ'ল। কোথাও কোন জনপ্রাণীর দেখা সে পেলে না।

"তুষার-ধবল নান স্থ-র অতিসুকোমল হাত— গজদন্তের চিত্রিত পাখা ছাড়া আর কিছু যে-হাত কখনও নাড়েনি, তবু সেই হাতে কণ্টকগুল্ম থেকে ফল ছিঁড়ে নান স্থ-কে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হ'ল।

"ভীরু সলজ্জ নান স্থ-র চোখ— আঁখিপল্লব তার কাঁপতে কাঁপতে একটু উঠেই চিরকাল নেমে এসেছে ; তবু সেই চোখ উৎকণ্ঠিতভাবে মেলে পাহাড়েব চুড়া থেকে দূর সাগরের দিকে তাকে চেয়ে থাকতে হ'ল দিনের পর দিন সি হুয়ানেব আশায়। আসবে ; সে বলেছে, আসবে-ই।

"কত দিন কত রাত গেল কেটে। উত্তরের আকাশে কতবার সপ্তর্ষিমণ্ডলের বদলে শিশুমার আর শিশুমারেব বদলে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার প্রধান প্রহরী হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে গেল। তার কোন হিসেবই নান স্থ-র আর রইল না।

"কখন ধীরে ধীরে তার হৃদয় থেকে সমস্ত লজ্জা আর দেহ থেকে জীর্ণবাস খসে' পড়ে গেল সে জানতে পারলে না।

"অনেক-কিছু তার গেল, গেল না শুধু চোখের সেই উৎসুক দিগন্তসন্ধানী দৃষ্টি আর মনের সেই অবিচলিত প্রতীক্ষা।

"একদিন সেই প্রতীক্ষা সফল হ'ল। দূর দিক্‌চক্রবালে দেখা দিয়েছে শাদা পালের আভাস। দেখতে দেখতে দূরের সেই পোত স্পষ্ট হয়ে উঠল, লাগলো এসে শিলাকঠিন কূলে।

"কে নামছে সেই পোত থেকে। ওই ত' সি হুয়ান!

"অধীর আগ্রহে পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্ছল ঝরণার মতো নামতে লাগলো নান স্থ।

"মাঝ-পথেই সি হুয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল।

"উচ্ছ্বসিতভাবে নান স্থ যেন গান গেয়ে উঠল, 'এসেছ সি হুয়ান, এসেছ এতদিনে?'

"লুব্ধভাবে যে তার দিকে এগিয়ে আসছিল সে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু বিমূঢ়ভাবে চম্‌কে দাঁড়ালো, কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে— 'এসেছি এতদিনে মানে? কে তুমি!'

"সি হুয়ানের বিস্মিত অথচ লুব্ধ দৃষ্টি নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব ক'রে নান স্থ কাতরভাবে বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না সি হুয়ান। আমি নান স্থ।'

" 'নান স্থ! নান স্থ ত' এই দ্বীপের নাম। যে দ্বীপ খুঁজতে আমরা বেরিয়েছি, যে-দ্বীপ এতদিনে খুঁজে পেয়েছি!'

" 'আমার খোঁজে তাহ'লে তুমি আসোনি? এসেছ দ্বীপের খোঁজে!'

" 'হ্যাঁ, এই নান স্থ দ্বীপের খোঁজে— সাত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য যার মাটিতে পোঁতা আছে। বলো কোথায় সে ঐশ্বর্য?'

"অশ্রু-সজল চোখে নান স্থ এবার যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল— 'তোমার কি কিছু মনে নেই সি হুয়ান! মনে নেই তোমার রণপোত থেকে কেমন ক'রে ঝড়ের রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?'

" 'রণপোত থেকে ছাড়াছাড়ি! সাত পুরুষে আমাদের কেউ রণপোত চড়েনি। আট পুরুষ আগে এক সি হুযান কি রকম নৌ-সেনাপতি ছিলেন ব'লে শুনেছি। এই নান স্থ দ্বীপের গুপ্ত তথ্য নাকি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে ত' কাইফেং যখন চীনের রাজধানী ছিল সেই দু' শতাব্দী আগের কথা!'

" 'দু' শতাব্দী আগেকার কথা!' অস্পষ্ট আবেগরুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করলে নান স্থ, তারপর নবাগত নাবিকের লুব্ধ দৃষ্টিতে হঠাৎ নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতা আবিষ্কার ক'রে চম্‌কে উঠলো।

"নাবিক তখন লোলুপভাবে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নান স্থ শরাহত হরিণীর মতো প্রাণপণে ছুটে পালালো, ছুটে পালালো সেই পর্বত-চূড়ার দিকে, জীবনের পরম স্বপ্ন আজো যাকে ঘিরে আছে।

"কিন্তু পদে-পদে তার দেহ কি গুরুভারে যেন ভেঙে পড়ছে, লুব্ধ হিংস্র নাবিকের হাত থেকে আর বুঝি রক্ষা পাওয়া যায় না।

"পর্বত-চূড়ার প্রান্তে এসে যখন সে আছড়ে পড়লো তখন শরীরে এতটুকু শক্তি আর তার অবশিষ্ট নেই।

"কিন্তু লুব্ধ নাবিক তাকে সবলে আকর্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ সভয়ে শিউরে পিছিয়ে এল।

"সবিস্ময়ে নান সু একবার তার দিকে, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একাগ্র প্রতীক্ষা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধ'রে যে-যৌবনকে অক্ষয় ক'রে ধ'রে রেখেছিল সে-যৌবন দেখতে দেখতে সরে' যাচ্ছে। চোখের ওপর তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

"বহু যুগের অভ্যাসে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দূর-দিগন্তের দিকে সে বুঝি একবার তাকালো। চারিদিকে নীল সমুদ্র মথিত ক'রে ও কা'রা আসছে! 'কা'রা?' - সে চিৎকার ক'রে উঠল।

" 'ওরাও সি হুয়ান!' অট্টহাস্য ক'রে উঠল নাবিক, 'হুয়ানের পাঁচ হাজার বংশধর! ওরাও আসছে এই নান সু দ্বীপের গুপ্তধনের সন্ধানে, আসছে পুড়িয়ে মারতে সেই ডাকিনীকে দু' শতাব্দী ধ'রে এ-দ্বীপের গুপ্তধন যে আগলে রেখেছে!'

"যে-পাহাড়ের চূড়া থেকে নান সু-র উৎসুক চোখ দু' শতাব্দী ধ'রে দিক-চক্রবাল সন্ধান ক'রে ফিরেছে সেদিন রাত্রে জীবন্ত মশালরূপে তারই শীর্ষ সে উজ্জ্বল ক'রে তুললে।"

ঘনশ্যামবাবু চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর মর্মরের মতো মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু বললেন, "কিন্তু রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে এ-গল্পের কোন মিল ত' নেই?"

"থাকবে কি ক'রে?" ঘনশ্যামবাবু একটু হাসলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কসাই-এর ছেলে, গেঞ্জি আর টালির ব্যবসাদার ড্যানিয়েল ডিফো এ-গল্পের সূক্ষ্ম মর্ম কতটুকু বুঝবেন! মোটা বুদ্ধিতে তাই একে তিনি ছেলে-ভুলোনো গল্প ক'রে তুলেছেন!"

"এ-গল্পের আসল মর্মটা তাহ'লে কি?" মাথার কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু উত্তরে ঘনশ্যামবাবু এমন ভাবে তাকালেন যে, এ-প্রশ্ন দ্বিতীয় বার তোলবার উৎসাহ কারুর রইল না।

# ভস্মশেষ

বারান্দার এদিকটা সরু। নিচে নামবার সিঁড়িও খানিকটা ভেঙে পড়েছে। তবু সন্ধ্যের আগে এই দিকেই চেয়ারগুলো ও টেবিল পাতা হয়— এদিক থেকে দূরের পাহাড় আর নদীর খানিকটা দেখা যায় ব'লে।
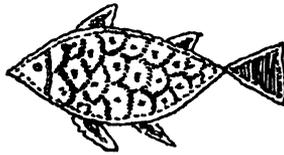
কৈফিয়ৎটা নিরর্থক। পাহাড় ও নদী অবশ্য কেউ দেখে না আজকাল। একদিন হয়তো সত্যিই সেই দেখাটা ছিল বড় কথা, এখন আর তার কোন অর্থ নেই। যা ছিল আনন্দ তা আজ অর্থহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বারান্দায় এই চেয়ার-পাতাটুকু থেকে এ-বাড়ির অনেক-কিছুর, আরও গভীর কিছুর পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে! এই কাহিনী সেইজন্যে-ই লেখা।

সবার আগে জগদীশবাবু এসে বসেন। নিচু ইজিচেয়ারটি তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট! চেয়ারের দু'ধারের হাতলে সুপুষ্ট হাত দু'টি ও সামনের টুলে পা দু'টি রেখে নিশ্চিন্ত আরামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকা তাঁর পরম বিলাস। স্বেচ্ছায় পারতপক্ষে কথা তিনি বড় বলেন না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুরমা একটু পরে আসেন। শাড়িতে প্রসাধনে আলুথালু ভাব। আলুথালু ভাব বুঝি প্রকৃতিতেও। এসেই তিনি জিজ্ঞেস করেন— "এর মধ্যেই ঘুমোলে নাকি?"

ইজিচেয়ারে জগদীশবাবু একটু নড়ে' চড়ে' জানান, তিনি ঘুমোন নি।

সে-প্রশ্নের জবাবের জন্যে সুরমার অবশ্য কোন আগ্রহ নেই। অভ্যাস মতোই প্রশ্নটা করেন, তারপর বেতের মোড়াটিতে বসতে গিয়ে উঠে পড়ে' হয়তো বলেন— "ওই যা, দোক্তার কৌটোটা ভুলে এলাম।"

জগদীশবাবু চক্ষু মুদিত অবস্থাতেই বলেন— "ডাকো না চাকরটাকে।"

সুরমা আবার ব'সে পড়ে' বলেন— "তাকে যে আবার বাজারে পাঠালাম। যাও না গো তুমি একটু।"

ইজিচেয়ারে জগদীশবাবুর নড়া-চড়ার কোন লক্ষণ না দেখে মনে হয় তিনি বোধ হয় শুনতে পান নি ; অন্ততঃ ওঠবার আগ্রহ তাঁর নেই।

কিন্তু সত্যি জগদীশবাবু খানিক বাদে বিশেষ পরিশ্রমে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠেছেন দেখা যায়। জগদীশবাবুর আরামপ্রিয়তা ও আলস্য যত বেশিই হোক স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্ন ও দৃষ্টি তার চেয়ে প্রখর।

জগদীশবাবুকে কিন্তু কষ্ট ক'রে আর যেতে হয় না। বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুরমা বলেন— "থাক থাক, তোমায় আর যেতে হবে না। ডাক্তার, আমার দোক্তার কৌটোটা নিয়ে এসে একেবারে বোসো। বিছানার ওপরই বোধ হয় ফেলে এলাম। আর ঘরের আলোটা বোধ হয় নিভিয়ে আসি নি। সেটা নিভিয়ে দিয়ে এসো।"

আদেশ নয়, অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে-মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।

মিষ্টতা সুরমার সব-কিছুতেই এখনো বুঝি অনেকটা আছে— চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, প্রকৃতিতে। বয়সের সঙ্গে শরীরের সে তীক্ষ্ণ রেখাগুলি দুর্বল হ'য়ে এলেও তাদের আভাস আলুথালু বেশ ও প্রসাধনের মধ্য দিয়েও পাওয়া যায়। সুরমার সৌন্দর্য এখনো একেবারে ইতিহাস হ'য়ে ওঠে নি। অবশ্য ইতিহাস তার আর এক দিক দিয়ে আছে— কিন্তু সেকথা এখন নয়।

ডাক্তারবাবু ঘরের আলো নিভিয়ে, দোক্তার কৌটো নিয়ে এসে টেবিলের ওধারে সুরমার সামনা-সামনি বসেন— নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে। নদী ও পাহাড়ের দিকে কোনদিনই তাঁর চাইবার আগ্রহ ছিল না। বরাবর তিনি এই আসনটিতে এইভাবেই ব'সে আসছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতাতেও ডাক্তারবাবুকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, শুধু পোষাকে ও চেহারায় নয়, তাঁর মনেও যেন একটা ক্লান্ত ঔদাসীন্য আছে সব ব্যাপারে। পোষাকের ত্রুটিটাই অবশ্য সকলের আগে চোখে পড়ে ; —ঢিলে বঙচটা পেন্টুলেনের ওপর গলাবন্ধ একটা কোট পরা। গলাটা কিন্তু বন্ধ হয়নি বোতামের অভাবে। এই কোট পরেই সম্ভবতঃ তিনি সারাদিন রুগী দেখে ফেরেন। একধারের পকেট স্টেথিস্কোপের ভারেই বোধ হয় একটু ছিঁড়ে গেছে। গোটাকতক আলগা কাগজপত্র সেখান দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে।

মাথায় চুলের কিছু পারিপাট্যের চেষ্টা বোধ হয় সম্প্রতি হয়েছিল, কিন্তু সে নেহাৎ অবহেলার।

ডাক্তারবাবুর মুখের ক্লান্ত ঔদাসীন্যের রেখাগুলি শুধু তাঁর চোখের উজ্জ্বলতার দরুনই বুঝি খুব বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে নি। ঘুমন্ত নিষ্প্রাণ মানুষটির মধ্যে এই চোখ দু'টিই যেন এখনো জেগে আছে পাহারায়। কে জানে কি তাদের আছে পাহারা দেবার।

অনেকক্ষণ কোন কথাই শোনা যায় না। সুরমার পানের বাটা সঙ্গে আছে এবং থাকে। তিনি সযত্নে পান-সাজায় ব্যস্ত। জগদীশবাবু ইজিচেয়ারে নিশ্চলভাবে পড়ে' আছেন। ডাক্তারবাবু নিজের হাতের নখগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে সুরমার পান-সাজা শেষ হবার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করেন।

সুরমার পান-সাজা শেষ হয়। সেটি মুখে দিয়েও তিনি কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে থাকেন। তারপরে হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করেন— "তোমার সে ফুলের চারা এল ডাক্তার?"

জগদীশবাবু চোখ বুজে বলেন— "সে-চারা আর এসেছে! তার চেয়ে আকাশ-কুসুম চাইলে সহজে পেতে!"

সুরমা হেসে ওঠেন। বলেন— "তুমি ডাক্তারকে অমন অকেজো মনে করো কেন বলো দিকি! সেবারে আমাদের জলের পাম্পটা ডাক্তার না ব্যবস্থা করলে হ'ত?"

ইজিচেয়ারের ভেতর থেকে ঘুমন্ত স্বরে শোনা যায়— "তা হ'ত না বটে। অন্য কেউ ব্যবস্থা করলে হয়তো পাম্পে সত্যিই জল উঠতো।"

তিনজনেই এ-রসিকতায় হাসেন। এ-বাড়ির এ'টি একটি পুরাতন পরিহাস।

সুরমা বলেন— "সত্যি, তুমি কি ক'রে ডাক্তারি করো তাই ভাবি! লোকে বিশ্বাস ক'রে তোমার ওষুধ খায়?"

"খাবে না কেন, একবার খেলে আর অবিশ্বাসের সময় পায় না ত'।"

সুরমা হাসতে হাসতে পানের বাটা খুলে জিভে একটু চুন লাগিয়ে বলেন— "তোমার বাপু ডাক্তারের ওপর একটু গায়ের জ্বালা আছে। তুমি ওর কিচ্ছু ভালো দেখতে পাও না?"

"সেটা ওঁর চোখের দোষ, অনেক ভালো জিনিসই উনি দেখতে পান না।" —ডাক্তারের মুখে এতক্ষণে কথা শোনা যায়।

সুরমা হেসে বলেন— "তা সত্যি! চোখ বুজে থাকলে আর দেখবে কি ক'রে।"

"চোখ বুজে থাকি কি সাধে! চোখ খুলে থাকলে কবে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত!"

সুরমা ও জগদীশবাবুর উচ্চ হাসির মাঝে ডাক্তারবাবুর নিস্তব্ধতাটা যেন একটু বিসদৃশ ঠেকে। সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের চোখে একটু বেদনার ছায়া এখনও দেখা যায় কি?

সুরমা হাসি থামিয়ে বলেন— "ওই যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমায় এখন কিন্তু একবার উঠতে হবে ডাক্তার!"

"এখনি? কেন?"

"এখনি না উঠলে হবে না। দাদা কি-সব পার্শেল করেছেন। স্টেশনে কাল থেকে এসে পড়ে' আছে— উনি একবার তবু সারাদিনে সময় ক'রে যেতে পারলেন না। তোমায় এখন গিয়ে ছাড়িয়ে আনতেই হয়!"

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলেন— "কাল সকালে গেলে হয় না!"

"হয় না আবার! একমাস পরে গেলেও হয়! জিনিসগুলো খোয়া যাবার পর গেলে আরো ভালো হয়।" —সুরমার কণ্ঠে মিষ্টতার চেয়ে এবার ঝাঁঝটাই বেশ স্পষ্ট।

"এক রাত্তিরেই খোয়া যাবে কেন?" —ডাক্তারবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

সুরমা বেশ একটু উচ্চস্বরেই বলেন— "তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না বাপু! সোজাসুজি বলোই না তার চেয়ে যে, পারবে না! তোমায় বলা-ই ঝকমারি হয়েছে আমার।"

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে উঠে পড়েন— "আমি কি যাবো না বলেছি। ভাবছিলুম একটা রাত্তির বৈ ত' না।"

"রাতটা কাটিয়ে গেলেই বা তোমার কি এমন সুবিধে! এমন-কিছু কাজ ত' আর হাতে নেই, চুপ ক'রে ব'সেই ত' থাকতে।"

সেকথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার শুধু চুপ ক'রে ব'সে থাকতেই এখানে আসেন। চুপ ক'রে ব'সে আছেন আজ বহু বৎসর ধ'রে।

ডাক্তার টুপিটা তুলে নিয়ে একবার তবু বলেন— "আসুন না জগদীশবাবু আপনিও! গাড়িটা ত' রয়েছে, একটু ঘুরে আসা হবে।"

জগদীশবাবুর আগে সুরমাই আপত্তি করেন— "বেশ কথা! আমি একলা ব'সে থাকি এখানে তাহ'লে!"

ডাক্তার একটু হেসে বলেন— "আরে! তুমিও এসো না।"

"তার চেয়ে বাড়ি-শুদ্ধ পাড়া-শুদ্ধ সবাই একটা পার্শেল আনতে গেলেই হয়! সত্যি তুমি দিন দিন কি যেন হ'চ্ছ!"

ডাক্তার আর কিছু না ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

"দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ!" মোটরে চ'ড়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সেকথা ভাবেন কি? না বোধ হয়। ভাবনা ও আবেগের উদ্বেল সাগর বহুদিন শান্ত নিথর হয়ে গেছে। সে-সব দিন এখন আর বোধ হয় মনেও পড়ে না। স্মৃতির সে সমস্ত পাতাও বুঝি অনেক তলায় চাপা পড়ে আছে। জীবনের একটি বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিভে গেছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।

আগুন একদিন সত্যিই জ্ব'লে উঠেছিল বৈ কি! কিন্তু সে যেন আর এক-জনের কাহিনী, সে-অমরেশকে তিনি শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এখন চিনতে পারেন। তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ তাঁর নেই।

একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহস ভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

মেয়েটি ভীতস্বরে বুঝি একবার বলেছিল, সুযোগ পেয়ে— "তুমি এখানে চ'লে এলে!"

"আরো অনেক দূর যেতে পারতাম!"

"কিন্তু— ?"

"কিন্তু এঁরা কি ভাববেন মনে করছ? তার চেয়ে তুমি কি ভাবছো সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।"

"আমি ত'..." মেয়েটি নীরবে মাথা নিচু করেছিল।

অমরেশ তার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলেছিল— "তোমার ভাববার সাহস পর্যন্ত নেই সুরমা!"

সুরমা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল— "না।"

"সেই সাহস সৃষ্টি করতেই আমি এসেছি সুরমা। সেই সাহসের জন্যে আমি অপেক্ষা করব।"

সুরমা চুপ করেছিল। অমরেশ আবার বলেছিল— "ভাবছো কতদিন—এমন কতদিন অপেক্ষা করতে পারব? দরকার হ'লে চিরকাল। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।"

জগদীশবাবু বুঝি সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁর চেহারায় এখনকার সঙ্গে তখনো বুঝি বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বেঁটে গোল-গাল মানুষটি। শান্ত নিরীহ চেহারা। একেবারে নিচের ধাপ থেকে সংগ্রাম ক'রে তিনি যে সাংসারিক সিদ্ধি বলতে লোকে যা বোঝে তাই লাভ করেছেন তাঁর চেহারায় তার কোন আভাস নেই। দেখলে মনে হয়, ভাগ্য তাঁকে চিরদিন বুঝি অযাচিত অনুগ্রহ ক'রেই এসেছে। সুরমা-সম্পর্কে সেকথা হয়তো মিথ্যাও নয়।

তিনি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন— "এখনও ট্রেনের জামা-কাপড় ছাড়েন নি? না না, এখন ছেড়ে দাও সুরমা। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন আগে।"

অমরেশ হেসে বলেছিল— "ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধটা আমার—ওঁর নয়।"

জগদীশবাবু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। হাসলে তাঁকে এত কুৎসিত দেখায় অমরেশও ভাবতে পারে নি। সুরমার পেছনে তাঁর এই হাস্য-বিকৃত মুখটা সে উপভোগ করেছিল বেদনাময় আনন্দে—

তারপর উঠে পড়ে' বলেছিল— "আচ্ছা, এখন ওঠাই যাক!"

জগদীশবাবু সঙ্গে যেতে যেতে বলেছিলেন— "বড় অসময়ে এলেন অমরেশবাবু! এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে কিছু দেখতে পাবেন না। বাইরে বেরুনোই দায়!"

"সেটা দুর্ভাগ্য নাও হ'তে পারে!" জগদীশবাবুর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছিল— "তা ছাড়া গ্রীষ্ম ত' একদিন শেষ হবে।"

"তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায়?" —জগদীশবাবুর স্বরে বুঝি একটু সন্দেহের রেশ ছিল।

"পাবেন বৈ কি! হয়তো বড় বেশি পাবেন।"

অমরেশ ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। সত্যই একদিন এই ধূলিমলিন দরিদ্র শহরের একটি রাস্তার ধারে অমরেশ ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল।

জগদীশবাবু বলেছিলেন— "বিলিতি ডিগ্রির খরচ উঠবে না যে ডাক্তার। এ-জঙ্গলের দেশে আমাদের মতো কাঠুরের পোষায় ব'লে কি তোমার পোষাবে ?"

অমরেশ ডাক্তার হেসে বলেছিল— "কাঠের কারবার আর ডাক্তারি ছাড়া আর কি পোষাবার কিছুই নেই।"

অমরেশ ডাক্তারকে রোগীর ঘরে দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক, জগদীশবাবুর বাড়ির সরু বারান্দাটিতে প্রতিদিন তারপর দেখা গেছে।

"চেয়ারটা ঘুরিয়ে ব'স ডাক্তার।" —জগদীশবাবু বলেছেন।

"কেন ? আপনার ওই নদী আর পাহাড় দেখবার জন্যে ? আপনার ট্রেডমার্ক পড়ে' ওর সব দাম নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

"মড়া কেটে কেটে মনটাও তোমার ম'রে গেছে ডাক্তার।"

জগদীশবাবু তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করেছেন অবাক হ'য়ে— "উঠলে কেন সুরমা ?"

"আসছি।" —ব'লে সুরমা মুখ নিচু ক'রে ভেতরে চলে গেছে।

অমরেশ ডাক্তার অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছে— "মেয়েরা কাটা-কাটির কথা সইতে পারে না, না জগদীশবাবু ?"

জগদীশবাবু কোন উত্তর দেন নি। গম্ভীরমুখে কি যেন তিনি ভাবছেন মনে হয়েছে।

অমরেশ ডাক্তার আবার বলেছে— "ওইটুকু ওদের করুণা।"

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছেন— "সেটুকু পাবারও সবাই যোগ্য নয়।"

ডাক্তারের আসা-যাওয়া গোড়ায় হয়তো এ বাড়ির উৎসাহ পায় নি। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছে— সহজ হয়ে এসেছে জগদীশবাবুর কাছেও বুঝি।

"ক'দিন আমায় জঙ্গলেই থাকতে হবে ডাক্তার। গুনতির সময় না থাকলে চলে না। দেখা-শোনা কোরো। তোমায় অবশ্য বলতে হবে না।"

ডাক্তার হেসে বলেছে— "না, তা হবে না। আসতে বারণ ক'রেও দেখতে পাবেন !"

জগদীশবাবু হেসেছেন। সুরমাও হেসেছে, হাসলেই হয়তো তার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। লাল হবার আর কোন কারণ নেই বোধ হয়।

কিন্তু সুরমাই একদিন তীব্র স্বরে বলেছে—"আমি কিন্তু আর সইতে পারছি না।"

"পারবে না-ই ত' আশা করি।"

"না না, তুমি এখান থেকে যাও। এমন ক'রে নিজেকে ও আমাকে মেরে কি লাভ।"

"বাঁচবার পথ ত' খোলা আছে এখনো।"

"সে-পথ যখন আগে নেওয়া হয় নি ”

"সে অপরাধ ত' আমার নয় সুরমা। তুমি তোমার নিজের মন জানতে না, আমি জানতাম না সুযোগের মূল্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতাকে তাই ব'লে মেনে নিতে হবে কেন।"

"তুমি কি বলছো জানো না। তা হয় না। তা হয় না।"—সুরমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে আবেগে।

"অপরাধের কথা ভাবছো? অপরাধ করার চরম দামও যার জন্যে দেওয়া যায় এমন বড় জিনিস কি নেই?"

"আমি বুঝতে পারি না তোমার কথা। আমার ভয় হয়।"

"বুঝতে পারবে, সেই প্রতীক্ষাতেই ত' আছি।"

প্রতীক্ষা একদিন বুঝি সার্থক হ'ল ব'লে মনে হয়েছে। জগদীশবাবুর কাঠের কারবারের জন্যে জমা-নেওয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল সেদিন তারা দেখতে গেছ্‌ল। অরণ্যের রহস্যঘন আবেষ্টনে সারাদিন রাজসূয় 'চড়িভাতি'র উত্তেজনাতেই কেটেছে। বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল।

অমরেশ ও সুরমা পথহীন অরণ্যে সকলের থেকে কেমন ক'রে আলাদা হ'য়ে গেছে। আলাদা হওয়াটা হয়তো সম্পূর্ণ দৈবাৎ নয়, অমরেশেরও তা'তে হয়তো হাত ছিল।

সুরমা খানিকক্ষণ বাদে বলেছে—"এ-জঙ্গলে কিন্তু পথ হারাতে পারে!"

"পথ জঙ্গলে ছাড়াও হারানো যায়।"

সুরমা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেছে—"সব সময়ে তোমার এ-ধরনের কথা ভালো লাগে না।"

"কোথাও তোমার ব্যথা আছে ব'লেই ভালো লাগে না। নিজের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না ব'লেই এসব কথা তোমার অসহ্য।"

সুরমা নীরবে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। অরণ্যের পশ্চাৎপটে তার দীর্ঘ সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিতে বুঝি বন-দেবীরই মহিমা ও মাধুর্য। সেটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুঝি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অমরেশ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছে— "এ-জঙ্গলে হারাবার বদলে পথ আমরা পেতেও পারি।"

সুরমা তবু নীরব।

হঠাৎ তার একটা হাত ধ'রে ফেলে অমরেশ বলেছে— "চুপ ক'রে থেকো না সুরমা। বলো, আজ তোমার অটলতার গৌরব আর নেই— আছে শুধু দুর্বলতার লজ্জা। এ-সম্বল নিয়ে চিরদিন বাঁচা যায় না, বাঁচা উচিত নয় সুরমা।"

সুরমা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলেছে— "আমি কি করতে পারি বলো!"

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে অমরেশ বলেছে— "এই কাটা গাছটা দেখছ সুরমা। কাঠের কারবারে এর একটা দাম মিলেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে আসল দাম এর ছিল! তুমিও কারবারের কাঠ নও সুরমা, তুমি অরণ্যের।"

সুরমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অমরেশ আবার বলেছে— "সহজ ক'রে কথা আজ বলতে পারছি না ব'লে ক্ষমা কোরো সুরমা। মনের ভেতরই আজ আমার সব জড়িয়ে গেছে।"

সুরমা অমরেশের আরো কাছে স'রে এসেছে, বুকের ওপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে ধরা-গলায় বলেছে— "তুমি আমায় সাহস দাও।"

কিন্তু চলে' যাওয়া তাদের তখন হয়ে ওঠেনি। বাধা এসেছে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জগদীশবাবু হঠাৎ অসুখে পড়েছেন— গুরুতর অসুখ। সুরমা ও অমরেশ দিন-রাত্রি বিনিদ্র হয়ে রোগ-শয্যার পাশে জেগেছে, আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করেছে মুক্তিক্ষণের। আর বেশি দিন নয়। এই তাদের শেষ পরীক্ষা, নূতন জীবনের এই প্রথম মূল্যদান।

জগদীশবাবু ভালো হয়ে উঠেছেন, তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে আর কিছুদিন, আর কয়েকটা দিন! ছোটখাটো বাধা, বাঁধা-ঘাটের নোঙর একেবারে

তুলে ফেলতে সুরমার সামান্য একটু বিহ্বলতা। একটু সময় তাকে দেওয়া যেতে পারে— নিজের ভেতর থেকে বল পাওয়ার সময়। অমরেশ কোথাও এতটুকু জোর খাটাতে চায় না, সব শিকড় আপনা থেকে আলগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। অসীম তার ধৈর্য।

অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে— কিছু দিন, অনেক দিন, বড বেশি দিন অপেক্ষা কবেছে।

ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিভে। কখন আর-বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে— তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আব সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হযে গেছে, জীর্ণ মলিন হযে গেছে সংসারের ধুলায়।

সব চেযে মলিন বুঝি ডাক্তার, সব চেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল ব'লেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তাব নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে! কিন্তু সে শুধু অভ্যাস।

ডাক্তার স্টেশনে পার্শেল খালাস করতে ছোটে, সে শুধু দুর্বল আজ্ঞানুবর্তিতা।

# অনাবশ্যক

স্বর্ণময়ীর রাত্রে অমন অনেকবার ঘুম ভাঙে। ঘুম তাঁর অত্যন্ত পাৎলা। ঘুম পাৎলা না হয়ে উপায় কি? গত চার বছর তাঁকে সারারাত অনেক রকমে হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে। বেণুর শোয়া ভালো নয়। মাথায় তার বালিশ থাকে না। শীতের রাতে লেপ স'রে যায় গা থেকে। কুণ্ডুলি পাকিয়ে খাটের এক কোণে হয়তো দেখা যায় সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর মিলির রাতে জল চাই অনেকবার। ঘুম ভাঙবা মাত্র আবার তার আলো না দেখতে পেলে ভয় করে। অথচ ঘরে আলো জেলে রেখে ঘুমোবার উপায় নেই। বেণুর চোখের পাতা তাহ'লে আর বুজবে না। তা ছাড়া ঘরে বাতি জ্বেলে রাখা নাকি খারাপ। বিশেষতঃ—শীতের রাত্রে দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরে। স্বর্ণময়ীকে বালিশের তলায় দেশলাই ঠিক রাখতে হয়। আলো, জলের কুঁজো, গেলাস রাখতে হয় মজুত মাথার কাছে। রাত্রে ক্ষণে ক্ষণে উঠতে হয়। মিলি হয়তো লেপে মাথা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। বেণুর মাথাটা হয়তো খাট থেকে ঝুলে পড়েছে। অনেক কিছু অনেকবার রাত্রে জেগে স্বর্ণময়ীকে খোঁজ করতে হয়। ঘুম তাঁর ত' পাৎলা হবেই। গত চার বছর ধ'রে তিনি ভালো ক'রে আর কবে ঘুমিয়েছেন!

আর গত চার বছরই বা কেন? সারাজীবনই ত' তাকে সজাগ থাকতে হয়েছে। সমস্ত সংসারের ওপর সজাগ। স্বামী ছিলেন আপন-ভোলা লোক। পয়সা রোজগার ক'রে এনে দিয়েই খালাস। তারপর আর তাঁর দায় নেই। দায় নেবার ক্ষমতাও ছিল না। চাকরির বাইরে তিনি একেবারে অসহায় শিশু। স্বর্ণময়ীর তিন ছেলে দুই মেয়ে। তার ওপর এই আরেকটি শিশুর ভার তাঁকে নিতে হয়েছিল। সকলের চেয়ে অসহায় এই শিশুটি।

"হ্যাঁ গা, নবীন ময়রা যে কিসের দাম চাইতে এসেছিল!"

"তা, দাম দিয়েছ ত'?"

স্বামী একটু গর্ব ভরেই বুঝি বলেছেন—"আমি অত আল্‌গা নাকি?

না জেনে শুনেই দাম দিয়ে দেব! কিসের দাম আগে খোঁজ করতে হবে না!"

স্বর্ণময়ী খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেছেন— "বাঃ, কিসেব দাম তুমি জানো না? উমার শ্বশুরবাড়িতে পুজোর তত্ত্বের খাবার কোথা থেকে গিয়েছিল?"

"ওঃ তাই! তা, এই দেখ না হিসেবটা।"

স্বর্ণময়ী বিরক্ত হয়েছেন একটু— "কেন, হিসেবটা তুমি দেখতে পারো না বেটাছেলে হয়ে! আমি ও-সব পারব না।"

স্বামী একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে বলেছেন— "আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই দেখব'খন। এখন থাক্ তোমার কাছে।"

স্বামী যে কত দেখবেন স্বর্ণময়ীর তা জানা। তিনি অপ্রসন্ন মুখে হিসেবটা নিয়েছেন। তারপর ব্যবস্থাও করেছেন নিশ্চয।

ব্যবস্থা এমন সব-কিছুব তাঁকে করতে হয়েছে। সাবাজীবন ধ'রে করতে হয়েছে।

"হ্যাঁ গো, জামা কাপড়ের দোকানে খবর দিতে বলেছিলাম, দিয়েছিলে ত'? তোমার কোট সব ক'টা ছিঁড়ে এসেছে, খোকাব ক'টা নিকারবোকাব দবকার! বিনযেব আব তু'টো পাঞ্জাবি না হ'লে চলবে না! এখনো মাপ নিতে এলো না কেন?"

"বলেছিলাম ত'।" —ব'লে স্বামী সেখান থেকে স'রে পড়েছেন। স্বর্ণময়ীকে অবশ্য তারপব নিজে থেকেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

বিবক্ত হয়ে এক এক সময় তিনি অবশ্য বলেছেন— "পুরুষ মানুষ হয়েছিলে কি করতে বলো ত'? ঘরে বাইরে এত আমি তদারক করতে পাবব না! দোতলাব ঘব তোলবাব কি দরকার ছিল, যদি চুন সুরকিটা পর্যন্ত আনাবাব ব্যবস্থা না কবতে পারো? কোথায় জানালা ফোটানো হবে, কোথায় দরজা বসবে তাও কি আমি ব'লে দেব রাজ-মজুরকে?"

কিন্তু এ-বিরক্তি ক্ষণিক, এ-বিরক্তি বাহ্যিক। সত্যি সংসারের এত ভার বহন ক'রেও স্বর্ণময়ী ক্লান্ত হ'ন নি। ক্লান্ত হওয়া দূরে থাক, এই ভার বহনেই তাঁর বুঝি আনন্দ। এই তাঁর জীবন। এই ষাট বছর বয়স পর্যন্ত জীবন বলতে তিনি এই বুঝে এসেছেন। সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে এই

সংসারটিকে গড়ে' তোলার কাজেই সম্পূর্ণরূপে তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন। এবং সেজন্যে দুঃখ করবারও কিছু নেই। সংসার তাঁর আজ সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ধনে জনে দিন দিন তাঁরই সতর্ক দৃষ্টির ওপর এই পরিবারটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সবদিকে তার ঐশ্বর্য না হোক, সচ্ছলতা, সবদিকে সুশৃঙ্খলা। দুঃখ, শোক, ক্ষতির সঙ্গে একেবারে যে পরিচয় ঘটেনি তা নয়। কিন্তু তা বুঝি সামান্য, তা জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সহ্য করতেই হয়। গভীরভাবে সে-সব ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করেনি বোধ হয়।

স্বামী পরিণত বয়সে মারা গেছেন। স্বর্ণময়ী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছেন। পাকা মাথায় সিঁদুর মুছেছেন শিরে করাঘাত করতে করতে। তারপর আবার উঠেছেন বিনয়ের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। বড়-বৌকে ধম্‌কে বলেছেন—"ছেলেটাকে বাঁচতে দেবে না তুমি বৌমা। বাছার পেট একেবারে ভুঁয়ে পড়ে গেছে! কোন্ যুগে খাইয়েছিলে বলো ত' ?"

আরো একটু কঠিন আঘাত বুঝি পেয়েছিলেন ছোট মেয়ের বেলা। একটি মাত্র ছেলে রেখে অত্যন্ত অল্প বয়সে সে তাঁকে কাঁদিয়ে গেছে।

একদিন স্বর্ণময়ী বিছানা থেকে ওঠেন নি। তার পরদিন বড় ছেলেকে বলেছিলেন, "এখানে আমি থাকব না, আমায় কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দে।"

তীর্থে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কেমন ক'রে আর হবে? পাঁচ বছরের মা-মরা ছেলে বেণুকে তাহ'লে মানুষ করে কে? ছেলেটা বাঁচলে তবু মায়ের নাম থাকবে। বেণুর বিছানা সেই থেকে তাঁর খাটের ওপর হয়েছে। শুধু বেণুর জন্যেই তাঁর সংসারে থাকা নয়। তিনি না দেখলে এত বড় সংসার সামলাবেই বা কে? কারুর ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই। নিজে না দেখলে কোন বিষয়েই তাঁর স্বস্তি নেই। এ-সংসারের সমস্ত দায় ঘাড়ে করা আর কারো সাধ্য নয়।

ছেলেদেরও বিশ্বাস বুঝি তাই। তাঁর তীর্থযাত্রার কথায় বিনয় ত' তখনই মুখ ভার ক'রে বলেছিল— "বেশ যাও! কিন্তু এখানে কিছু গোলমাল হ'লে আমি জানিনে।"

"গোলমালই-বা হবে কেন রে? এখনো তোরা নিজেরা দেখে শুনে সংসার করতে পারবি নে?"

মুখে বললেও স্বর্ণময়ী জানতেন তারা পারবে না। এবং সেই জন্যেই তাঁর কোথাও যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

সংসার তাঁর সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। ছেলেরা মানুষ হয়েছে। বিয়ে থা' ক'রে সংসারীও হয়েছে সবাই। পয়সার অনটনও নেই। আর সব চেয়ে যা আনন্দের কথা এ-সংসারে নেই অশান্তি। এমনি ভরা-সুখের সংসার রেখেই নাকি লোকে অবসর গ্রহণ করতে চায়। লোকে সেকথা বলেছেও—"এইবার কাশীবাস করলেই পারো বিনয়ের-মা! সংসার ত' গুছিয়ে দিয়েছ ছেলেদের! আর কেন?"

স্বর্ণময়ী মুখে হেসে বলেছেন—"যাবো বৈ কি মা! এমন ক'রে আর সংসারের জঞ্জাল ঘাঁটব কতদিন? আর কি ভালো লাগে!"

কিন্তু ভালো তাঁর সত্যিই লাগে। শুধু ভালো লাগে কেন, এ-সংসার তাঁর নেশা। এ-ভার বহনে তাঁর ক্লান্তি নেই। দীর্ঘ ষাট বছর বয়সেও তাঁর ক্লান্তি আসেনি।

আর এখনো ত' তিনি সবল সুস্থ সক্ষম। বৌএরা এ-বয়সেও তার সঙ্গে খেটে পারে না। একালের মেয়েদের চেয়ে তিনি অনেক শক্ত। সংসার থেকে কি জন্যে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন? আর করলে কি চলবে?

স্বর্ণময়ীর সেইখানেই ভয়। তাঁর অবর্তমানে এ-সংসারকে সমস্ত ক্ষতি থেকে কে বাঁচাবে এই ভাবনাতেই তিনি কাতর। তাঁর মনে হয়, তিনি দু'দিন সরে' দাঁড়ালেই এ-সংসারের সমস্ত বাঁধন যাবে আল্‌গা হয়ে; সমস্ত দুর্বল স্থান হবে অনাবৃত; যে-সৌভাগ্য যে-সম্পদ তিনি তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে এসেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল ক'রে যা সঞ্চয় করেছেন, নানা ছিদ্রপথে তা যাবে অচিরে নিঃশেষ হয়ে।

না, তাঁর কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। সংসার ছেড়ে তীর্থধর্ম ক'রে যে সুখ পায় পাক। তাঁর তাতে সুখ নেই। তীর্থধর্মের কোন মানেই তিনি খুঁজে পান না, সত্যি কথা বলতে গেলে। আর তা ছাড়া কোথাও গিয়ে তিনি স্থির হয়েই যে থাকতে পারবেন না। সকাল হ'লেই তাঁর মনে হবে—হয়তো রাত্রে বাছুর বাঁধা হয়নি। সকালে গোয়ালা এসে এক ফোঁটা দুধ পাবে না। ছোট-বৌমা নিজেও রুগ্ন, তার ছেলেটিও হয়েছে তাই। ছেলেটা দুধ অভাবে টা-টা করবে। হয়তো বাজারের দুধ আনিয়ে খাওয়ানো হবে। তাতে কি অসুখ করবে কে জানে?

শুধু এই একটা ভাবনাই নয়, সমস্ত দিন তাঁর মনে হবে তাঁর তত্ত্বাবধানের

অভাবে সংসারের সমস্ত কাজে হয়তো অসংখ্য ত্রুটি ঘটছে। বেণুর সর্দিকাসির ধাত। সেই জন্যে জলের প্রতি টানটাও বেশি। হয়তো সে পরমানন্দে বিনা বাধায় চৌবাচ্চার জল নিয়ে মাতছে। বিনয়ের মেয়ে মিলি মার চেয়ে ঠাকুরমার ন্যাওটা বেশি। মেয়েটা আবার অত্যন্ত অভিমানী। তার মর্জি-মেজাজ বুঝে কেউ হয়তো চলেনি। মেয়েটা কেঁদে সারা হচ্ছে। বাজার ঠিক মতো করতে পাঠানো হয়েছে কিনা, ছেলেদের স্কুলের ভাত ঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, অসুখ শরীরেও ছোট-বৌএর ওষুধ খাওয়ায় গাফিলী— হয়তো সে ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছে না, হয়তো ঝি এঁটো শুদ্ধুই বাসন মেজে তুলেছে, হয়তো তেল-ওয়ালা দুটো দাগ বেশি দিয়ে গেল— ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা তাঁকে একমুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন!

স্বর্ণময়ী তাই ভরা-সুখের সংসার রেখে তীর্থধর্ম করবার সমস্ত সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করতে পারেন নি। সমস্ত বুক দিয়ে এই সংসার আঁকড়েই পড়ে আছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে দু'দণ্ড তিনি চোখ বুজতে পারেন না। চোখ বুজবার তাঁর উপায় কি? সমস্ত সংসার যে তার ওপর নির্ভর ক'রে আছে। তাঁকে যে সজাগ থাকতেই হবে।

কিন্তু,— হ্যাঁ একটু কিন্তুও আছে— এ সন্দেহ স্বর্ণময়ীর মনে উদয় হয়েছে মাত্র কিছু দিন। কিন্তু কিছু দিনেই তাঁর সমস্ত জগৎ যেন ওলটপালট হবার উপক্রম হয়েছে।

আজ রাত্রেও ঘুম ভাঙবা মাত্র স্বর্ণময়ী পাশের বিছানায় অভ্যাস মতো হাত বুলিয়ে দেখেন। বেণু, কোথায় গেল বেণু! হয়তো খাটের ধারে গিয়ে পড়েছে একেবারে। এখনি যাবে প'ড়ে। ধড়মড় ক'রে স্বর্ণময়ী বিছানায় উঠে বসেন। তারপরই তাঁর মনে প'ড়ে যায়।

বেণু আর তাঁর কাছে শোয় না। ক'দিন ধ'রে শুচ্ছে না। বেণু বড় হয়েছে। বড় হওয়ার পৌরুষ-গর্বে সে দিদিমার তত্ত্বাবধানে একান্তভাবে থাকাটা লজ্জাকর মনে করে। কেন তার ভয় কিসের? সেও অনায়াসে একটা বিছানায় একা শুতে পারে। সে ত' আর মিলি নয়!

স্বর্ণময়ী হেসে বলেছেন প্রথম দিন— "বৌ হ'লে একলা শুবি'খন। তখন বৌ তোকে আগলাবে!"

বেণু গম্ভীরভাবে বলেছে— "আমাকে কাউকে আগলাতে হবে না। আমি একলাই শোব। কেন, ছোড়দা ত' শোয়।"

ছোড়দা বেণুর মামাতো ভাই— বিনয়ের বড় ছেলে। বেণুর চেয়ে সে বছর তিনেকের বড়। কিন্তু এরই মধ্যে সে নিজের ঘরে আলাদা শোয়। তার স্বাধীনতা ও সাহসের দৃষ্টান্তই বেণুকে যে উদ্দীপ্ত করেছে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বেণু শেষ পর্যন্ত নিজের জেদই বজায় রেখেছে। বাড়িতে অতিরিক্ত ঘব আর বেশি নেই। বাইরের ঘরটা ব্যবহার করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা সত্যই বড় দূর। বেণুকে তাই আদর্শকে একটু খাটো ক'রে আনতে হয়েছে। ছোড়দার ঘরেই তার আলাদা বিছানা পড়েছে। এও একবকম একলা শোয়া বৈ কি? আলাদা বিছানা ত' বটে। মিলির মতো ভয়কাতুরে মেয়ের সম-পর্যায়ে আর ত' তাকে ফেলা চলবে না। বেণু তাতেই উল্লসিত।

দু'দণ্ডের খেয়াল ভেবে স্বর্ণময়ী আর সেদিন কিছু বলেন নি। ভেবেছেন— ভয় পেয়ে পরের দিনই আবার বেণুব মত বদলাবে। কিন্তু সেই থেকে বেণুর মত এখনও বদলায় নি। সত্যি সে বড় হয়েছে। এরকম ভাবে একলা শোয়ার ভেতর স্বাধীনতার যে স্বাদ পেয়েছে তা আর সে হারাতে রাজি নয। বেণু সেই ঘরেই শুচ্ছে এখনও।

হয়তো রাত্রে খাট থেকে পড়ে যাবে, হয়তো ভয় পাবে ভেবে স্বর্ণময়ী বৃথাই অস্থির হয়েছেন, মাঝ রাত্রে এক এক দিন তিনি ঘুমন্ত বেণুকে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়েছেন। কিন্তু বেণু তাতে আরও ক্ষেপে উঠেছে। ঘুম ভাঙতেই নিঃশব্দে গেছে পালিয়ে। তার বড় হওয়ার গৌরব সে সহজে হারাতে প্রস্তুত নয়। তাছাড়া দিদিমার আর বোকা মিলির সঙ্গে গল্প করার চেয়ে ছোড়দার কাছে গল্প শোনার মজা অনেক বেশি।

স্বর্ণময়ী বেণুকে আর বাধা দেননি। বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর কোথায় যেন লেগেছে। জীবনের বড় বড় শোকতাপ যাঁকে তেমন ক'বে স্পর্শ করতে পারেনি সামান্য এই শিশুটির খেয়াল তাঁকে যেন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। হঠাৎ যেন তিনি এতদিন বাদে নিজের চারিধার দেখতে পেয়েছেন। বেণু তাঁর কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে, শুধু বেণু নয়, সবাই যেন তাঁর কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে অমনি। সবই যাচ্ছে তাঁকে ছাড়িয়ে; —আশ্রয় করবার

মতো কোথাও কিছুই তাঁর নেই। তা সত্বেও তাঁর সব-কিছু ধ'রে রাখবার এই চেষ্টাই যেন অত্যন্ত হাস্যকর, অত্যন্ত করুণ। এ-চেষ্টা হয়তো সকলকেই পীড়া দিচ্ছে।

স্বর্ণময়ী বেণুর শূন্য বিছানায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ব'সে থাকেন। নিজেকে তাঁর সহসা অত্যন্ত অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। মনে হয়, তিনি যেন অকারণে পথ জুড়ে ব'সে আছেন, নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে। বেণুর আর তাঁকে দরকার নেই। সে বড় হয়েছে। তাঁর স্নেহের আতিশয্যই তাকে পীড়িত করে। সে এখন স্বাধীন হতে চায়, আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। এই ত' স্বাভাবিক, এই ত' ভালো। হয়তো এই সংসারেরও আর তাঁকে এমনি দরকার নেই। এ-সংসারও স্বাধীন হতে চায়। তিনি জোর ক'রে তার ওপর নিজের শাসন ও শৃঙ্খলার ভার চাপিয়ে রেখেছেন মাত্র।

না, বিদ্রোহ কেউ অবশ্য করেনি। আঘাত ইচ্ছা ক'রে কেউ তাঁকে দেয়নি। তা যে দেবে না কেউ, তা তিনি জানেন। তাঁর সংসারে অশান্তি নেই, ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসে, বৌ-এরা তাঁর বাধ্য, তাঁর শাসনের ভেতর স্নেহের ফল্গুর সন্ধান তারা রাখে। তবু কোথায় যেন আছে অস্বস্তির একটু আভাস। তাঁর প্রয়োজনীয়তা যেন কেমন ক'রে শেষ হয়ে গেছে।

ছেলেরা হয়তো বলে— "এত সকালে তুমি আবার উঠেছ কেন মা? এই ঠাণ্ডা লেগে আবার একটা অসুখে পড়বে। ওরা ত' রয়েছে।"

ছেলেরা এমন কথা আগেও বলেছে মার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে। কিন্তু এখন সুরটা বুঝি একটু আলাদা। মার স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ তার ভেতর আছে, আছে ভালোবাসার পরিচয়। কিন্তু আরও কিছু তার ভেতর আছে। একটু অধৈর্য বুঝি! মার শক্তি সম্বন্ধে একটু যেন অবিশ্বাস।

স্বর্ণময়ী প্রথম বুঝতে পারেন নি, গ্রাহ্য করেন নি। তিনি না দেখলে যে চলে না। ছেলেরা যে তাঁরই ওপর নির্ভর ক'রে আছে।

কিন্তু সেখানেও ধীরে ধীরে তাঁর সন্দেহ জেগেছে। জেগেছে মাত্র কিছু দিন। বিনয়কে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন— "হ্যাঁরে এখনও প্ল্যান দিয়ে গেল না, কবে স্যাংসন হবে, কবে বা'র-বাড়ির কাজ আরম্ভ হবে?"

বিনয় বলেছে— "প্ল্যান ত' দিয়ে গেছে মা! স্যাংসনের দরখাস্তও ক'রে দিয়েছি। প্ল্যান ভালোই হয়েছে।"

স্বর্ণময়ী মুখে বলেছেন— "বেশ!" কিন্তু অন্তরে বুঝি একটু আঘাত পেয়েছেন। তাঁকে না জানিয়েই, তাঁর ওপর নির্ভর না ক'রেই এ-বাড়ির কাজ আজকাল একটু-আধটু চলতে আরম্ভ হয়েছে। আরও একদিন বহুকাল আগে এমনি ঘর তৈরি হয়েছিল। তখন স্বামী কিছু দেখতে পারতেন না। তাঁকেই সব দেখতে হয়েছে ব'লে স্বর্ণময়ী মুখে বিরক্তি জানিয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁর মনে শুধু একটু ক্ষোভ, তাঁকে কিছু দেখতে হবে না ব'লে!

ছেলেরা তাঁকে অবহেলা যে করতে চায় না একথা তিনি জানেন। তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সমানই আছে। তারা শুধু তাঁকে কষ্ট দিতে চায় না। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম করা দরকার, এই বুঝি তাদের ধারণা। আর বুঝি আছে একটু অবিশ্বাস তাদের মনে। তাঁর বার্ধক্যের শক্তিতে অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসই সব চেয়ে পীড়িত করে স্বর্ণময়ীকে। তিনি যে বার্ধক্যে সত্যি অকর্মণ্য হন নি। এখনও তাঁর যে সমস্ত শক্তি অটুট আছে, অটুট আছে আগ্রহ। তিনি অনায়াসে এখনও সমস্ত সংসারের ভার যে বহন করতে পারেন।

শুধু তাই নয়, এ-ভার বহন করতে না পেলে জীবনে যে তাঁর আর কিছু থাকবে না। জীবন বলতে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে শুধু এই জেনে এসেছেন। এ-সংসার তাঁরই হাতে গড়া, তিল তিল ক'রে জীবন-শোণিতবিন্দু দিয়ে নির্মিত। সে-সংসারে কোনদিন তিনি যে অনাবশ্যক হতে পারেন একথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আজ হঠাৎ যদি সে-সংসার তাঁর কাছ থেকে স'রে যায়, শূন্য হাতে, অর্থহীন অবসর নিয়ে কি করবেন তিনি! স্বর্ণময়ীর যেন হাঁপ ধ'রে আসে। শূন্য বিছানায় মধ্যরাত্রে জেগে ব'সে হঠাৎ গভীর বেদনায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কর্মবহুল জীবনে এ-হতাশা এ-বেদনা প্রবেশ করবার ছিদ্র কোনদিন ছিল না। জীবনে কোন বেদনার ছিদ্র তিনি রাখেন নি, কিন্তু তাই বুঝি ভাগ্যের এই বিলম্বিত প্রতিশোধ!

স্বর্ণময়ী তার পরেও চেষ্টা করেন। এ-সংসারের কর্ণধার তিনি না হতে পারেন আর, হয়তো তাঁর ওপর কারুর নির্ভর করবার আর দরকার নেই, তবু তিনি সাহায্য করতে পারেন, তবু নিজেকে তিনি ব্যাপৃত রাখতে পারেন।

কিন্তু সেখানেও ধীরে ধীরে বাধা দেখা দেয়। বাধা দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। ধীরে ধীরে নিজের প্রয়োজনহীনতার অনুভূতিই স্বর্ণময়ীকে যেন

সহসা সত্যকারের বার্ধক্যে টেনে আনে। এইবার প্রথম স্বর্ণময়ীর মনে হয় তিনি যেন ক্লান্ত। কর্মহীনতার অবসাদে ক্লান্ত।

ছেলেরা তাঁর সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে ওঠে। বধূদের সেবা বেড়ে যায়।

"ঠাকুর-ঘরের ব্যবস্থা আমি করছি মা, তুমি একটু জিরোও দেখি। আবার নইলে কালকের মতো বুক ধড়ফড় করবে হয়তো।" মেজ-বৌ শাশুড়ীকে বিশ্রাম করতে ব'লে চলে যায়।

স্বর্ণময়ী বিশ্রামই করেন। তাঁর সত্যি শরীর ভেঙে পড়েছে।

বিনয় একদিন ডাক্তার ডেকে আনে— "না মা, তোমার ওসব ওজর-আপত্তি শুনব না। তোমার শরীর কি হয়েছে তুমি জানো না।"

স্বর্ণময়ী আর আপত্তি করেন না। নিজেকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ সংসার তাঁকে ছেড়ে গেছে, তাঁর সমস্ত শক্তি সমস্ত দৃঢ়তা হরণ ক'রে নিয়ে গেছে সেই সঙ্গে। একদিন তিনি বুঝি বলেছিলেন— "এবার আমায় কাশী পাঠিয়ে দে বাবা। দিন ত' ফুরিয়ে এল। আর কেন?"

কিন্তু সেখানেও তাঁর ইচ্ছার আর কোন মূল্য নেই। ছেলেরা বৌএরা সমস্বরে বলেছে— "পাগল হয়েছ মা! তোমার এই শরীর। সেখানে তোমায় দেখবে কে? কে তোমার সেবা করবে? সে হয় না।"

সবাই মিলে তাই স্বর্ণময়ীকে এখন দেখছে, সকলে মিলে নিয়েছে তাঁর সেবার ভার। সমস্ত ভার তিনি নিজের স্কন্ধে রেখে এসেছেন এতদিন, তার প্রতিদানও ত' দেওয়া দরকার!

পাছে স্বর্ণময়ীর শান্তির আব বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেই ভাবনায় সমস্ত সংসার আজ উদ্বিগ্ন।
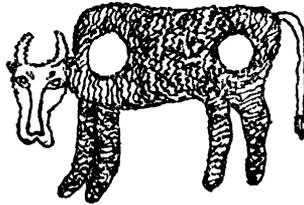
# জনৈক কাপুরুষের কাহিনী

সকালবেলা করুণা নিজে হাতেই চা নিয়ে এল।

চায়ের আনুষঙ্গিকের বহর দেখে না হেসে পারলাম না। বললাম—"তোমাদের এদেশী জলহাওয়া ভালো হতে পারে, কিন্তু আমার জীর্ণ করবার ক্ষমতাটা এখনো খাটি স্বদেশী আছে—এই দু'দিনে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।"

উত্তরে শুধু একটু হেসে প্লেটগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে. করুণা চলে' যাবার উপক্রম করতে আবার ডেকে বললাম—"তুমি কি আমার সঙ্গে লৌকিকতা সুরু ক'রে দিলে না কি? বিমলবাবু লৌকিকতা করলে না-হয় বুঝতাম, কিন্তু —"

কথার মাঝখানেই করুণা বললে—"বিমলবাবুর হয়েই যদি করি—দোষ আছে কি?"—তারপর হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা সামনে ঠাণ্ডা হতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

না, করুণার ব্যবহারটা মোটেই ভালো লাগছে না, একথা নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে আর বাধা নেই।

করুণা নাটকীয় একটা-কিছু ক'রে বসবে তা অবশ্য আশা করিনি। আশা কেন, সেটা রীতিমতো আশঙ্কার বিষয়ই ছিল। গোড়ায় তার সহজ স্বাভাবিকতায় তাই বুঝি আশ্বস্তই বোধ করেছি। কিন্তু মনের কোন গোপন কোণে আহত অহঙ্কার তারপর ধীরে ধীরে সাড়া দিতে সুরু করেছে। মনে হয়েছে, এতটা হবার বুঝি দরকার ছিল না। সূর্য অস্ত গেছে যাক্, কিন্তু তার বিলম্বিত রঙ পশ্চিমের মেঘে একটু লেগে থাকলে ক্ষতি কি ছিল!

নাটকীয় না হয়ে করুণা অতিমাত্রায় কঠিন ও সংযত হয়ে উঠলে বুঝি সব চেয়ে খুশি হ'তাম। ধরা দেবার ভয়ে তার সেই সযত্ন সাবধানতায় আমার আত্মাভিমান সব চেয়ে বোধ হয় তৃপ্ত হ'ত।

কিন্তু করুণা নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা কঠিন ঔদাসীন্য— দুই-এর কোন দিক দিয়েই গেল না।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না, অনায়াসে এই কথাই ভাবতে পারতাম। এবং তাই ভাবাই ছিল উচিত। সত্যিই করুণার সঙ্গে দেখা হবার কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা আমার ত' ছিল না! তার সঙ্গে দেখা হবার কথাও নয়। বিশাল পৃথিবীর জনতায় এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে আমরা হারিয়ে গেছলাম যে কোন দিন আবার পরস্পরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল অভাবিত।

কিন্তু সেই অভাবিত ব্যাপার যখন ঘটলো তখন দেখলাম, করুণাকে অনায়াসে ভুলে গেছি যখন মনে করেছি তখনও সে আমায় ভুলতে পারে না— মনের এ গোপন গর্বটুকু ত্যাগ করতে পারিনি।

এ রকম একটা গর্ব থাকা খুব অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়।

সে-সব দিনের কথা একেবারে ভোলা ত' যায় না! বিশেষ ক'রে সেই একটি বিকেল। সারাদিন বাইরে অবিশ্রান্তভাবেই বৃষ্টি পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও কোথাও আর বা'র হওয়া হয়নি। বিকেলে চাকর এসে খবর দিলে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।

এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি মেয়ে! প্রথমটা সত্যিই একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলাম। চাকরের সঙ্গে করুণা যখন ঘরে এসে ঢুকল তখনও আমার মুখের বিস্ময় নিশ্চয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

চাকর চলে' যাবার পর করুণা কাছে এগিয়ে এসে বললে —"খুব আশ্চর্য হয়েছ, না?"

"তা একটু হয়েছি, কিন্তু তুমি যে একেবারে ভিজে গেছ!" —আমি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

করুণা কাছের একটা চেয়ারে ব'সে বললে— "বৃষ্টিতে বেরুলে ভিজতেই হয়, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।"

তারপর হেসে উঠে বললে— "ব্যস্ত হয়ে করবেই বা কি! তোমাদের এ নারী-বিবর্জিত রাজ্যে মেয়েদের পোষাক পাবে কোথায়? সখের থিয়েটার-পার্টিও নিশ্চয়ই তোমাদের নেই!"

একটু ভেবে বললাম— "ওপরে দশ নম্বরে একজনেরা আছেন— স্বামী-স্ত্রী!"

করুণা আবার হাসলো— "তাঁদের কাছে শাড়ি ব্লাউজ চাইতে যাবে? কি ব'লে চাইবে?"

হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে— "তার চেয়ে ভিজে কাপড়েই আমি বেশ আছি। আমার অসুখ করবে না, ভয় নেই।"

অগত্যা তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে আবার বললে— "ভাবছো, এমনভাবে এখানে আসার মানে কি? কেমন?"

এবারও কোন উত্তর দিলাম না। করুণা খানিকক্ষণের জন্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মনে হ'ল। তারপর সম্পূর্ণ রূপান্তর। এই দুর্বার আবেগ সে এতক্ষণ জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিল বুঝলাম।

একেবারে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে ব্যাকুল স্বরে বললে— "আমায় পাটনায় নিয়ে যাচ্ছে। মামা কাল চিঠি দিয়েছেন।"

বুঝতে কিছু পারলাম না এমন নয়। তবুও বেদনাময় সত্যটা যতক্ষণ সম্ভব অস্বীকার ক'রে বললাম— "তোমাদের কলেজের ত' ছুটি হচ্ছে?"

করুণা আরো ব্যাকুল স্বরে বললে— "না না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারছ না। এখানে আমায় আব রাখবে না; এই যাওয়া আমার শেষ!"

তার ঠাণ্ডা একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলাম। হ্যাঁ, বেদনা সেদিন আমার হৃদয়েও ছিল, কিন্তু করুণার উদ্বেল আবেগের তুলনায় সে বুঝি কিছু নয়! আমার ভালোবাসার মধ্যে সে-উদ্দামতা ছিল না যা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ করতে পারে।

কিন্তু করুণা খানিক বাদে অশ্রুসজল মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বললে— "আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না। কেন যাবো?"

কি উত্তর এ-কথার দেবো ভেবে পেলাম না। মনের গভীরতায় হয়তো সেদিনই তার এ-বিদ্রোহে আমার সায় ছিল না। তখনই আমি জানতাম যে এ-বিদ্রোহ নিষ্ফল।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় বললাম— "তুমি যা মনে করছ তা ত' নাও হতে পারে করুণা; তুমি হয়তো মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।"

করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠল— "না, না, আমি জানি; জোর ক'রে তাঁরা আমায় সেখানে বন্দী ক'রে রাখতে চান। তাঁদের ধারণা, এ-সব ছেলে-মানুষী সারাবার তাই অব্যর্থ ওষুধ।"

করুণা একটু তিক্ত হাসি হাসলো।

তারপর আবার বললে— "আমি কলেজ যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে এসেছি। এখানে এসে তোমায় অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু না এসে যে উপায় নেই, পিসিমার বাড়িতে তোমার যাওয়া ত' প্রায় বন্ধ হয়েছে। সেখানে এসব কথা তোমায় জানাতেও পারতাম না।"

একটু থেমে করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠল আবেগে— "সত্যি কি আমায় নিয়ে যাবে জোর ক'রে! কিছুই আমরা করতে পারব না?"

সেদিন কি আশ্বাস, কি সান্ত্বনা দিয়ে করুণাকে তার পিসিমার বাড়ি রেখে এসেছিলাম, তার বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মনে যত বড়ই ব্যথা পেয়ে থাকি না, কিছুই তারপর করতে পারিনি এটা ঠিক।

করুণাকে তার মামারা জোর ক'রে কিনা জানি না, তারপর পাটনায় নিয়ে গেছেন; যাবার আগে দেখা করবার সুযোগও মেলেনি আমাদের।

নিমন্ত্রিত অবশ্য হইনি, কিন্তু একদিন কোথা থেকে করুণার বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদও কানে এসেছে। নির্লিপ্ত নির্বিকার মনে সে-সংবাদ শুনেছি এমন কথা বলতে পারব না, কিন্তু আজ বিশ্লেষণ ক'রে দেখে বুঝতে পারি এ-সংবাদ পাবার পর কয়েকটি দিন ও রাত যে আমার কাছে হতাশায় ধূসর হয়ে গেছে, তা প্রধানতঃ করুণার দুঃখের কথা ভেবে। ভালোবেসে না পাওয়ার ব্যর্থতা সেদিন নিজের দিক দিয়ে নয়, করুণার দিক দিয়েই উপলব্ধি করেছি, এবং সেই উপলব্ধির বেদনায় নিজের আত্মপ্রসাদ কিছু মেশানো ছিল কিনা তা বোঝবার শক্তি তখন ছিল না।

করুণার স্মৃতি যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখনও মনের কোন্ গোপন কোণে এ-বিশ্বাস বুঝি ছিল, যে আমি ভুললেও সে কোনদিন ভুলতে পারে না!

সে-বিশ্বাসে রূঢ় আঘাত পাওয়ার পরই মনের যে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল তাতে নিজের কাছেই নিজে কেমন একটু লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু তবু আত্মসংযম করতে পারলাম না।

করুণা খানিক বাদে যখন আমার ঘরে এল তখন আমার আচরণে ও কথায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চেষ্টা করলে হয়তো সেও লক্ষ্য করতে পারতো।

করুণা খাবার প্লেটটার দিকে চেয়ে বললে— "এ কি! কিছুই যে খাওনি!"

পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে আঁটতে তার দিকে ফিরে চাইলাম; একটু হেসে বললাম— "লৌকিকতার বদলে লৌকিকতাই করতে হয় যে; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মতো প্লেট সাফ্ ক'রে ফেললে তুমি ভাবতে কি?"

"— তুমি এখনো সেই এক কথা ধ'রে ব'সে আছো!" —করুণার স্বর একটু যেন ক্ষুণ্ণ।

"এক কথা ধ'রে ব'সে থাকা আমার একটা দুর্বলতা করুণা, এখনও এটা শোধ্‌রালো না।" —আমার স্বর বেশ গাঢ়।

করুণা অন্যদিকে ফিরে খাবার প্লেটটা সরিয়ে রাখছিল, তার মুখ দেখতে পেলাম না। কিন্তু যে উত্তর সে দিলে তাতে সহজ কৌতুক ছাড়া আর কিছুরই আভাস নেই।

"আর সব দুর্বলতা তাহ'লে শুধ্‌রে ফেলেছ!" —আমার দিকে ফিরে করুণা আবার বললে— "একি, এরই মধ্যে বেরুচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ, গাড়িটার কতদূর কি হ'ল একবার দেখতে ত' হয়!"

"তুমি দেখলেই ত' সেটা তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাবে না। উনি ত' খোঁজ নিয়ে আসবেন বলেছেন। ওঁর ফিরতে আর দেরি নেই। তোমায় থাকতেই ব'লে গেছেন।"

"সুতরাং ততক্ষণ তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প করতে বলছো?" —হেসে বলবার চেষ্টা করলাম।

সকৌতুক মুখভঙ্গি ক'রে করুণা বললে— "তা করতে পারো।"

আমার স্বর আপনা থেকে তখন বুঝি গাঢ় হয়ে এসেছে— "অনায়াসে ব'লে ফেললে যে করুণা!"

"এমন কি একটা কঠিন কথা যে অনায়াসে বলা যায় না?" —করুণার মুখে একাধারে হাসি ও বিস্ময়।

"এমন-কিছু কঠিন নয় করুণা? সত্যি বলছো? আমার সঙ্গে একা ব'সে গল্প করতে তোমার ভয় করে না? আমার যে নিজেকে এখনো ভয় করে!"

"তোমার মাথাটি বেশ খারাপ হয়েছে দেখছি!" —ব'লে হেসে আমায় বেশ একটু অপ্রস্তুত ক'রে করুণা এবার বেরিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে আবার বললে— "তুমি কিন্তু যেও না, আমি এখুনি আসছি।"

কিন্তু অনেকক্ষণ করুণা তারপর আর আসে না। ঘরের ভেতর পায়চারি

ক'রে বেড়াতে বেড়াতে মনের মধ্যে কি যেন একটা জ্বালা অনুভব করি। সেটা আমার নিজের না করুণার বিরুদ্ধে বোঝা শক্ত। হয়তো সেটা নিয়তির বিরুদ্ধে।

কি দরকার ছিল এমন ক'রে আবার তার সঙ্গে দেখা হবার! দেখা হওয়াটা দৈবের আয়োজিত পরিহাস ছাড়া আর কি?

ক'দিন ছুটি পেয়ে মোটরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কাল রাত্রে এই শহরের মাঝখানে এসে যখন তা'র কল হঠাৎ বিগড়ে গেছ্‌ল তখন জঙ্গলের পথে না হয়ে একটা ভদ্রগোছের শহরের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে ব'লে ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিয়েছিলাম। ভবিষ্যৎটা তখন জানতে পারলে বোধ হয় জঙ্গলের পথটাই শ্রেয় মনে করতাম।

একে রাত্রিকাল, তায় অচেনা শহর। ডাকবাংলো ও স্টেশনের ওয়েটিংরুম থেকে দরিদ্রতম হোটেল পর্যন্ত টাঙ্গা ক'রে ঘুরে আশ্রয় না পেয়ে শেষে যে-কারখানাতে মোটর মেরামত করতে দিয়েছিলাম সেখানেই ফিরে গেছলাম হতাশ হয়ে। সেখানেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। কাছাকাছি একটা কয়লার খনিতে তিনি কাজ করেন। সেখানকার কি প্রয়োজনে এ-কারখানায় এসে-ছিলেন। প্রবাসে বিপন্ন বাঙালির সাহায্যে তিনি নিজে থেকেই অগ্রসর হয়ে তাঁর বাড়িতে রাত্রি কাটাবার প্রস্তাব করেছিলেন। সামান্য একটু আপত্তি হয়তো করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শোনেন নি।

শহরের নির্জন একপ্রান্তে বিমলবাবুর বাড়ি। সেখানে পৌঁছে দেখা গেছ্‌ল সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে বিমলবাবু বলেছিলেন—"আজ আমার আসবার কথা ছিল না কিনা! চাকর ব্যাটারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে!"

খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলাই লণ্ঠন হাতে এসে বাইরের দরজা খুলে নিদ্রা-জড়িত স্বরে বলেছিলেন—"বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি যে ব'লে গেছ্‌লে আজ আসবে না!"

বিমলবাবু হেসে বলেছিলেন—"বরাতে একটা পরোপকারের পুণ্য ছিল, তাই বোধ হয় আসার সুবিধে হয়ে গেল। আমি না এলে এই ভদ্রলোক একটু বিপদেই পড়তেন বোধ হয় অজানা শহরে!"

করুণা এইবার আমায় দেখতে পেয়েছিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে স'রে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বিমলবাবু তখনও ব'লে চলেছেন— "তুমি চাকরগুলোকে ডেকে দাও, বাইরের ঘরটা খুলে একটা বিছানা ঠিক ক'রে দিক। ভদ্রলোকের একটু কষ্ট হবে..."

হঠাৎ তাঁকে করুণার কথায় সবিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে।

করুণা হেসে বলেছে— "বিদেশ-বিভুঁয়ে একটু কষ্ট হ'লই বা ভদ্রলোকের!"

বিমলবাবু অবাক হয়ে আমাদের দু'জনের মুখের দিকে চেয়েছেন— "তার মানে! এঁকে তুমি চেন নাকি!"

"তা একটু চিনি বৈ কি!" —করুণা হেসে উঠেছে।

"কি আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যটা কিসের! তোমার অচেনা ব'লে আর আমার চেনা হ'তে নেই! তোমার সঙ্গে ত' মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তার আগে কুড়ি বছর আমি সলিটারি সেলে ছিলাম মনে করো!"

বিমলবাবু হেসে ফেলে বলেছেন— "কিন্তু ভদ্রলোককে বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের দাম্পত্য-জীবনের নমুনাটা নাই দেখালে।"

করুণা গম্ভীর হ'বার ভান ক'রে বলেছে— "ও, আমি শুধু ঝগড়া করি এই তুমি বোঝাতে চাও!"

এবার একটা-কিছু বলা উচিত ব'লেই হাসবার চেষ্টা ক'রে কথা বলেছি— "ব্যবসাই পেশা বিমলবাবু, নমুনা দেখে আমি ভুলি না।"

এতদিন বাদে করুণার প্রথম আলাপের ধরনে তখনই মনে কোথায় আমার একটা খট্‌কা লেগেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যখন নিজেই বেরিয়ে পড়ব কি না ভাবছি তখন করুণা এল। সাজ-পোষাকের পরিবর্তন দেখে যা বলতে যাচ্ছিলাম নিজে থেকেই তার উত্তর দিয়ে সে বললে— "একটু বাইরে যেতে হবে। আসবে আমার সঙ্গে?"

চাদরটা আলনা থেকে তুলে নিয়ে বললাম— "শুধু আদেশের অপেক্ষা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছ?"

"বাজার করতে।" —ব'লে করুণা হাসলে।

"বাজার করতে!" —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি ত' প্রায়ই যাই।" —সে হেসে বললে— "এখানে 'চেঞ্জার' ছাড়া বাসিন্দাদের মেয়েরা বড় একটা নিজেরা বাজারে যান না বটে, কিন্তু আমি ও-সব মানি না; উনি না থাকলে আমি নিজেই চাকর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

"কিন্তু বিমলবাবু ত' আজ আছেন!"

"ও, তোমায় বুঝি বলা হয়নি! উনি খবর পাঠিয়েছেন আজ আর আসতে পারবেন না, হঠাৎ বিশেষ জরুরি কাজে আটকে পড়েছেন।"

করুণা বেশ সহজভাবেই কথাটা ব'লে গেল। কিন্তু আমি রাস্তার মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম—"তাহ'লে?"

"তাহ'লে আর ভাবনা কিসের! উনি না থাকলে কি তোমার যত্ন হবে না!" —করুণার চোখে মুখে কৌতুকের দুষ্টু হাসি!

গম্ভীর হয়ে বললাম— "তা নয় করুণা, আমি ভাবছি···"

"তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে স্বরু করলে আমায় একাই এগিয়ে যেতে হবে।"

অগত্যা নীরবে তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হ'ল। এদিকের পথটা বেশ নির্জন। দূরে দূরে দু'একটা বাড়ি। তারও অনেকগুলি খালি প'ড়ে আছে। রাস্তায় লোক নেই বললেই হয়।

খানিকদূর নীরবে চলার পর প্রশ্ন না ক'রে পারলাম না— "বিমলবাবু আজ রাত্রে ফিরবেন ত'?"

"বোধ হয় না। এখন দু'চারদিন হয়তো সেখানে থাকতে হবে।"

আবার নীরবে অনেকটা পথ পার হয়ে গেলাম। করুণা কয়েকবার আমার দিকে ফিরে তাকাবার পর হেসে বললে— "কি ভাবছো অত গম্ভীর ভাবে?"

"ভাবছি আজই আমায় চলে' যেতে হবে।"

"তোমার গাড়ি ত' আজকের মধ্যে মেরামত হয়ে উঠবে না।"

"গাড়ি এরা পরে পাঠিয়ে দেবে'খন। আমি ট্রেনেই যাবো।"

"এত ব্যস্ত কেন? তোমার এখানে ভয় কিসের?"

রাস্তার মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম— "বলেছি ত', ভয় আমার নিজেকে; নিজেকে আমি বিশ্বাস করি না।"

করুণা এবার বেশ জোরেই হেসে উঠল— "না-ই বা করলে, তাতে কারুর ত' কোন ক্ষতি নেই!"

না, এ বুঝি আর সওয়া যায় না। হঠাৎ সমস্ত সংযম হারিয়ে তার হাতটা ধ'রে ফেললাম— "ক্ষতি যদি তোমারই হয়…"

করুণা হাত ছাড়িয়ে নিল না। কিন্তু পরিহাসের হাসিতে আমার সমস্ত আবেগকে নিষ্ঠুরভাবে হাল্কা ক'রে দিয়ে বললে— "কেমন ক'রে হবে? আমি ত' নিজেকে বিশ্বাস করি।"

করুণার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম— "সে-বিশ্বাস এখনো কি ভেঙে চুর হয়ে যেতে পারে না করুণা? সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ঢেউ কি আসতে পারে না?"

করুণার চোখে সেই দুর্বোধ সকৌতুক হাসি— "কি জানি, পরীক্ষা অবশ্য হয় নি।"

তারপর কি বলতাম ঠিক জানি না, কিন্তু রাস্তা এবার জনবহুল হয়ে এসেছে। বাধ্য হয়েই চুপ ক'রে গেলাম।

সকালবেলা বাইরে বা'র হবার পোষাকে করুণার এক রূপ দেখেছিলাম। দুপুরবেলা ষোড়শোপচার আহারের আয়োজনের সামনে ব'সে তার আর এক রূপ দেখলাম। একটি সাদা সেমিজের ওপর লাল চওড়া কস্তাপাড় শাড়ি প'রে আধ-ঘোমটার পাশ দিয়ে ভিজে এলোচুল পিঠে এলিয়ে সে কাছে এসে বসলো। এমন আশ্চর্য তাকে কোনদিন লাগে নি।

পাখাটা নাড়তে নাড়তে হেসে সে বললে— "কি দেখছো? কখনও দেখনি নাকি!"

"মনে হচ্ছে সত্যি কখনও দেখিনি।"

"তা হ'তে পারে।" —ব'লে সে অদ্ভুতভাবে হাসলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে— "আচ্ছা, আমার বাজার করা দেখে কি ভাবছিলে বলো ত'?"

"এই কথাই ভাবছিলাম যে তুমি আমার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার।"

"তাই নাকি, কিন্তু দোহাই, বেচারা কলম্বাসের দাবিটুকু উড়িয়ে দিও না।"

"কলম্বাসেরও আগেকার দাবি যদি থাকে?"

"দাবি থাকলেও দলিল নেই ত'!" —নিজের রসিকতায় করুণা নিজেই হেসে মাৎ ক'রে দিলে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খেয়ে যাবার পর বললাম— "দলিলের দাম সকলের কাছে নেই! ও তুচ্ছ জিনিস অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলা যায়।"

এবার করুণা হাসলো না। আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে,— "তোমায় মিষ্টি দেওয়া হয় নি," ব'লে হঠাৎ উঠে গেল।

তারপর মিষ্টি করুণা নিয়ে এল না, নিয়ে এল ঠাকুর।

কিন্তু খানিক বাদে ঘরে সে নিজেই পান নিয়ে এল এবং হঠাৎ ব'লে বসলো— "তুমি আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই তাহ'লে যাচ্ছ?"

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আমারই মনের ভুল, না তার মুখে একটা অস্ফুট অস্থিরতার ছায়া?

বললাম— "বেশ, তাই যাবো।"

"বেশ, তাই যাবো মানে? আমি যেন তোমায় জোর ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি! আমি ত' তোমায় থাকতেই বলছি, তুমি নিজেই ত' যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে তখন!"

—গলার ঝাঁঝটা এবার লুকোবার নয়।

হেসে বললাম— "আমি কি তোমায় দোষ দিচ্ছি? আমার সত্যিই না গেলে নয়!"

একটু যেন লজ্জিত হয়ে করুণা হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে— "তা জানি, এমন জায়গায় তোমার মন টেঁকে? কিন্তু শোনো, সন্ধ্যায় ঐ একটি ছাড়া আর গাড়ি নেই তা জানো ত'? ঠিক সাড়ে ছটায়, মনে থাকে যেন।"

গাড়ির সময় আমার মনে রাখবার প্রয়োজন ছিল না। বিকেল না হতেই জিনিসপত্র বাঁধিয়ে, আমায় মোটরের কারখানায় খবর দিতে পাঠিয়ে, স্টেশনে যাবার গাড়ি ডাকিয়ে করুণা নিজেই সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেললে এবং স্টেশনে যাবার পনেরো মিনিটের পথ যেতে পাছে কোন গোলমাল হয় ব'লে এক ঘণ্টা আগে আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে বিশেষ-কিছু বলবার অবসর তার মেলে নি।

বাড়ি থেকে টাঙ্গায় ওঠবার সময় সে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে— "তুমি আমায় কি ভাবছো কে জানে! যেন তোমায় বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি মনে হচ্ছে, না?"

"সেইটুকু ভেবেই যা-কিছু সান্ত্বনা।"

করুণা হেসে উঠল— "সান্ত্বনাটা এত সস্তা হ'লে আর সত্যিকার কিছু মেলে।"

টাঙ্গাওয়ালার গাড়ি চালানোর শব্দে তাব হাসির রেশ মিলিয়ে গেল।

এ-গল্পের শেষ ঐখানেই হ'লে ভালো হ'ত, কিন্তু তা হ'ল কই।

স্টেশনে যখন পৌছলাম তখনও ট্রেনের অনেক দেরি। ওয়েটিংরুমে জিনিস-পত্র বেখে এদিক-ওদিক অকারণে ঘুরে বেড়িয়েও সময় কাটাতে না পেরে তখন বই-এর স্টলে এসে দাঁড়িয়ে কি কেনা যায় ভাবছি। হঠাৎ পাশে চোখ পডায় চম্‌কে উঠলাম।

"এ কি! করুণা, তুমি এখানে?"

ম্লান একটু হেসে বললে— "এই এলাম।"

স্টেশনের শেডের আবছা আলোর দরুন, না সত্যিই, করুণাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে।

স্টল থেকে একটু স'রে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "আমি ঠিক বুঝতে পাবছি না করুণা, হঠাৎ স্টেশনে আসার মানে।"

করুণা আবাব হাসলো, তারপর হঠাৎ গম্ভীব হয়ে বল্‌লে— "দলিল পুড়িযে দিযে এলাম।"

খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বুঝতে না পেবে তার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিযে রইলাম। তারপরে ব্যাকুলভাবে বললাম— "কি বলছো করুণা।"

"খুব অসম্ভব কি কিছু বলছি? সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনো?" করুণার স্বব ক্রমশঃ যেন গাঢ় হয়ে উঠল।

আমার বুকের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে চোখের দিকে চোখ তুলে সে বললে— "তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না? যাবে না নিয়ে, বলো?"

অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পডলাম— "আমি তোমায় নিয়ে "

"কোথায় যাবে ভাবছো? যেখানে খুশি।"

কোন কথা এবার আর মুখ দিয়ে বেরুল না। মনের ভেতব শুধু একটা অস্থির আলোড়ন অনুভব করছি।

"তোমার অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও ত' তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি!"

করুণা কাতরভাবে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি বলব? কি এখন বলতে পারি! নির্বোধের মতো আমিই তার রুদ্ধ বন্যার বাঁধ খুলে দিয়েছি, এখন তাকে কেমন ক'রে ফিরিয়ে দেব?

"কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভালো ক'রে ভেবে দেখ নি করুণা। যে-ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে সুরু করব।"

করুণা তখনও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে তার সমস্ত মুখ যেন বিদ্রূপের হাসিতে ভ'রে উঠল।

"তোমার মূল্যবান্ উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আর একটু হ'লেই নোঙর উপড়ে গেছ্‌ল আর কি!" —করুণা এবার সশব্দেই হেসে উঠল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সমস্তই কি তবে আমাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে অভিনয়!

করুণা সহজভাবে বললে— "যাও, তোমার ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়েছে। আমার ট্রেনেরও বোধ হয় দেরি নেই।"

"তোমার ট্রেন!"

"পিসিমারা কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁরা বাড়ি চেনেন না। উনিও নেই, তাই নিজেই এলাম নিয়ে যেতে। শুনে খুব হতাশ হ'লে বুঝি?"

কোন কথা আর না ব'লে ওধারের প্লাটফর্মে যাবার জন্যে ওভারব্রিজের দিকে অগ্রসর হ'লাম। করুণাকে শেষ যখন দেখতে পেলাম তখন স্টলের বইগুলোর দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে।

সত্যিই পিসিমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সে কি স্টেশনে এসেছিল?

জীবনে কোনদিন সে-কথা জানা যাবে না।

# তেলেনাপোতা আবিষ্কার

শনি ও মঙ্গলের— মঙ্গলই হবে বোধ হয়— যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়— আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য সরোবরে— পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চট্‌চটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচম্‌কা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চ'লে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখীরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপ্‌সা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের

নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু'ধারে বাঁশ ঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু'জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তা'রা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ-অভিযানে তা'রা এসেছে— কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যাবে না। মশাদের ঐক্যতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বা'র করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি— মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু ক'রে উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সঙ্ঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধ'রে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঙ্কনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে— "এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।"

ব্যাপারটা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানেস্তারানিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসঙ্কুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে স'রে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে-সব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে ব'সে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন ব'লে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন

কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব-কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে ; —জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু'তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ ক'রে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধ্বসে-পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপ্‌সা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেওয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু'তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দু'টি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত ক'রে নাসিকাধ্বনি করতে সুরু করবেন, অপরজন পান-পাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশঃ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সঙ্কেতে খবর পেয়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেওয়ালে

ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন— ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে' পড়ে' ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য ক'রে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে, তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু-সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ ব'লে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল ক'রে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথ-রাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া স'রে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা ক'রে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভ'রে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে

ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে ব'সে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখী ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শীকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাৎলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "ব'সে আছেন কেন? টান দিন।"

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার

তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ ক'রে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্যশীকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ-কাহিনী কোথায় তা'রা শুনল, জিজ্ঞাসা ক'রে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—"কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!"

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে-ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে' গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি ক'রে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু

দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন! একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু'চার বার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কা'কে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেক বার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে— সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ ক'রে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্ততঃ ক'রে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্ন ভাবে বলছে, "মা ত' কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন— 'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোন কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ ত' বড় মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না-হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।" —মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই

বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ ক'রে ব'সে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন ব'লে ওঁর দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে ব'লে গেছ্‌ল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর ব'সে সেই আশায় দিন গুন্‌ছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি?"

"আরে সে বিদেশে গেছ্‌ল কবে, যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা ব'লে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছ্‌ল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা' ক'রে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তাহ'লে এখুনি ত' দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় ত' নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!"—ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো ব'লে ফেলবেন, "চলো, আমিও যাবো।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!"—ব'লে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌছোবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপ্‌সা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্নকন্থা-

জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে: "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়লো, বাবা তুই আসবি ব'লে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার ত' আর অমন ক'রে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝ'রে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই ত' এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা ব'লে হাঁপাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে' যাচ্ছে— ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীব হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আল্‌গা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট ক'রে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই— তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ— দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কি না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি ত' বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।"

ধরা-গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে—"আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!"

আপনি হেসে বলবেন, "থাক্ না। এবারে পারিনি ব'লে, তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশ' না দেড়শ' বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতি-বিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সে-সব কথা ভালো ক'রে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সঙ্কীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাতুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাটো বাধা বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা